শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

চার টাকা আট আনা

আশ্বিন—১৩৫৯

শ্রীমতী কল্যাণী দেবী

স্নেহাস্পদেষু—

এই উপন্যাসখানি ১৩৫৪-৫৫ সালে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কালে এর নাম ছিল—'আজ—আগামী কাল'। সেই সময়ে দু'টি মহাযুদ্ধের আঘাতে পৃথিবীর মানচিত্রই শুধু বদলায়নি, বহু রাষ্ট্র-ও সমাজ-ব্যবস্থায় বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষে বহু কল্পনাতীত ঘটনার সমাবেশ হয়েছে। এই বিবর্ত্তনের পটভূমিকায় 'আজ—আগামী কাল' গল্পের সূচনা। কিন্তু গল্পের মধ্যে কালকে চিহ্নিত করে রাখার চেষ্টাটাও গৌণ। আসলে যুগ-পরিবর্ত্তনের মুখে রাষ্ট্রের যে রূপটি বেদনা ও আনন্দের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তার আভাস, এবং সমাজ-চেতনায় ব্যক্তি-মানসের ক্রিয়া যেভাবে ভাবীকালের দিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে—তার ইঙ্গিত বহন করছে কাহিনীটি। সে দিনের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎকে আজ ঠিকমত খুঁজে পাওয়া কঠিন হলেও—সব কালের বর্ত্তমান নিত্য কালের ভবিষ্যতের আশা-আনন্দে চিরজীবী হয়ে থাকে। অবিচ্ছিন্ন গতিবেগে নিত্য পরিবর্ত্তিত এই কালকে কতকগুলি ঘটনা ও সন তারিখ দিয়ে চিহ্নিত করেন ইতিহাসকার, আর তার কল্লোলধ্বনি কুড়িয়ে হয় গল্পের সৃষ্টি। তাই কালের নির্দ্দেশনামা না রেখে—কল্লোলধ্বনির মধ্যেই এর প্রসারটা বাড়িয়ে দেওয়া গেল। অবশ্য গল্পের কুশীলব আর স্থান কাল ঘটনা মিলে এই কল্লোলধ্বনি কতখানি শ্রুতিরমা ও মনোলভ্য করেছে—সে বিচারভার সুধী পাঠকের উপরই রইল।

২. ৬. ৫৯ রা, ম

কাল-কল্লোল

কাল-কল্লোল

১

দুর্গামোহনের বৈঠকখানায় প্রাত্যাহিক পাশার আড্ডা বসেছে। দান-ফেলা ও আড়ি-মারার চীৎকারে থমথমে দুপুর বেলাটা খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—এ পাড়ার বহুদূর পর্য্যন্ত। বসু-ঘরণী সংসারের কাজ সেরে এই সময় একটু বিশ্রাম করেন—আর এই সময়েই পাশার আড্ডায় কোলাহলটা প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। অপ্রসন্ন মুখে ভুরু কুঁচকে বসু-ঘরণী বলেন, বেলা তিনটেয় আরম্ভ হ'ল দুপুরে মাতন! মানুষের খেয়ে শুয়ে একটু সোয়াস্তি নেই গা? নিত্যি নিত্যি কানের কাছে ডাকাত পড়াপড়ি—কারই বা ভাল লাগে?

কানের কাছেই বটে—এক পাচিলের এপিঠ ওপিঠ দুখানা বাড়ি। স্বাভাবিক ভাবে সংসারের কথাবার্ত্তা কইলে—এক বাড়ির ঘরের হাফ জানালা দিয়ে আর এক বাড়ির রোয়াকে অনায়াসে পৌছে যায় সে বার্ত্তা। পাড়াগাঁয়ে এত ঘেঁষা-ঘেঁষি বাড়ি তৈরি করার অর্থ—সেকালের প্রীতিবন্ধনবশতঃ ঘটে থাকলেও—এ কালের সৌহার্দ্দ্য-শিথিল আবহাওয়ায় ঠিকমত পরিস্ফুট হয় না। জমির হিস্সে নিয়ে কিম্বা অন্য কোন কারণে বিবাদ এদের মধ্যে পাকা-পাকি ভাবে কিংবা আকস্মিক না ঘটে থাকলেও একের গোপন সাংসারিক বার্ত্তা অন্যের গোচরে আসে—এটা এবাড়ি ওবাড়ির কেউই চান না। কেননা, কালের প্রবাহ

দু'বাড়ির সমৃদ্ধিকেই কিছু-না-কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। জোত জমি—যা নিয়ে এককালে মানুষের সম্পদের নিরিখ নির্ণীত হ'ত—তার ধারাও গেছে বদলে। এখন কোন্ বাড়ির ছেলে—কোন্ ভাল আপিসে বড় চাকরি করে তাই নিয়ে মান-সম্মানের পাল্লা দেওয়ার রেওয়াজ। যেমন সেকেলে গহনা নারকেল ফুল আজ ইলেকট্রিক প্যাটার্ণ চুড়ির ফ্যাসানে পৌছেছে। তাতেও কি নিস্তার আছে! জমি যেমন সেকালের সম্মান—আর একালের উপহাসের বস্তু—তেমনি গহনাও ভরিত্বে বা নিত্য নূতন ফ্যাসানের অভিনবত্বে মানুষের মনকে শ্রদ্ধা বা গৌরবান্বিত করতে পারছে না। দু' দুটো যুদ্ধের ঢেউ—সারা পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে গেল। মনে হ'ল, যে কালের স্রোত স্বনিয়মে স্বাভাবিক গতিতে মৃদু পরিবর্ত্তনের মাঝখান দিয়ে মানুষের সভ্যতাকে—সমাজকে তার মনকে আর দৃষ্টিভঙ্গিকে স্ববশে আনতে পারত—তা অত্যন্ত অকস্মাৎ আর দুর্ব্বার গতিতে এসে পড়েছে পৃথিবীর উপর। এক শতাব্দী—আর এক শতাব্দীকে জোর করে হটিয়ে দিচ্ছে। তার আয়ুকাল থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে সময়—তার বিধি-বিধানকে দিচ্ছে উল্টে—তার লেখাকে মুছে ফেলে নূতন বর্ণ-মালার সমাবেশ করতে চাইছে—এবং বিস্তৃত পৃথিবীকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে—ঘরের সামনে গুটিয়ে আনছে। এ সবই ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত। আজ পাড়াগাঁয়ে বসে মনে হবে না—এখানকার সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে বাস করছি। ইচ্ছে করলেও—শহরের ঢেউকে—গাঁয়ের মাঠ দিয়ে—বনের পাঁচীল ঘিরে বা নদীর রেখা টেনে আটকে রাখা যায় না। আবার এখানকার সাদাসিধা সুখ সুবিধাগুলি ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখাও কঠিন। এদের যাওয়া-আসার মধ্যেই নতুন কালের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটছে। কালের স্রোত প্রবল হয়েছে বলেই বয়োবৃদ্ধেরা অহরহ অনুযোগ তুলছেন, কলিকাল!

যাই হোক—বসু-গৃহিণীর উচ্চ মন্তব্য দুর্গামোহনের বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেও সেখানকার জমজমাট ভাবটা নষ্ট করতে পারে না। বৈঠকখানার ঠিক সামনে শাখা-সমৃদ্ধ জামগাছের ডালে বসে দুটো দাঁড়কাক প্রত্যহ দুপুরে যেমন কর্কশ স্বরে প্রণয়-আলাপের দ্বারা গ্রামবাসীদের অমঙ্গল আশঙ্কাকে বর্দ্ধিত করলেও—দুর্গামোহনের বৈঠকখানাকে বিদ্ধ করতে পারে না—তেমনি পাশের বাড়ির অনুযোগও শূন্যমণ্ডলে ভেসে চলে যায়। দান ও আড়ি মারার চীৎকারে বড় ঘরটা কল কল করতে থাকে।

কচে বারোর দান মেরে দুর্গামোহন শেষ ঘুঁটিটিকে ঘরে তুলতেই একটা সহর্ষ চীৎকার উঠল। কিন্তু সে চীৎকারের রেশ বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। প্রার্থিত দানটির সঙ্গে একখানি খামের চিঠি বৈঠকখানা ঘরের দোড়গোড়ায় টুপ করে ফেলে দিয়েছে পিওন। পিওনের মৃদু 'চিঠি' শব্দটি সহর্ষ চীৎকার ধ্বনির মধ্যে ডুবে গেলেও—প্রতিপক্ষ বিপিন রায়ের দৃষ্টি খামখানির উপর পড়ল। চিঠিখানা তুলে এনে তিনি তক্তাপোষের উপর রেখে বললেন, দুর্গা—তোমার চিঠি। চিঠিখানা ঘুরিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন, ছাপ দেখছি—জি-পি-ওর—প্রশান্ত দিয়েছে বোধ হয়।

দুর্গামোহন পত্রখানি খোলবার উদ্যোগ করছেন—কালীকৃষ্ণ মিত্র বললেন, প্রশান্ত জি-পি-ওতে সেদিন একটা ইণ্টারভিউ দিয়ে এল না?

হাঁ—বোধ করি—চাকরি পেয়ে গেছে। খামখানার এক পাশ ছিঁড়ে চিঠিখানা দুর্গামোহন মেলে ধরলেন।

বিপিন রায় ফরাসের উপর চাপড় মেরে বললেন, তবে আর কি তোমার তো পাথরে পাঁচ কিল! ভাল রকম খ্যাটের ব্যবস্থা করবে কিন্তু—হুঁ।

সবাই চীৎকার করে বিপিনের মন্তব্য সমর্থন করবার উদ্যোগ করতেই দুর্গামোহন হাত তুলে তাঁদের নিষেধ করলেন গোলযোগ করতে। চিঠির

দুটি ছত্রও অতিক্রম করেন নি—ইতিমধ্যেই দুর্গামোহনের মুখ গাম্ভীর্যে থমথমে হয়ে উঠল। হেতুটা সাধারণের বোধগম্য না হবারই কথা। পাশার বাজি আর সংসারের বাজি সাফল্যের সড়ক বয়ে পাশাপাশি চলেছে। লক্ষ্যটা অনিশ্চিত নয়—ধ্রুব। অথচ—

দুর্গামোহন অত্যন্ত গম্ভীর মুখে পাঠ করে চলেছেন নিঃশব্দে। তাঁর গাম্ভীর্যে অমঙ্গল আশঙ্কা করে আর সকলে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। নিস্তব্ধ দুপুরের প্রকৃত রূপটি এই মৌন গাম্ভীর্যের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠল। স্তব্ধতার দুঃসহ অস্বস্তি সকলকে পীড়ন করছে—কৌতূহল তো প্রবল হবারই কথা। বিপিন রায় সুসংবাদ অনুমান করে ভূরিভোজের দাবি জানিয়ে এই মুহূর্তে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করছেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার দায়টা যেন তাঁর ঘাড়েই বোঝার মত চেপে বসেছে! এপাশ ওপাশে হেলে—একটা কিছু বলে নিজেকে হাল্কা করে নেবার মানসে তিনি শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, প্রশান্ত ভাল আছে তো?

চিঠি পড়তে পড়তে দুর্গামোহন সংক্ষিপ্ত গম্ভীর উত্তর দিলেন, ভাল।

সাহস পেয়ে বিপিন রায় বললেন, চাকরিটি হয়েছে তো?

দুর্গামোহন বললেন, বলছি।

দু'পৃষ্ঠার চিঠি শেষ হতে আরও কয়েকটি নিস্তব্ধ মিনিট কেটে গেল। দুর্গামোহন মুখ তুলে বললেন, যতটুকু বিদ্যা-শিক্ষা তার হয়েছে—তাতে ইণ্টারভিউতে উৎরে যাবারই কথা। হাঁ—চাকরি সে পেয়েছে—একশো টাকা মাইনের একটা ভাল চাকরিই। কিন্তু বিপিন, কথায় আছে না—কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি। এও হয়েছে তাই।

ঠিক বুঝতে পারলাম না দুর্গা—

আমিও বুঝতে পারছি না ভাই। যুদ্ধের শেষ হয়েছে, জিনিসের দাম তবুও বাড়ছে। কেউ বলেন—এমন ধ্বংস হয়েছে যে কলপত্তর

কিছু নেই। অথচ মানুষও তো কম্‌ল! কেউ বলছেন—টাকার দাম আজ আর ঠিক চৌষট্টি পয়সা নয়, তের পয়সা। তাই যে অনুপাতে ব্যয় বেড়েছে সে অনুপাতে আয় হচ্ছে না। আয়ব্যয়ের তফাৎ যদি আকাশ-পাতাল থাকে— তো শান্তি আসবে কোথা থেকে!

কেউ কোন কথা কইলেন না। দুর্গামোহন হিসাব করে কথা বলেন— যেমন পাশার চাল দিতে ওঁর জুড়ি মেলা ভার। গুছিয়ে কথা বলতেও উনি পটু। সদাগরি আপিসে চল্লিশ বছর চাকরি করে অবসর নিয়েছেন। ত্রিশ টাকায় সুরু— সাড়ে চার শোয় শেষ। কমসে-কম পঁচিশ ত্রিশটা সায়েব তাঁর হাত দিয়ে পার হয়ে গেছে— সার্ভিস-শীটে সবারই কলমের জোর সুপারিশ জ্বল জ্বল করছে। ফলে— অবসর নেবার পরও—ঠিক পেনসন না হলেও—কর্ম্মদক্ষতায় পুরস্কারস্বরূপ মাস মাস মাইনের আদ্দেক পেয়ে আসছেন। এখনও জটিল কোন কাজের সমাধান করতে মাঝে মাঝে তাঁকে কলকাতায় ছুটতে হয়। তিনি বলেন, সায়েবেরা কাজ বোঝে—মানুষের দাম ঠিক করে কাজের কষ্টিপাথরে কষে। এহেন লোক—কোন কাজই যার আলগা বা এলো-মেলো নয়—একখানা চিঠি পেয়ে এ রকম অর্থহীন প্রলাপ বকবেন এ তো ধারণায় আসে না। গোড়া বেঁধে কাজ না করলে যুদ্ধান্তে হাজার হাজার যুবক যখন পাকা পাতাটির মত চাকরির বিশাল তরু থেকে টুপটাপ খসে পড়ছে—তখন তার ছেলে যোগাড় করে নিলে একশো টাকার এক চাকরি। ভাগ্য আর কাকে বলে। আর এইমাত্র পাশার প্রথম বাজিটাও—

দুর্গামোহন একটি নিঃশ্বাস ফেলে—চিঠিটা ভাজ করে ফতুয়ার পকেটে ফেললেন। মুখে শুধু উচ্চারণ করলেন, তারা—তারা।

সবাই বুঝলেন—আপাতত উনি এ প্রসঙ্গ তুলতে চান না।

কালীকৃষ্ণ অগত্যা বললেন, এই দানটা শেষ করবে, না নতুন করে ঘুঁটি সাজাব ?

দুর্গামোহন বললেন, লোকের পুত্র হলে—আনন্দ করে—দানধ্যান করে—কেন জান ? পুন্নাম নরক থেকে সে ছেলে যত ত্রাণ করুক আর না করুক—ইহকালের দুঃখকষ্ট থেকে ত্রাণ করবে এ আশাটা কোন্ বাপে না করে থাকে ? অথচ—

একটু থেমে বললেন, আশার অন্ত নেই বলে এত কষ্ট ভোগ করি আমরা। পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে বিপিন রায়ের হাতে দিয়ে বললেন, তুমিই পড়ে বল তো বিপিন—এই কথাগুলো লেখা তার ন্যায্য হয়েছে কিনা ? আমি যা পেনসন্ পাই—তাতে জীবিত কাল পর্য্যন্ত নিজের ভাবনা ভাবি না। চাকরি করে তোরই সংসার সচ্ছল হবে—তিনটে পাস দিয়ে এইটুকু বুদ্ধি যদি তোর ঘটে না থাকে তো···এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আপসোস হয় না ভাই ?

বিপিন সাগ্রহে চিঠিখানা নিয়ে ঈষৎ উচ্চস্বরেই পাঠ করতে লাগলেন :

বাবা, ক্ষমা করবেন। এক সপ্তাহ চাকরি করতে-না-করতে বুঝতে পারছি—এ জিনিস আমার সইবে না। দু-এক দিনের মধ্যে চাকরিতে ইস্তফা দেব ঠিক করেছি। সারা জীবন ধরে—এই দাস্যবৃত্তি ! দশটায় নাকে মুখে যা তা গুঁজে—ছুটতে ছুটতে আপিসে এসে হাজিরা দেওয়া—পাঁচটা পর্য্যন্ত একই চেয়ারে—কতকগুলো খাতাপত্র নিয়ে হিসাব ঠিক করা—এর চেয়ে বেঁধে মারলেও সহ্য করা যায়। তার ওপর যাঁরা উঁচু চেয়ারে বসে আছেন—তাঁদের খোসামোদ—সে খোসামোদের ধারা আপনি নিশ্চয় জানেন—এ রকম তোষামোদ করে একশটি টাকা পকেটে তুলতে এক মাসেই আমি শেষ হয়ে যাব। এত দিন লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন কি আমাকে এই জন্যে ? নিজেকে চেনবার যেটুকু

সুযোগ দিয়েছেন—দোহাই আপনার, চাকরির চাকায় পিষে তা নষ্ট হতে দেবেন না। আপনাকে মিনতি করছি—

এই পর্যন্ত পড়া হয়েছে—দুর্গামোহন বিপিনের হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে বললেন, ব্যস—ব্যস—এইটুকু পড়লেই হবে। এর পর ইনিয়ে বিনিয়ে পিতৃভক্তির নমুনা ছড়িয়েছেন। তাতে ওঁর সান্ত্বনা মিলতে পারে—আমার শান্ত হবার কথা নয়। বল' তো তোমরা—ওঁকে একশো টাকার একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে কি এমন মহা অন্যায় কাজ করেছি আমি—?

ওঁর উচ্চ কণ্ঠস্বরে ঘরটা গম গম করে উঠল। প্রচণ্ড একটি আঘাত ওঁকে অপ্রকৃতিস্থ এবং ক্রোধাবিষ্ট করেছে এ সবাই বুঝলেন। বুঝে সবাই যেন সেই দুঃখকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

সান্ত্বনার স্বরে বিপিন বললেন,—দুঃখু করে লাভ নেই দুর্গা, একালের ছেলেগুলোর ধারাই এই।

দুর্গামোহন তাঁর পানে ফিরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, তুমি এ কথা বলতে পার না বিপিন—তোমার তিন ছেলেই চাকরি করছে—তারা তোমার অবাধ্য নয়।

বিপিন বললেন,—সে ভগবানের দয়া, দুর্গা। কথাটা যখন তুললেই তো বলি—লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে ছেলেদের আমি বরাবর শাসনে রেখেছি। চাকরি করার মত বিদ্যে হবামাত্রই ওদের কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছি—বিয়ে দিয়েছি।

কালীকৃষ্ণ হেসে বললেন,—তোমার হিসাবে ভুল থাকবার কথা নয় বিপিন—কেননা, তোমার ঠাকুরদাদাও চাকরি করে গেছেন। ছেলেকে নিয়ে হ'ল গিয়ে চার পুরুষ।

বিপিন এই শ্লেষ বুঝতে পেরে ঈষৎ উত্তপ্ত স্বরে বললেন,—হাঁ, শুধু

জমি থাকলে মানুষের পেট ভরে না, এটুকু ঠাকুরদা বুঝতে পেরেছিলেন বৈকি! ধারে গলা ডুবিয়ে জমিদার সেজে বসবার যোগ্যতা তো সকলের থাকে না।

বক্র-কটাক্ষে কালীকৃষ্ণও বিচলিত হয়ে হাত উঠিয়ে কি একটা চড়া উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন—দুর্গামোহন বললেন,—তোমার কথা পুরোপুরি না মানলেও—কিছুটা মানি বিপিন। কিন্তু এইটিই বুঝতে পারছি নে—আজকের দিনে চাকরি না করে—আমাদের মত গৃহস্থের ছেলেদের গতি কি! স্কুলে-পড়া ছেলেরা হুজুগে মাতে—বড় বড় কথা বলে—কল্পনা করে—আদর্শের স্বপ্ন দেখে—এ সবের অর্থও বুঝি—কিন্তু উপার্জ্জনের টাকা হাতে পড়লে—তারা কি বদলে যায় না? যে যাই বলুক—টাকা হাতে পড়লেই না মানুষ সত্যিকারের স্বাবলম্বী হতে পারে। দয়া দান ধ্যান পুণ্য ব্রত স্বদেশ-সেবা সবই কি টাকার খেলা নয়?

সবাই মাথা নেড়ে স্বীকার করলেন।

তুমি একবার কলকাতায় যাও দুর্গা। প্রথমে ভাল কথায় বুঝিয়ে না হয় ধমক দিয়ে—না হয় কিছুদিন ওখানে থেকে যাতে চাকরিতে তার মনটি বসে তাই করে এস। ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করে বসলে চিরটা কাল কষ্ট পাবে ছেলেটা।

হাঁ—এ আমার কর্ত্তব্য। নাবালক ছেলে সাবালক করা—সাবালক ছেলেকে টাকা উপার্জ্জনের তত্ত্ব বুঝিয়ে দেওয়া—এ সবই বাপেদের কর্ত্তব্য! হো হো করে উচ্চ হাসি হাসলেন দুর্গামোহন।

২

দুপুর বেলায় মেঝেতে আঁচল বা মাদুর পেতে শুলেই কিছু ঘুম আসে না। বসু-গৃহিণী হেমলতা বলেন, সারাদিন খাটুনির পর একটু গড়িয়ে নেওয়া—ঘুম নয় ভাই, আলিস্যি ভাঙা—তাও কি সুস্থির হয়ে দু'দণ্ড···বন্থি পাশাখেলা!

ছোট বউ সুচিত্রা ডিবেয় করে দুটি পান—জার্মান সিলভারের ছোট কৌটায় করে দোক্তা আর কাঁসার গ্লাসে এক গ্লাস জল শিয়রের কাছে রেখে বলে, মা—পাকা চুল তুলব?

হেমলতা বলেন,—না। তুমি শোও গে।

পাকাচুল তোলার বিলাস হেমলতার নাই। নরম হাতের ছোঁয়ায় মাথায় সুড়সুড়ি লেগে বেশ আরাম হয়—ঘুমটাও দু'চোখের পাতায় জড়িয়ে আসে—যদিও তিনি স্বীকার করেন না চোখ বুজলেই ঘুম আসে। কিন্তু এক দণ্ডের আরাম নিতে গিয়ে নিজেকে হতশ্রী করার কোন মানে হয় না। একেই ওঁর মাথার চুল [illegible]তলা—ছোট। মরা খুস্কি কিনা ভগবানই জানেন—চিরুণী ঠেকালে[illegible]গোছা গোছা উঠে আসে। কত গন্ধ তেল, কত ওষুধ—কিছুতেই কি কিছু হ'ল! ফাল্গুনে পাতা ঝরার মত—বার মাস চুল উঠছে তো উঠছেই। এর ওপর মানুষের হাত লাগলে কি আর রক্ষা আছে!

স্বামী বলতেন,—সংসারের খাটুনি বেশি বলে ভগবান তোমায় দয়া করেছেন—চুল বাঁধার পরিশ্রম থেকে বাঁচিয়েছেন।

হেমলতা কৃত্রিম ক্রোধে বলতেন, কেন,—আমার কি চুল বেঁধে দেবার লোকের অভাব—না কারো চুল বেঁধে দিই না? তোমার সংসারে এসে কোনদিন গতর কোলে করে বসে আছি—বলুক দিকি কেউ এ কথা!

কথান্তর বা মনান্তর যাই হোক—প্রভাতের মেঘ-গর্জ্জনের মত আজও তা স্মৃতিতে শ্রুতি স্পর্শ করে উন্মনা ক'রে দেয়। সে সব দিন আর আসবে না।

আজও শোবার আগে যথারীতি মন্তব্য করে চোখ বুজলেন—কিন্তু সত্যিই ঘুম তাঁর এল না। দান জেতার পর থেকেই ওদের বৈঠকখানা নিস্তব্ধ হয়ে গেল কেন? যে চীৎকারের তালে ঘুমের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়—তা যেন ব্যাহত হ'ল। ওরা ঘর ছেড়ে চলে গেল কি? না অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে? বিপিন একবার প্রশান্তর নাম করলেন না? প্রশান্ত চাকরি করছে? একটি নিঃশ্বাস কোনমতে বুকের মাঝে আটকানো গেল না। তা হবে বৈকি। বাপ পাচ্ছে মোটা পেনসন্—ছেলের হ'ল মোটা টাকা মাইনের চাকরি। ভগবান যখন দেন···কিন্তু আনন্দ-সংবাদ এমন চুপি চুপি চুরি করার মত ফিস্‌ফিসিয়ে বলছে কেন ওরা? তবে কি···

পাশমোড়া ভেঙে উঠে বসলেন। শিয়রে রাখা গ্লাস থেকে খানিকটা জল খেলেন—একটি পান ও দু' আঙুলে তুলে খানিকটা দোক্তা গালে ফেললেন, তারপর বসে বসেই দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওদের বৈঠকখানার হাফ্ জানালাটা এ ঘরের রোয়াকের ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বলতে হবে।

চিঠির যেটুকু পড়া হ'ল—সবই কানে গেল—ওদের মন্তব্যও। দু'চোখ থেকে তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল—শ্রমক্লিষ্ট বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল প্রসন্ন দীপ্তিতে হ'ল উদ্ভাসিত। বারান্দা থেকে রোয়াকের শেষপ্রান্তে এসে দেওয়ালের গায়ে মিশে বসে রইলেন—আরও কিছু শোনবার আশায়।

কিন্তু আর কিছু শোনা গেল না। অকালে পাশার আড্ডা ভেঙে

গেল—বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করে দুর্গামোহন অন্দর মহলে চলে গেলেন।

হেমলতা ডাকলেন, ছোট বউমা—অ ছোট বউমা—একবার শোন তো মা।

দোতলার ঘরে বুকে বালিশ দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় সুচিত্রা একখানি চিঠি লিখছিল। পাশে খোলা পড়ে ছিল আর একখানি নাতিদীর্ঘ পত্র—তারই প্রত্যুত্তর। স্বামী মলয় নাতিদূর প্রবাস শহর কলকাতায় থাকে। চাকরি করে কিনা সে সম্বন্ধে সুচিত্রা সুনিশ্চিত নয়—তবে উপার্জ্জন করে সে। কোন একটা আপিসে দশটা পাঁচটার বাঁধা খাটুনিতে মাসকাবারের বাঁধা মাইনে নয়; তার উপার্জ্জনের টাকা কখনও সংসারে আসে—কখনও আসে না। মেজ ভাসুরের মত তা নিয়মিত নয়—আর মেজ ভাসুরের মত শনিবার সোমবারের আসা-যাওয়ার ফাঁকে রবিবারের ছুটিটা সে বাড়ির আবহাওয়ায় প্রিয়পরিজনদের মধ্যে কাটাবার সুযোগও পায় না। তার দেশে আসা অনিয়মিত বলেই চিঠিটা নিয়মিত চলে। সেকালের মেয়েরা দেখলে বলতেন, এ আবার কি চিঠি লেখার শ্রী! হিন্দু গৃহস্থ ঘরের বউ—স্বামীকে পত্র লেখার পূর্ব্বে একটি ভক্তি- কিংবা প্রণয়বাচক সম্বোধনের দ্বারা অভিহিত করে না—পত্রশেষেও ভক্তি-ভালবাসার কোন চিহ্ন নেই। কালের ধারা কতই দেখব!

সত্যিই ওদের চিঠি অনাড়ম্বর—পরস্পরের নাম ধরেই পত্রালাপ আরম্ভ করে—আর যে সব বিষয় তাতে আলোচিত হয় তাতে প্রণয়ের বাষ্পবিন্দুও থাকে না। ভাষা আবেগ-পুঞ্জিত অশ্রু গদগদ নয়—না আছে কাছে আসবার জন্য আকুল আবেদন—না প্রকাশ পায়—দূর ও দীর্ঘ বিরহের জন্য অন্তরের বেদনা।

মলয় লিখেছে: এবার একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলাম

সুচিত্রা। আই, এন, এর আব্দুল রসিদ-দিবসটা কি ভাবে শহরে ছড়িয়ে পড়ল—তা বোধ হয় কাগজে পড়েছ। *কাগজ ঠিক সময়ে মফঃস্বলে গেছে কিনা সন্দেহ—কারণ যান-বাহন চলাচল, আপিস, ইস্কুল, সবই বন্ধ হয়ে গেছে। এই আন্দোলনের জোয়ারে যারা ভিন্ন ধর্মী বলে দূরে সরে ছিল—তারা এক জায়গায় এসে মিশল—যারা খণ্ড ভারতবর্ষের দাবিতে রাজনৈতিক সমস্যাকে জটিল আর 'কুইট ইণ্ডিয়া' নীতিকে বিলম্বিত করে তুলছে—তারাও এসে মিশল—জন-গণের সঙ্গে। অখণ্ড ভারতবর্ষের অখণ্ড একটি জাতি বন্দুক বেয়নেটের সামনে নির্ভীকভাবে বুক পেতে দাঁড়াল। যদি কোনদিন কোন ভিন্নমুখী স্রোতে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ও—তবু এ দিনের কথা আমরা ভুলতে পারব না।···প্রায় দু'শো বছরের—কায়েমি শিকলে যে ঝঞ্ঝনা উঠল—তার ধ্বনি—মনের গভীর থেকে যে অগ্নিবাণী উচ্চারিত হ'ল তার প্রাণশক্তি—আমরা ভুল করে নিছক ভাবের উচ্ছ্বাস বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। এই সত্য স্পষ্ট নির্ভীক জাগরণের মন্ত্র কোন নির্জ্জিত দেশ—কোন-না-কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে উচ্চারণ করে ফেলে। রাজনীতির গোলকধাঁধা পার হয়ে পৃথক জাতিত্বের গণ্ডী ভেদ করে—আব্দুল রসিদ-দিবসে আমরা এক সুবিস্তীর্ণ মিলন-তোরণের সামনে এসে পৌঁছেছি মনে হচ্ছে। একটা প্রলয় ঝঞ্ঝা—অগ্নির তরল স্রোত—বারুদের ধোঁয়া আর শহীদের রক্ত—এই উন্মাদনায় কলকাতা আজ ভাসছে। সাইগনের রেডিওতে ধ্বনিত হচ্ছে—ভারতবাসী হিন্দুমুসলমান এক হও। Give me your blood—I promise you freedom.

দুটি পৃষ্ঠা মলয় তার আত্মহারা ভক্তি দিয়ে ভরিয়েছে। সে তীব্র অনুভূতিতে সুচিত্রা আচ্ছন্ন—অভিভূত হয়েছে বলেই কাগজ নিয়ে বসেছে প্রত্যুত্তর দিতে। এই অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী নয়। সংসারের নানা খুঁটিনাটি

কাজ ও কর্ত্তব্য—বাইরের জগৎ আড়াল করে রাখে। কোন মুহূর্ত্তে সে জগৎ প্রকাশিত হলেও মনের বিচিত্র অনুভূতিতে তা রসসিক্ত ও পল্লবিত হবার সুযোগ পায় না। বৃহৎ কোলাহলের মধ্যে পরাধীনতার মর্ম্মব্যথা প্রকাশের সুবিধা হয়তো ঘটে—তুচ্ছ কতকগুলি বিরামবিহীন সাংসারিক কাজ—যা সংসারের ছন্দ বজায় রাখে এবং বৃহৎ অনুভূতির মূলে আঘাত করে তার মধ্যে সুখদুঃখ ভরা মনের সাক্ষাৎকার ঘটা দুর্লভ বই কি। দিনরাত্রির কোন কোন ক্ষণে সেই দুর্লভ-দর্শন মুহূর্ত্তগুলি আসে, তাতে মন আচ্ছন্ন হয়—চঞ্চল হয়—আর প্রকাশ-ব্যথায় টন্ টন্ করতে থাকে। প্রিয়বিচ্ছেদবেদনার সঙ্গে মেশে বলে এই অনুভূতির মিতালী গাঢ় ও গূঢ় কিনা সুচিত্রা জানে না—তবে নির্জ্জন দুপুরের এই অসামান্য মুহূর্ত্তে উদ্বেল মনের ভক্তি-বেদনা-প্রণয়-সন্ধুক্ষিত ভাবকে ভাষান্তরিত না করলে এর সুকুমার আয়ু বাইরের শুষ্ক পৃথিবী নিঃশেষ করে দেবে। অভিনিবেশ সহকারে সুচিত্রা চিঠি লিখছিল।

হেমলতার ডাকে তার অনুভূতিতে রূঢ় আঘাত লাগল। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়ে সে ভাবলে উত্তর দেবে না—ঘুমিয়ে পড়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে চুপচাপ থাকবে। কিন্তু সুকুমার ভাব ওই ডাকের প্রথম আঘাতেই আকাশে পাখা মেলে দিয়েছে। একদিক দিয়ে বিরক্তি আর একদিক দিয়ে শাশুড়ীকে ফাঁকি দেবার যন্ত্রণা—মস্তিষ্ককোষে উত্তেজনা সঞ্চার করেছে। বিদ্যুতের মত গতি এদের—কখন পালায় আর কখন জুড়ে বসে—মানুষ ভেবে উঠতে পারে না। কর্ত্তব্য এই ফাঁকে সজাগ হয়ে উঠল—এই সামান্য সময় গেলে তোমার কতটুকুই বা ক্ষতি! দু' দণ্ডের দরকার মিটিয়ে আবার তুমি লেখায় মনোযোগ দিতে পারবে।

সুচিত্রা দুয়ার খুলে বাইরে এল।

ঠিক দু' দণ্ড নয়—হেমলতার নাতিদীর্ঘ অভিযোগগুলি অমনোযোগের সঙ্গে গ্রহণ করলেও মনেতে তার প্রতিক্রিয়া লঘু হ'ল না। দুপুর তখনও নিস্তব্ধ, কয়েকটি লাইন আঁচড় কাটা কাগজখানা অভাবিত মুহূর্ত্তের সাক্ষ্যস্বরূপ একখানি মাসিক পত্রের শয্যায় অল্প অল্প নড়ছে—কিন্তু কলম নিয়ে অত্যন্ত একাগ্রচিত্তেও সে হারানো মুহূর্ত্তকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না। দুর্লভ মুহূর্ত্তগুলি স্পর্শভীরু।

ছোট্ট বুক-শেলফে খানকতক বই রয়েছে, অবসর বিনোদনের উপায়স্বরূপ নয়—চিন্তার জটিল মুহূর্ত্তের মুক্তি-সহায়ক। একঘেয়ে সংসার—ভোঁতা ও ভারি কাজের প্রহারে চিন্তাকে জর্জ্জরিত করে দেয়—বুদ্ধিতে আনে জড়তা। এক একটি দিন আসে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মত নিঃশ্বাস রোধকর—মৃত্যুর ইঙ্গিত বয়ে আনে তার মুহূর্ত্তগুলি। সুচিত্রার তখন প্রয়োজন হয় ওই বইগুলিকে; ওরা পরিত্রাণ করে—ভোঁতামি থেকে—অন্ধকার থেকে—মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙ্গন থেকে। তখন যে জগতে তার দিন রাত্রির অনুবর্ত্তন চলে—সে জগৎ অন্তহীন—অতলস্পর্শী অন্ধকারের মত বিভীষিকা দেখায় না। সুচিত্রা জানে এক দিন এই বাঁধন কাটবে—আলোয় ভরা জগৎ তার কর্ম্মবন্ধনে ধরা দেবে। বই না থাকলে সে কবে ফুরিয়ে যেত।

দুয়োরের বাইরে মৃদু করাঘাতের শব্দ। কে? মৃদু কণ্ঠে সুচিত্রা প্রশ্ন করলে।

আমি। মেজ জা মন্দাকিনী। চিঠির কাগজ গুছিয়ে সুচিত্রা দুয়োর খুলে দিলে।

হৃষ্টপুষ্ট দেহ—এক গাল পান—মাথায় জলজলে সিঁদুর মেজ জা মন্দাকিনী ঘরের মধ্যে এসে বসলে। এক গাল হেসে বললে,—শুনেছিস, মা বলছিলেন—ওদের প্রশান্ত নাকি চাকরি করবে না?

সুচিত্রা এ সব খবর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভালবাসে না। মাছি যেমন এক ফোঁটা খাবার জিনিসের চারধারে ভন্‌ভন্‌ করে বেড়ায়—তেমনি কতকগুলি লোকের স্বভাব ছোটখাটো বিষয়কে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে রসিয়ে পাঁচ জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া। সেই ক্ষুদ্র বস্তু থেকে দূরে যাবার ক্ষমতা তাদের নেই।

মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে বললে,—তা সবাই যে চাকরিই করবে—মেজদি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মন্দাকিনী বিস্ময়ের সুরে বললে,—ওমা, চাকরি করবে না তো পুরুষমানুষ করবে কি শুনি?

সুচিত্রা হাসিমুখে বললে,—তা বটে—।

মন্দাকিনী তার হাসিটাকে উপেক্ষা মনে করে ভারি গলায় বললে,—ওঃ মনে ছিল না—তোমরা আবার চাকরিটাকে দাস্যবিত্তি বল কিনা!

সে রাগ করে পিছন ফিরতেই সুচিত্রা খপ করে তার একখানি হাত ধরে বললে,—রাগের কথা নয়—সত্যিই বল দিকি মেজদি—যে কাজে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা খাটানো চলে না তা দাস্যবৃত্তি ছাড়া কি?

হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে মন্দাকিনী বললে,—জানি না—জগৎ জুড়ে সবাই যা করছে, তা যদি মন্দ হ'ত কেউ করত না।

সুচিত্রা বললে,—জগতের কথা আমরা কতটুকু জানি মেজদি! কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখলাম—সেবার তোমার ভারি অসুখ দেখেও মেজ ভাসুরকে কলকাতায় যেতে হ'ল। কি-না বিনা নোটিশে কামাই করলে চাকরির ক্ষতি হতে পারে। আচ্ছা সত্যি বলতো মেজদি—তোমার তাতে একটুও কষ্ট হয় নি? বলে সুচিত্রা ওকে দু'হাতে বেষ্টন করে ধরলে।

মন্দাকিনী হেসে ফেললে। সুচিত্রার ওপর ওর রাগ হয়, মমতাও

হয়। এমনি ভাবে ছেলেমানুষি করলে কার না স্নেহ হয়—হাসি আসে। ওরা এত লেখাপড়া শিখেও মনের দিক দিয়ে গিন্নিত্ব লাভ করে নি। বিদ্যেটা ওদের বাইরের চটক—সংসারে ওদের মত অসহায় বুঝি দুটি নেই।

মন্দাকিনী বললে,—আমার কষ্ট হয় কিসে জানিস? ঠাকুরপো ফি হপ্তায় বাড়ি আসে না বলে।

সুচিত্রা বললে,—তাকে সে কথা বল না কেন?

বলেছি—ফল হয় নি। ওরা একালের ছেলে—আর কিছু না থাক, বাহাদুরিটা তো আছেই। কিন্তু এ-ও বলে রাখছি, এক দিন পস্তাতে ওকে হবেই। কাজের সময় কাজ না করলে বিধাতাপুরুষের সাধ্য নেই যে মানুষকে সুখী করেন।

সুচিত্রা বললে,—বিধাতাপুরুষ সবাইকে সুখী করেন না—মেজদি।

সে দোষ মানুষের, না বিধাতা পুরুষের?

অদৃষ্ট মানলে বলতাম—অদৃষ্টের। সুচিত্রা হাসলে।

মন্দাকিনী পুনশ্চ গম্ভীর হ'ল। বললে,—জানি—হিঁদু হয়ে তোমরা অনেক কিছু মান না। এ ভাল নয়। সে যাবার জন্য পা বাড়ালে।

সুচিত্রা মন্দাকিনীকে বাধা দিলে না। হিঁদুয়ানি যাকে বলে—এঁদের মুখে সে বহুবার শুনেছে। আচার-বিচারের নিখুঁত বিধান ও উপবিধান—সে সবের অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত—ইহকালের শাস্তি ও পরকালের নরক ভোগ—এ সব বহু জনের কাছ থেকে অসংখ্যবার সে শুনেছে। শুনেছে—শ্রদ্ধা করতে পারে নি। খুঁত ধরা কিংবা খুঁত খুঁত করা তো স্বভাবের বশেই ঘটে এবং সংস্কার—বিচার এসবকে যুক্তি বলে খণ্ডন করা—এতেও স্বভাবের ক্রিয়া প্রকট। কার্য্য-কারণের উপলখণ্ডকে নাড়া দিয়ে প্রবল বেগে যে কালের স্রোত ছুটে চলেছে—

তার ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করলে—কার্য্য কারণকে উপলব্ধি করা যায় না। সংসারে এগিয়ে চলার কথা বললে—এঁরা নাসিকা কুঞ্চিত করবেন—থামলে বলবেন—সাবাস।

কিন্তু বাহাদুরি নেবার মত শিক্ষা সুচিত্রা পায় নি।

৩

হেমলতার স্বামী অঘোরনাথ শেষ বয়সে চাকরি নেন। পিতৃপুরুষের উপভোগ-অবশিষ্ট যে ক' বিঘা জমি ছিল—তাতে পেটের ভাত ও পরনের কাপড়ের সংস্থান হলেও—সংসার দিন দিন বেড়ে উঠছিল। খাওয়া-পরা ছাড়াও নানান রকমের খরচ—যা জমির উপস্বত্ব থেকে মেটানো দুঃসাধ্য। শেষ বয়সে চাকরি নিতে হ'ল—জমিদারি সংক্রান্ত কাজে। তারই আয়ে ছেলেরা বিদ্যা শিখলে—হেমলতার তীর্থধর্ম, বারব্রত যথাসাধ্য হ'ল; পুরাতন ঘর মেরামত—খাজনা ট্যাক্স মিটান—বারোয়ারির চাঁদা—বৌ-ভাত—অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মর্য্যাদা অনুযায়ী সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কা এ সংসারকে বিশেষ কাবু করতে পারে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও শেষের দিক থেকে ভয় দেখাচ্ছিল—ছেলেরা উপার্জ্জনক্ষম হওয়াতে সে আঁচও তেমন গায়ে লাগে নি। জমির ধান ক'টা তেরশো পঞ্চাশে শুধুই মহাদুর্ভিক্ষ থেকে প্রাণ রক্ষা করে নি—উদ্বৃত্ত ধানের বিনিময়ে কিছু ধন ক্যাশ-বাক্সে এনে দিয়েছে। জমি যে লক্ষ্মী এ কথা তেরশো পঞ্চাশ ভাল মতেই প্রমাণ করে দিয়েছে। বউরা বলতে নেই—ভাল ঘর থেকেই এসেছে। প্রাচীন আচারনিষ্ঠা-প্রবণ সংসার থেকে এসেছে বড় ও মেজ, ছোটকে এনেছেন—এ কালের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে। এ বাড়িতে সে বিদুষী

আখ্যা পেয়েছে। ছেলে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছিল—আর শহরে এই শিক্ষার সুযোগেই সুশিক্ষিত এক পরিবারের সঙ্গে তার আলাপ ঘটে। সুচিত্রার সঙ্গে তার পূর্ব্বরাগ যতটুকু ঘটে থাক—এ বাড়িতে তা নিয়ে বিস্ময়-মিশ্রিত আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে। বিয়ের পর অবশ্য আলোচনাটা গোপনেই চলত—তবে মেজবউ মন্দাকিনীর মন থেকে খুঁৎখুঁতুনি যায় নি। তারা এ সংসারে এসেছে স্ব মহিমায়—সপ্তপদী মন্ত্রের পুণ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে—আর সুচিত্রার বিয়ে লোকাচারের অনুষ্ঠানগুলি পালন করেও—বহুদিন লোকায়ত্ত মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যে বধূ উপযাচিকা হয়ে আসে—তার প্রতিষ্ঠা বিলম্বেই ঘটে। যাই হোক, সুচিত্রাও এখন সুপ্রতিষ্ঠিত বলতে পারা যায়।

এটি ছোটখাটো দুর্ঘটনার অন্তর্গত হলেও বড় দুর্ঘটনা এ সংসারে ঘটেছে বৈকি। কর্ত্তার স্বর্গারোহণ—সেটা কালধর্ম্মের অন্তর্গত—বড় ছেলে মথুরামোহনের বিয়োগটাই মর্ম্মান্তিক। মথুরামোহন তেজী স্বভাবের ছেলে—চাকরি করতে রাজী হয় নি প্রথমটা। প্রতিজ্ঞা করেছিল—বিদেশীর আপিসে সে কিছুতেই দাসখত লিখে দেবে না। স্বদেশীয়ানা তার ছিল না—ওই দশটা পাঁচটার ওপর বিরাগ ছিল অসীম। ছেলেবেলা থেকেই গানবাজনা—আড্ডা ইয়ারকি এই সবে আনুরক্তি-বশতঃ বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে বসে দিনের পর দিন একই রকমের কাজ করে যাওয়া তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। যে কাজে উত্তেজনা নেই—সে কাজ আবার মানুষে করে! শেষ পর্য্যন্ত কাজ অবশ্য তাকে নিতেই হয়েছিল—তবে আপিসের চাকরি নয়। বাবা তাকে জোর করে বসিয়েছিলেন—এক জমিদারি সেরেস্তায়। সেখানে দিন কতক কাজ করে ও পালিয়ে গেল—পশ্চিমের কোন শহরে। কিছুদিন পরে ফিরে এল কিঞ্চিৎ বিনয়ী হয়ে। সবাই ভাবলে বিদেশের কষ্টে ওর সমুচিত

শিক্ষা হয়েছে—হয়ত বা মতিও ফিরেছে। বাবা অনেকক্ষণ ধরে ধমকালেন—ও মাথা হেঁট করে শুনলে।

ওর সহিষ্ণুতা দেখে বাবা অবাক হয়ে বললেন, বলি টো টো করে ঘুরলেই দিন কাটবে—না উপার্জ্জন করে দশ জনের একজন হবি?

ছেলে বললে, চাকরি করব—তবে আপিসে নয়।

সায়েবের আপিসে তো তোমায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় নি বাপু।

ও রকম খাতা লেখার কাজ আমার পোষাবে না—ঘাড় পিঠ টন্ টন্ করে।

তবে কি লাটসায়েবী তোমায় জোগাড় করে দিতে পারি?

কেন—নায়েব-টায়েব কোনখানে—

সেও তো লিখতে হবে—খাটতে হবে—প্রজা শাসন করতে হবে—

তা হোক—আমি নায়েবি করব।

অঘোরনাথ কালবিলম্ব করলেন না—তার পরদিনই ছেলেকে নিয়ে রওনা হলেন কাঞ্চনপুরে। গ্রাম থেকে দশ ক্রোশ দূরে—কিন্তু দূরই ভাল। বাড়ির কাছে—আড্ডা ইয়ারকির পুরোনো টানটা চাকরির ক্ষেত্রে অনুকূল হবে না বলেই এই ব্যবস্থা। নায়েবি পাওয়া খুব সহজসাধ্য ছিল না—এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার দরকার বটে। তবে বাপের অনুরোধে ছ'মাসের কড়ারে ছেলে শিক্ষানবিশীতে রাজী হয়ে গেল। মাইনে নামমাত্র, খাটুনিটাও উপেক্ষণীয় নয়, তবু মথুরামোহন এই চাকরি স্বীকার করে নিলে। নায়েবরা জমিদারের অধীন হলেও বহু ক্ষমতা তাদের হাতে। প্রজা শাসন ব্যাপারে তারা নিরঙ্কুশ। যখন খুশি কাছারিতে আস—যখন খুশি ঘুরে বেড়াও—আড্ডা ইয়ারকি দাও কেউ বলবার নেই। আর রাত্রিতে অনুগতদের সাহচর্য্যে—গানবাজনা—পান ভোজন···অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত স্বপ্নের মত কেটে যায়। ছ'মাস পরে

বাবাকে সে চিঠি লিখলে, আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে কাঞ্চনপুরের নায়েবি পদে পাকাপাকিভাবে বাহাল হইয়াছি জানিবেন।

বাড়ির সবাই খুশি হয়ে দেবতার মানত শোধ দিলেন—কেউ কেউ নূতন মানতও করলেন।

প্রথম বছরের উপার্জ্জিত টাকায় বাড়িটা আগাগোড়া মেরামত করা হ'ল। তার আট মাস পরে কর্ত্তা গত হলে—দানসাগর শ্রাদ্ধ করে মথুরামোহন যথেষ্ট নাম কিনলে। সবাই বললে—এক ছেলে হতেই কুল উজ্জ্বল হয়—দেখ না আমাদের মথুরাকে।

তারপর একদিন হেমলতা যথারীতি ছুপুরে পান জরদা খাবার জল শিয়রে রেখে সবে চোখ বুজেছেন, এমন সময় কড় কড় শব্দে সদর দরজার কড়া বেজে উঠল। বাড়িতে কেউ পুরুষ মানুষ না থাকায় হেমলতাই উঠে দরজা খুলে—ছু' পা আতঙ্কে পিছিয়ে এলেন।

লাল পাগড়ী মাথায় ছু'জন পাহারা-ওয়ালার মাঝখানে খাকি হাফ্‌প্যাণ্ট পরা একজন সায়েব তাঁর পানে কট্ মট্ করে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এইটাই তো মথুরামোহনের বাড়ি? আপনি তার কে হন?

সায়েবের পিছনে সারা গাঁ ভেঙে পড়েছে। ওঁর হয়ে তারাই জবাব দিলে। সে সওয়াল জবাবের বেশির ভাগই হেমলতা বুঝতে পারেন নি—তবে ভয়ে তাঁর বুক গুর গুর করে উঠেছিল। লাল পাগড়ী যে শুভ সন্দেশবহ নয় এ কথা গ্রামের একজন অজ্ঞ নিরক্ষর লোকও বুঝতে পারে। অচিরে তাঁর আশঙ্কা সত্য হ'ল—পাড়ার লোকে জানিয়ে দিল পুলিসে বাড়ি খানাতল্লাসী করবে। মথুরামোহন কাঞ্চনপুরে এমন এক কাণ্ড করেছে যার ফলে পুলিস এসেছে তল্লাসী করতে। হাঁ—ঘটনাটা পাড়ার কয়েকজন বর্ষীয়ান সবিস্তারে (এবং সোৎসাহে) বলে গেলেন। নায়েবি করে মথুরা নাকি সদরে খাজনা পাঠায় নি—এদিকে লাটের

কিস্তির দায়ে জমিদারী নীলাম হয় দেখে সদর থেকে ম্যানেজার মশাই এলেন তদন্ত করতে। তিনি যে দিন আসবেন তার আগের দিন রাত্রিতেই এক ঘটনা ঘটে। তহবিল তছরুপ ধরা পড়বে—এই আশঙ্কাটা প্রবল হওয়াতে প্রমোদ-বাসরে মথুরা অপরিমিত মদ্য পান করে। তারপর সারারাত্রি ধরে চলে তাণ্ডব নৃত্য। পরিশ্রান্ত পারিষদেরা মেঝেয় অর্দ্ধ উলঙ্গ ভাবে গড়াগড়ি যাচ্ছে—আলোর তেল কমে এসে বাতিটাও হয়েছে নিবু নিবু—মথুরা কিন্তু জ্ঞান হারায় নি। রাত্রি প্রভাতেই তার হিসাব-নিকাশ দাখিল করার কথা—এ কথাটা সুরার উগ্রক্রিয়ার মধ্যেও সে ভুলতে পারে নি। অসহায় রায়তের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্যের শেষ হবে কালকের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে—এ কথা সে ভাবতেই পারে না। যে করে হোক—মান তথা প্রতিপত্তি বজায় রাখতে হবে। চট্ করে একটা ফন্দী তার মাথায় আসতেই অর্দ্ধ-অচেতন বার-বধূর হাত ধরে একটা হেঁচ্কা টান দিয়ে বললে, শুনছিস্ ?

'উঃ', বলে মেয়েটি তন্দ্রা-শিথিল দেহ থেকে সব আলস্য ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসল।

শোন্। মথুরা তার চোখের ওপর রক্ত-রাঙা দৃষ্টি মেলে কর্কশ কণ্ঠে বললে,—তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে ?

টাকা !

হাঁ—চাবিটা দে দিকি—। বলে হাত বাড়াতেই মেয়েটি চীৎকার করে উঠল।

উত্তেজিত মথুরা—পাশের টুল থেকে খপ করে তোয়ালেখানা টেনে নিয়ে তার মুখের ওপর চেপে ধরলে। তারপর দু'জনে নিঃশব্দে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে মেয়েটি শ্রান্ত হয়ে ঢলে পড়ল মেঝেয়। মথুরা তখন উত্তেজনায় কাঁপছে—কোন দিকে দৃকপাত না করে ওর আঁচল থেকে

চাবির গোছা খুলে নিলে। নগদ টাকা আশানুরূপ পাওয়া গেল না—কাজেই অলঙ্কারের দিকে তার নজর পড়ল। মেয়েটিকে অলঙ্কার মুক্ত করতে করতে তার মনে হ'ল—সে কি সত্যিই অচেতন হয়ে পড়েছে? নিস্পন্দ নিথর দেহ—বুকের উঠা-নামা টের পাওয়া যায় না, নাকের কাছে হাত রেখে নিঃশ্বাসের একটু তাপও তো পাওয়া গেল না। তবে কি—?… হু-হু করে উত্তেজনা বহু ডিগ্রিতে নেমে এল। ভাল করে মেয়েটিকে পরীক্ষা করে সে বুঝলে—সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ নেই। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে তহবিল তছরুপের দায়ে কারাবাস না হোক নারী হত্যার দায়ে ফাঁসি বা দ্বীপান্তর তার অনিবার্য্য। নেশা ছুটে গেল। রাত বেশি নেই—এখনি যা হয় একটা করতে হবে। উপায় বেছে নিতে তার বিলম্ব হয় নি। সকালে মথুরামোহনকে খুঁজে পাওয়া গেল না—অলঙ্কার-বিহীনা মৃত মেয়েটির দায়ে বন্ধুরা ধরা পড়ল। মথুরামোহনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সবাই একবাক্যে জবানবন্দী দিলে। তারপর চলেছে এই অনুসন্ধান—যার ফলে দেশের বাড়িতে খানা-তল্লাসীর পরোয়ানা নিয়ে পুলিস দিয়েছে হানা।

হেমলতা এই দীর্ঘ কাহিনীর একবিন্দুও বিশ্বাস করলেন না—দালানে পা ছড়িয়ে বসে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলেন। পুলিসকে মনের ঝাল মিটিয়ে গাল দিতে না পেরে প্রতিবেশীদের মজা-মারা নিয়ে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্রয়োগ করলেন। তারপর পুলিস চলে গেলে তাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের নরকবাসের কামনা করলেন। এই ঘটনার ফলে বড় বউয়ের আরম্ভ হ'ল ঘন ঘন ফিট্, পরে তার মাথার গোলযোগও দেখা দিল। ফলে এই সংসারে থেকেও সে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। হেমলতা আরও জোরে আঁকড়ে ধরলেন সংসার, এবং পরের সংসারের দোষত্রুটি ভাল মন্দ নিয়ে ঘরে ঘরে লোকের কাছে বলে বেড়ানোই হ'ল

তাঁর সান্ত্বনা বা আনন্দ লাভের উপায়। বার বছর না গেলে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে মৃত বলে ঘোষণা করবার নিয়ম নাই, কাজেই বড় বউ সধবার আচার নিয়ম পালন করে যাচ্ছেন। অর্দ্ধ জ্ঞানে—অর্দ্ধ অজ্ঞানে যতটুকু করা সম্ভব তাই তিনি করেন—তাঁকে সামলে রাখবার দায়িত্ব নিয়েছে সুচিত্রা।

৪

হেমলতার প্রকাশ-বেদনা সুরু হ'ল। মন্দাকিনী ও সুচিত্রা এরা ঘরের বউ—বাইরের মন-রোচক খবর রঙ ফলিয়ে বিস্তার করে রোজ দু'তিন বার বলে যে সান্ত্বনা লাভ করবেন—সে তো হাতের পাঁচ রইলই—বাইরের ঘটনা না হলে আপাতত তিনি সুস্থ হন কি করে? সুচিত্রা খবরটা শুনলে—কোন মন্তব্য করলে না। মন্দাকিনী মন্তব্য করলে বটে—কথাটাকে বিস্তার করবার প্রয়াস পেল না—কাজেই তিনি দোক্তার কৌটো আচলে বেঁধে—বউদের উদ্দেশ করে বললেন, সদর দরজাটা দাও বউমা—আমি একবার আশুর মায়ের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

পথে বেরিয়ে মনে হ'ল—আশুর মায়ের কাছে না গিয়ে প্রশান্তদের বাড়িতেই প্রথমে গেলে ভাল হয় না কি? খবর যতটুকু শুনেছেন—তাতে সবিস্তার পরিবেশনে বাধা জন্মাবে না—তবু সবটুকু খুঁটিয়ে শুনলে—রসবিস্তারে পাঁচ জনকে সুখী করে নিজেও পরিতৃপ্ত হবেন তো। তাই ভাল।

প্রশান্তর মা ঘরের ভিতর কুলোয় করে ডাল বাছছিলেন—মেয়ে শান্তি রোয়াকে ইট সাজিয়ে খুবি মুচি নিয়ে আসল সংসারের মক্স করছিল। দলিজ পেরিয়ে হেমলতা রোয়াকে উঠে বললেন, কিলো শান্তি—কি রাঁধলি? মা কোথায় লো?

শান্তি উত্তর দেবার আগেই ঘরের ভিতর থেকে প্রশান্তর মা বললেন, —এস দিদি।

কুলো রেখে তাড়াতাড়ি তিনি একখানি আসন পেতে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—পান খাবে দিদি?

ওমা—পান আবার খাব না—বলে পান দোক্তা চা এই নিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছি। নইলে বড় শত্তুর যে দাগা দিয়ে গেছে তারই জ্বালায় দিন রাত জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা। স্বরটি অশ্রুর আভাসে করুণ হয়ে উঠল—চোখে আঁচল ঘষে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

প্রশান্তর মা বললেন,—তুমি ভেবনা দিদি—মথুরা তোমার ফিরে আসবে।

তোমরা সতীলক্ষ্মী সেই আশীর্ব্বাদই কর মা। আর একবার আঁচল ঘষে তিনি ভাল হয়ে বসলেন।

প্রশান্তর মা দুটি পান সেজে—ছোট রেকাবিতে করে তাঁর সামনে দিয়ে বললেন,—দোক্তা লাগবে?

না ভাই—ওটি আমার কাছ ছাড়া হলে চলে না। এই দেখ সঙ্গের সাথী। বলে অঞ্চলগ্রন্থি মোচন করে কৌটাটি বার করলেন।

চুন দেব?

না ভাই—তোমার হাতের পান এমন চমৎকার যে চুন খয়ের সব সমান থাকে। এ গাঁয়ে এমন পান সাজতে তো আর কাউকে দেখি না। বলে—বাইরে উঠে গিয়ে বার দুই পিক ফেলে ঘরে এসে বসলেন।

তারপর—জিজ্ঞাসাবাদ হ'ল রান্না নিয়ে। মুগের ডাল খেলেই পেটে অম্বল-গোলা ওঠে তাই সবিস্তারে জানিয়ে হেমলতা বললেন,—তা অম্বলের আর দোষ কি ভাই—ভাবনায় চিন্তেয় দেহ পাত হয়ে গেল। ছেলে না হলে এক জ্বালা—হলে শতেক জ্বালা! এই দেখ না—নিন্দ্ ষী মথুরা—

বড়ছার জমিদারের পাল্লায় পড়ে বাছা যে কোথায় গেল! ছোটটা তাও চাকরিতে স্থিতভিত হ'ল না! শুনি তো—রোজগার করে দু'হাতে—ডোকলাগিরিও তেমনি। অযচ্ছল খরচ ভাই। কি সব স্বদেশীর দল—তাদের পেছনেই ঢালছে টাকা। বাড়িতে যখন দেয় ঢেলে দেয়—একেবারে দুশো পাঁচশো—তবে ন'মাসে ছ'মাসে তো! ষেটের বলতে নেই—সংসার তো ছোট নয়—মাস গেলে চারশো-পাঁচশো টাকা খরচ। রোজ বাজার খরচই বলে—তিন টাকা! কর্ত্তাদের যাই বিষয় সম্পত্তি কিছু ছিল তাই এতগুলি হাত মুখে উঠছে—নইলে কি হত ভাই!

তা ত বটেই। নিজেদের দিয়েই তো দেখছি ভাই—

এই বোঝ ভাই, নিজে হাতে সংসার না করলে কেউ খরচের মৰ্ম্ম বুঝতে পারে! সে দিন আশুর মা বললে,—রোজ তিন টাকা বাজার খরচ এ তোমার বড্ড বেশি ভাই! বড্ড বেশি হ'ল? এক টাকার জিনিসটা পাঁচ টাকায় কিনতে হচ্ছে, বেশি হ'ল? তবে যদি ছাই পাঁশ খেয়ে পেট ভরাতে হয় সে হলো গিয়ে আলাদা কথা! আলু কপি না হলে কেউ তরকারি পাতে পাড়বে না—চুনো মাছ আনবার যো নেই, শেষ পাতে দুধ সবারই একটু চাই—

তা ত বটেই।

এই—যারা বুঝদার—তাদের দুবার বলতে হয় না! কথায় আছে না—

পড়ল কথা সভার মাঝে
যার কথা তার গায়ে বাজে!

আশুর-মার হলো গিয়ে তাই। বাপের বাড়ির যেমন হদ্দি খেতে গদ্দি নেই—শ্বশুরবাড়িতেও তেমনি! তোরা ভাল খাওয়া ভাল পরার মৰ্ম্ম কি বুঝবি লা?

প্রশান্তর মা মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

হেমলতা বললেন,—তাই বলছিলাম কি—ছেলের মত পরম মিত্রও নেই—পরম শত্তুরও আর নেই। এই তোমার প্রশান্তর কথাই ধর—রূপে গুণে বিদ্যেয় এমন ছেলে এ গ্রামে কমই দেখতে পাই। সোনা এক দিকে আর ছেলে এক দিকে—ওজন করলে তুল্য-মূল্য—তবু এ হেন সোনার ছেলের এমন মতিগতি হল কেন ভাই!

প্রশান্তর মা শুষ্ক স্বরে বললেন,—কেন দিদি—

না অন্য কিছু নয়। স্বভাব-চরিত্তির আচার-ব্যাভার ওসবে ছেলে তোমার তামার পাত্তরে গঙ্গাজল। শুনলাম ভাল একটি চাকরিও পেয়েছে। কিন্তু ছেলের নাকি চাকরিতে মতিগতি নেই?

প্রশান্তর মা বললেন,—আমাদের ঘরে চাকরি না করলে চলে? ও সব খেয়ালের কথা দিদি। কত্তা বলছিলেন—সেখানে গিয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে ছেলে যাতে চাকরি করে সেই ব্যবস্থা করবেন।

বেশ বেশ ভাই, মাথার থামিজ না থাকলে ছেলে ভাল হয়? বেশ ভাই—ভগবান ওর সুমতি দিন। তাই শুনলাম কিনা—কথা হচ্ছিল পাশা খেলতে খেলতে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বলি ওদের তো আর জমি-জমা বিষয়-আশয় নেই—চাকরি না করলে খাবে পরবে কি? আর একটি পান চেয়ে নিয়ে তিনি উঠলেন। আসল কথাটা জানা হয়ে গেছে—আশুর মার ওখানে এখন না গেলেই নয়।

সন্ধ্যা বেলায় বেড়িয়ে এসে দুর্গামোহন পত্নীকে ডেকে বললেন,—এ সব কি কথা বলেছ তুমি মথুরার মাকে?

পত্নী বিরাজমোহিনী সাশ্চর্য্যে বললেন,—কি বলেছি?

যে প্রশান্ত আমার কথা না শুনলে—আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করব।

বিরাজমোহিনী বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত্ত থ মেরে রইলেন।

দুর্গামোহন বললেন,—মথুরার মাকে তুমি ভালই জান—ওর সঙ্গে কোন কথা—

বিরাজমোহিনীর অত্যন্ত অভিমান হ'ল। মুখ ফিরিয়ে ভারি গলায় বললেন,—ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবে—এই কথা আমি বলেছি—তুমিও বিশ্বাস করলে ?

দুর্গামোহন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়—এ সম্বন্ধে আলোচনাটা—মানে সংসারের ভেতরের খবর বার করা—

তোমার বৈঠকখানার উত্তর দিকের জানালাগুলো আগে বন্ধ কর দিকি—

দুর্গামোহন অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললেন,—ঠিক—ঠিক—খেলতে খেলতে মাথার ঠিক থাকে না—তা কালকেই কলকাতায় যাই—কি বল ?

যাও—কিন্তু একটা কথা।

কি ?

মলয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না—বা কোন অনুরোধ তাকে করবে না। নিজের ছেলেকে শাসন কর—উপদেশ দাও নিজেই করবে।

দুর্গামোহন বললেন,—তুমি মিছে রাগ করছ। মলয়ের মা'তে আর মলয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ।

তা জানি। কিন্তু পরের খোঁটা সইতে পারব না তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি।

দুর্গামোহন হেসে বললেন,—আচ্ছা তাই হবে।

৫

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠবার মুখে মলয়ের সঙ্গেই প্রথমে দেখা হয়ে গেল। মলয় হেঁট হয়ে প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন,—ভাল আছ ত বাবা?

মাথা নেড়ে মলয় বললে,—হাঁ। আপনি হঠাৎ এলেন যে? কাকীমা ভাল আছেন?

ভাল। চল তোমার ঘরে। বলেই তার পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কি আপিসে চলেছ?

আপিস! অল্পক্ষণের মধ্যে বিস্ময় কাটিয়ে মলয় হাসি মুখে বললে,—আমার তাড়া নেই—আসুন।

মেসের ঘর—লম্বায় চওড়ায় বাসগৃহের মত নয়—কোন রকমে দুটি সিটের ব্যবস্থা আছে। যারা সে ঘরে বাস করে তারাও গোছালো নয়—সারাদিন খাটুনির পর সন্ধ্যায় একটু বিশ্রাম ও রাত্রিতে নিদ্রা এই দুটি কাজ সুসম্পন্ন হলেই এর প্রয়োজন মিটে যায়। প্রয়োজনের বেশি কিছু করতে গেলে নিজস্ব রুচি ও শিক্ষার স্বাধীনতা চাই—বারো রাজপুতের তের হাঁড়ির ব্যবস্থায় সে ত সম্ভব নয়, কাজেই শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানিটুকু গায়ে না মেখে দিনের পারে দিনকে আর রাত্রি পিঠে রাত্রিকে ঠেলে দেবার আয়োজন করে এরা। কর্ম্মক্ষেত্রের জগৎ—বিশ্রামক্ষেত্রের জগৎ—বাইরের জগৎ বা বাড়ির জগৎ—এই ভিন্ন ভিন্ন জগতে বাস করে যারা—তারা কোন দিক দিয়েই অখণ্ড একটি সত্তা—তা সে রুচির হোক—বুদ্ধির বা চিন্তারই হোক গড়ে তুলতে পারে না। স্রোতে-ভাসা শেওলার মত—কিংবা শরৎকালের বায়ুস্তরবাহী হালকা মেঘের মত—তারা চলেছে ত চলেছেই।

হাতের ব্যাগটিকে মাটিতে নামিয়ে শিমুল কাঠের তক্তার উপর আসন গ্রহণ করলেন দুর্গামোহন। বললেন,—জানি তুমি আপিস যাচ্ছ না—খদ্দরের জামা গায়ে দিয়ে কেউ আপিস যায় না।

মলয় বিনীত হাস্তে বললে,—যায় বৈকি কাকাবাবু।

সায়েবরা কিছু বলে না?

সায়েবদের আপিস নয় ত। তাঁকে বিস্ময়ের অবকাশ না দিয়ে মলয় বললে,—ওসব কথা থাক—, আপনার নিশ্চয় খাওয়া হয় নি।

ফলমিষ্টি কিছু আনিয়ে নিলেই চলবে। কিন্তু তোমার কথা ত আমি বুঝতে পারছি না বাবা। খদ্দর পরে আপিসে গেলে—

ও কিছু নয়—খদ্দর এমন কিছু মারাত্মক বস্তু নয় যা দেখলে সায়েবরা ক্ষেপে উঠবে। তা ছাড়া পঁচিশ বছর একই জিনিস দেখে দেখে চোখসহা বা ধাতসহা হয়ে গেছে কাকাবাবু।

মলয়ের হাসির ধরণে দুর্গামোহন প্রীত হলেন না।

ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বললেন,—যাই হোক—চাকরি যারা করে তাদের এসব জেদ ভাল নয়।

হবে। মলয় অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলে।

যেখানে উন্নতি করবে—সেখানে একটি পথই বেছে নেয়া ভাল। না ঘাটের না ঘরের এতে কোন দিকেই সামঞ্জস্য থাকে না।

মলয় চুপ করে রইল।

দুর্গামোহন বললেন,—প্রশান্ত কি করছেন? চাকরি, না খদ্দর পরে স্বদেশী?

ওঁর কথার ধরণে মলয় হেসে ফেললে। সংযত স্বরে বললে,—এই দশ মিনিট আগে সে আপিসেই ত গেল।

সে নাকি চাকরি করবে না? স্বরে ঈষৎ জোর দিয়ে বললেন,—চাকরি

না করে কি করবে বলতে পার? আমি এমন কিছু তালুক মুলুক রেখে যাব না যাতে করে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে তার দিন চলে যাবে।

মলয় হেসে বললে,—তালুক মুলুক রেখে গেলেও পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাবার সুযোগ কারও থাকবে না কাকাবাবু।

কেন হে ছোকরা—নিজের জমির ধান নিজের সংসারে আসবে—

না কাকাবাবু—জমি তারই যে চাষ করবে। চাষার রক্ত শুষে জমিদারের দেহ মোটা হবার দিন চলে যাচ্ছে, ওসব উদাহরণ না রাখাই ভাল।

দুর্গামোহন সক্রোধে বললেন,—তবে সে করবে কি শুনি? ঘোড়ার ঘাস কাটবে?

যে যা পারে সে তাই করবে। যার যোগ্যতা ঘোড়ার ঘাস কাটার সে তাই করেই বেঁচে থাকবে। পরের শ্রমে পরিপুষ্ট হবার দিন চলে যাচ্ছে।

আচ্ছা—আচ্ছা, দেখা হোক তার সঙ্গে সে বোঝাপড়া তখন হবে। আচ্ছা, তুমি যে বড় লম্বা লম্বা লেকচার দিলে—শুনি ত তোমাদেরও জমি আছে—যার আয়ে পরিবার প্রতিপালন হচ্ছে, জমি গেলে তোমাদের দশা কি হবে শুনি?

মলয় হাসলে—কোন উত্তর দিলে না।

মলয়ের হাসিতে দুর্গামোহন বেশি মাত্রায় উষ্ণ হয়ে উঠলেন। সেই সঙ্গে তিনি বুঝলেন—এদের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। এরা চড়া কথা বলে তর্ককে শাণিত হবার অবকাশ দেয় না—বেফাঁস বললেও হাসিমুখে জবাব দেয়। সেকালের ছেলেদের জিদ বা একগুঁয়েমি একালের ছেলেদের মধ্যেও যথেষ্ট আছে—রূপান্তর খানিকটা হয়েছে শুধু। ওদের ওই নম্রতা বা হাসি-হাসি ভাবের মধ্যে দিয়ে ঊর্দ্ধপক্ষকে অবজ্ঞা

করার ভাবটি সুস্পষ্ট। নিজের আপিস-জীবনের শেষ ভাগে এই রকম নম্র-ঔদ্ধত্যের নমুনা তিনি যথেষ্ট পেয়েছেন।

যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে হেঁট হয়ে তিনি জুতোর ফিতে খুললেন—কাঁধের চাদরটা তক্তাপোষের উপর রাখলেন। তারপর বুক-পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে সময় দেখলেন।

মলয় জিজ্ঞাসা করলে,—কোথাও যাবেন কি?

যাব। হাঁ, দুই-এক জায়গায় ঘুরে প্রশান্তর আপিসে একবার যাব ভাবছি।

তা হলে এক কাজ করুন—চাবিটা রেখে দিন, আমি কখন ফিরব—

না—না, চাবি তুমি রাখ। প্রশান্ত ওই সামনের ঘরেই থাকে তো? ওকে সঙ্গে করে একেবারে আসব।

মুখে হাতে জল দিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না—আমাদের হাড় অত পলকা নয় যে অল্প শ্রমে নুয়ে পড়বে।

তিনি ঘরের চার দেয়ালে চোখ বুলিয়ে দিলেন। একটি তেরশো ছেচল্লিশের ইংরেজী ক্যালেণ্ডার ছাড়া কোন ছবিপত্র কোথাও টাঙানো নেই। কোণের দিকে একটা কোরোসিন কাঠের র‍্যাকের উপর স্তূপাকার বই অগোছালো পড়ে রয়েছে—একটা বইয়েরও নাম পড়া যায় না এমনি অগোছালো। মেসের ঘর কোনকালে গোছানো হয় না তিনি জানেন, তবু এরা যেন বেশিমাত্রায় বিশৃঙ্খল। তাঁদের সময়ে নির্বিঘ্ন চাকরিতে আর সংসার চালনার দায়িত্বে যে জীবন বাঁধাধরা ছকের মত সরল ছিল আজ সেই কেন্দ্র থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। এদের দেখে দুঃখ হয়, তবু এদের ওপর মমত্ববোধও পোষণ করা দুরূহ। দুটি যুদ্ধ দেশের ওপর যে ক্ষতচিহ্ন রেখে গেল—সমাজও সে আঘাত

থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু আত্মরক্ষা করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিমের রাষ্ট্রমুখী মন পূর্ব্বের সমাজমুখী মনের থেকে পৃথক নয় কি?

ভাবলেন, এখন থাক—ফিরে এসে এ নিয়ে ওদের সঙ্গে তর্ক করা যাবে। মানে ওদের বুদ্ধির জট ছাড়াতে হলে কিছু শাণিত যুক্তির প্রয়োজন।

পথে বেরিয়ে মনে হ'ল—বাহ্যত শহরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। দু' একটা বাড়ির সংস্কার হয়েছে—দু' একটা পথের সৃষ্টি হয়েছে এই মাত্র। সনাতন ট্রাম, বাস—সনাতন প্রথায় চলছে, মোড়ের মাথায় সনাতন ট্রাফিক পুলিস—তার উদ্যত করের ইঙ্গিতে যানবাহনের স্রোত কখনও সচল, কখনও বা স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের মরশুমে যে বিদেশী মুখের প্রাচুর্য্য পথে, ফুটপাথে বা বিচিত্র যানবাহনে দেখা যেত আজ তা নেই বললেই হয়। অতিকায় ট্রাক্‌গুলিতে ক্বচিৎ লালমুখো নগ্নদেহ গোরা দেখা যায়—নতুবা সবই দেশীয়দের রাজত্ব। এখনও ট্রাকের পর ট্রাক কনভয় প্রথায় চলে, তবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অসামরিক মানুষের অসুবিধা ঘটায় না। যুদ্ধ-জলের ভাঁটাটা স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ।

তবু যে যুদ্ধ থামেনি সেটা নিত্যকার জীবন যাপনের মধ্যে বুঝতে পারা যায়। আহারে, পরিচ্ছদে—দ্রব্যমূল্যে ওরা ক্লেশভার বহন করছে, সেটাও বাইরের; আর মনে জাগছে যে অভাববোধ—তা প্রাক্-যুদ্ধের সমাজ-শৃঙ্খলার সঙ্গে যুদ্ধোত্তর সমাজ-বিপ্লবের সংঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

গোলদীঘিতে পৌঁছবার মুখে মিটিং-ভাঙ্গা ভিড় তাঁকে গ্রাস করলে। কি যেন একটা প্রতিবাদ সভা বসেছিল এলবার্ট হলে—জনস্রোতের সঙ্গে যথেষ্ট উত্তেজনা পথের মাঝে আছড়ে পড়ল। ও দলে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের অস্তিত্ব নাই, সবাই তরুণ—মেয়ে আর পুরুষ। সবাই এক একটা দিক নিয়ে উত্তেজনার স্রোত সৃষ্টি করে পথের চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

বিস্তীর্ণ বালু-বেলায় সমুদ্রের ভাঙ্গা ঢেউ শেষ হয়েও খানিকটা গড়িয়ে যায় যেমন—তেমনি। এদের ভঙ্গি দেখে মনে হয়—কোন একটা মীমাংসা করতে এরা এক জায়গায় মেলে নি। হয়তো এটা প্রতিবাদ সভা ছিল। কিন্তু প্রতিবাদের মধ্যে প্রতিকার প্রার্থনার সুরটি শোনা গেল না তো! কি চায় এরা? এ যুগের যৌবন—বিনয়ে উদ্ধত—নম্রতায় অহংকারমত্ত—স্বাধিকারপ্রমত্ত যৌবন—কিসের প্রতিবাদে আজ আর কাল, কাল কিম্বা পরশু—দিনের পর দিন ধরে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে? কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ?

একটা কথা কানে গেল—ইংরেজকে ভারত ছাড়তেই হবে। সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। বেয়নেট বন্দুক—আকাশচারী লৌহশ্যেন অথবা অতিকায় ট্যাঙ্ক কি মৃত্যুবীজবাহী মেসিনগান এবার সাম্রাজ্যবাদকে আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারবে না। ওদের ধনবল, জনবল ফাঁকা শ্লোগানের চীৎকার ধ্বনিতে হতবল হয়ে গেল! দুর্গামোহন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। ঈষৎ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

পাশের একজন তরুণ উষ্ণ হয়ে উঠল,—কি মশাই, হাসছেন যে? ব্রিটিশ ভারত ছাড়বে এ বুঝি বিশ্বাস হ'ল না?

একটি মেয়ে বললে,—ওঁরা জনবুলের যুগের লোক—তার মুখের দাপটই জানেন।

দুর্গামোহন বাছা বাছা প্রমাণ প্রয়োগ করতে যাচ্ছিলেন—কি ভেবে বিরত হলেন। শুধু বললেন,—ওরা যতক্ষণ না কথা রাখছে—

ছেলেটি উষ্ণস্বরে বললে,—কথা রাখতে বাধ্য করাব আমরা। ভাবছেন ওদের অস্ত্র আছে—

দুর্গামোহন বললেন,—সে ভাবনা তো তোমাদেরও রয়েছে—

ছেলেটি বললে,—আছে। আর বিশ্বাসও করি আমরা যে একদিন-না-একদিন নিজেদের অধিকার আমরা ফিরে পাবই।

আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে দুর্গামোহনের চারদিকে জড়ো হয়েছে দেখে উনি তর্ক করলেন না। শুধু বললেন,—আমরা হয়ত তেমন দিন চোখে না দেখেও যেতে পারি।

সে আপনার ভাগ্য! একজন পরিহাসের ভঙ্গিতে বললে।

আর সে সৌভাগ্য এলেও উপভোগ করতে পারবেন কি? আর একজন বললে।

একটি তরুণী বললে,—বাধা কিসের?

দেখছেন না—ব্রিটিশ দপ্তরের আখ্‌মাড়াই কলে—কেমন সহজে হজম হয়ে গেছেন উনি!

হো হো করে হেসে ওরা ছিট্‌কে ছড়িয়ে পড়ল এপাশে ওপাশে।

দুর্গামোহনের চোখ জ্বালা করে উঠল—সামনে গোলদীঘির বেঞ্চে আশ্রয় না নিলে একটা দুর্ঘটনা হওয়া বিচিত্র ছিল না।

বেঞ্চের আর এক প্রান্তে একজন যুবক বসে ছিল। পরণে তার আধময়লা কাপড়—জামার কাঁধের কাছটায় একটা তালি দেওয়া—একটু অন্যমনস্ক ভাব। একটা বিড়ি ধরে সে কয়েকবার টান দিলে—একবার কাসলে—একটু নড়ে দুর্গামোহনের দিকে সরে বসলে। তারপর মৃদুস্বরে বললে,—সার একটা খবর জানেন? সাপ্লাই আপিসের হ্যারিংটন সায়েব আজকাল কোন সেক্‌শনের চার্জ্জ নিয়ে আছেন?

দুর্গামোহন নিজের জগতে ফিরে এলেন। সেই সঙ্গে ফিরে এল তাঁর আহত পৌরুষ। বললেন,—আমায় দেখে কি মনে হয় যে আমি সাপ্লাই আপিসের বড়বাবু?

যুবকটি অপ্রতিভ না হয়ে বললে,—কি জানেন সার, অনেক রিটায়ার্ড্

হ্যাণ্ড তো চাকরিতে ঢুকেছেন—তাঁরা ভাল রকম ইন্‌ফরমেশন রাখেন বলেই—

দুর্গামোহন নরম গলায় বললেন,—চাকরি করতে চান ?

চাইব না কেন, চাকরি করতে কে না চায়! প্রতিবিস্ময়ে যুবক তাঁর পানে চেয়ে রইল।

দুর্গামোহন বললেন,—একটু আগে ওই হলে মিটিং হয়ে গেল খবর রাখেন কি ? আপনার মত যুবকরা তো থোড়াই কেয়ার করে চাকরির!

ও কথা বলবেন না সার, এখনও বুড়ো বাপ মা বেঁচে—ভাইদের মানুষ করতে হবে—বোন আছে একটি, তার বিয়ে—

শহর সম্পূর্ণরূপে বদলায় নি তা হ'লে। দুর্গামোহন পূর্ণদৃষ্টিতে চাইলেন যুবকটির পানে। দেহের প্রত্যেকটি ভঙ্গি প্রাক্-যুদ্ধযুগের ক্লান্তিতে অত্যন্ত ম্লান। কণ্ঠস্বরে ভিক্ষার বিনম্র সুর—যা আপিসের চেয়ারে বসে বহু বছর ধরে শুনে শুনে ক্লান্ত হয়েছেন তিনি। ঈষৎ কৌতূহল হ'ল ছেলেটিকে ভাল করে জানতে।

বললেন,—চাকরি তো অমনি হয় না বাপু—কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।

ছেলেটির চোখে উৎসাহের দীপ্তি দেখা গেল। বললে,—বেশি তো পারব না—অবস্থা দেখছেনই তো—

তবু কত ?

শ'খানেক টাকা—বলেই এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে সে দুর্গামোহনের পায়ের দিকে হাত নামালে।

দুর্গামোহন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওর হাত দুখানি ধরে ফেললেন। কি কোমল অসহায় হাত! কি জানি কেন—দেহ তাঁর ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল—ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল সরীসৃপের স্পর্শে যেমন স্নায়ুকেন্দ্রে আঘাত লাগে। কেন এমন হল ? তাঁর সমাজে পরিবার-প্রতিপালনেচ্ছু এমনি

এক বাধ্য ছেলের স্বপ্ন কে না দেখেন! তিনি যে কলকাতায় এসেছেন—তার মূলেও রয়েছে ছেলের রাষ্ট্র-চৈতন্যকে সমাজ-স্বর্গের সাধনার পানে পূর্ণ বিবর্ত্তিত করে তুলবার চেষ্টা। অথচ এই মুহূর্ত্তে ছেলেটির স্পর্শ সহ্য করতে পারছেন না কেন?

নিজের বিরক্তি দমন করতে প্রশ্ন করলেন,—কতদূর পড়েছ তুমি?

ম্যাট্রিক পাশ করেছি।

ম্যাট্রিক! মন সান্ত্বনা লাভ করলে। তাঁর ছেলের সঙ্গে এর তফাৎ অনেকখানি। কিন্তু আপিসে যখন ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল তখন তাঁর ছেলের চেয়েও কত গুণী জ্ঞানী কিংবা মানী বংশের ছেলেরা তাঁর পায়ের কাছে এমনি ভিক্ষার আশায় নত হয়ে প্রার্থনা-বাণী উচ্চারণ করেছিল—তা তো তিনি ভোলেন নি। তাদের কাতর প্রার্থনায় মন তাঁর আত্ম-প্রসাদে স্ফীত হয়ে উঠত না কি? বিদ্যাকে—ক্ষমতার সেবায় কৃতার্থম্মন্য দেখে—স্ফীত হওয়াই তো ক্ষমতার ধর্ম্ম। আপিসে উঁচু গদিতে বসে স্বধর্ম্মেই অনেকগুলি বছর কেটে গেছে—সেই খুসির স্বর্গে বাস করে আজও তিনি সেই স্বর্গকে সমস্ত কামনায় ধরে রেখেছেন। তবু মলিনবেশী এই ছেলেটিকে তিনি সহ্য করতে পারলেন না। বললেন,—শোন বাপু, চাকরি গোলদীঘির বেঞ্চিতে বসে লাভ করা যায় না। আপিসে যাও—খবর নাও—কে কোথায় আত্মীয় আছে ধর—

আপনি কিছু সাহায্য করতে পারেন না সার?

না। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে কথাটি উচ্চারণ করে তিনি বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

গোলদীঘির জলে দুপুরের রোদ ছোট ছোট তরঙ্গের মাথায় ছিটিয়ে পড়েছে। মাছগুলো লাফাচ্ছে বলেই বীচি-বিক্ষোভ, নতুবা স্রোতহীন জলে বিনা বাতাসে ঢেউ ওঠে না।

৬

অবশ্য ছেলের সঙ্গে এ ভাবে সাক্ষাৎ হবে দুর্গামোহন আশা করেন নি।

গোলদীঘি থেকে গেলেন নিজের আপিসে। নিজের আপিস ছাড়া অন্য কথা তাঁর মনেই আসে না। জীবনের চল্লিশটি বছর—জীবনের সেরা দিনগুলি যে বিরাট সৌধের জঠরে নির্ব্বিঘ্নে কেটেছে—তাকে নিজস্ব নয় ভাবতেও কষ্ট বোধ হয়। যারা সহকর্ম্মী ছিল তারা আজ নেই। কেউ অবসর নিয়েছে সংসার থেকে—কেউ বা আপিস থেকে। যে ঘরে বসে কাজ করতেন সে ঘরের চেহারাও বদলে গেছে আমূল। যে র‍্যাকের গোড়ায় টুলের ওপর বসে ঝিমুতো দপ্তরী রহমৎ—তা কাঠের পার্টিশনের কল্যাণে অদৃশ্য হয়েছে। এ ঘরে বড়বাবুর ছিল আধিপত্য—আজকাল কাঠের ছোট ঘরের মধ্যে রিভল্ভিং চেয়ারে বসে একজন নতুন-গোঁফ-ওঠা ছোকরা সায়েব ঘন ঘন পাইপ টানে আর কলিং-বেল বাজায়। স্থইং ডোর ঠেলে বাবুরা আর চাপরাসীরা মিনিটে মিনিটে যাওয়া আসা করে। বাবুরা সব তরুণ। ফিটফাট চটপটে। ফাইল সাজিয়ে লেজার দুরস্ত রেখে—টেবিল সাফ্ করে সিগারেট টানছে। তাঁদের কালের কাজগুলো তাঁদের যতটা কাবু করে রাখতো এদের কালের কাজগুলো সেই অনুপাতে লঘু বলতে হবে। এরা এত ঘেঁষাঘেঁষি বসে যে কোণের লোকের কাছে পৌঁছুতে হলে মাঝের বা পাশের লোকগুলির চেয়ার সরিয়ে কাত হয়ে হেলে দশ হাত দূরে যেতে রীতিমত পরিশ্রম হয় আর সময়ও লাগে। তবু এরা মানবে না—লোক বেড়েছে। বলে—আপনাদের কালে কাজের অত ফৈজত ছিল না সার। এত নোটের পর নোট—এন্কোয়ারি, ডি ও লেটার

এ সবের হাঙ্গামা ছিল না। যুদ্ধ যেমন গতি এনে দিয়েছে—তেমনি জটিল করে তুলেছে সব বিভাগকে।

বেশির ভাগ লোকই তাঁকে চেনে না—কেউ কেউ খাতির করে। তবে খাতির করে বলে যে মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে শ্রদ্ধা জানায় তা নয়। যেমন গোলদীঘির ছোকরাটি প্রার্থী হয়েও সিগারেটে সব শেষ টান দিতে কার্পণ্য করে নি। লুকিয়ে ধূমপান করাটা এ কালের রীতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনচিহ্ন বলে স্বীকৃত না হলেও—সেকালের আচার-অভ্যস্ত মনে, বিশেষ করে এই আপিসের পরিমণ্ডলে, বেশি করেই দোলা দেয়। তবু কলকাতায় এলে কাজ না থাকলেও আপিসে তিনি একবার আসবেনই। যে টানে মানুষ দূর প্রবাসী হয়েও জন্মভিটা দেখতে আসে—সেই অলক্ষ্য-প্রসারিত রজ্জু তাঁকে আকর্ষণ করে কিনা বোঝা দুষ্কর—তবে এই পরিত্যক্ত কর্ম্মক্ষেত্রকে সর্ব্বতোভাবে আপনার করেই নিয়েছেন তিনি। তাঁর যৌবন এই আপিসের কর্ম্মসৃষ্টির সার্থকতায় নিবেদিত হয়েছিল একদা—জন্মভূমির চেয়ে এই কর্ম্মভূমি তাঁর কাছে তাই এত প্রিয়।

আপিসের সব তলায় ঘুরে ঘুরে দেখলেন—পরিচিত কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করলেন—কাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল—সায়েবেরা তাঁকে আপ্যায়িত করলেন। তার পর এলেন বড় গম্বুজওয়ালা জি, পি, ও, আপিসে। ছেলে কাজ করে যে বিভাগে—জানা ছিল—কিন্তু সে বিভাগে কেউ তার সন্ধান দিতে পারলে না। অনেক ঘুরলেন—তবু সে বিরাট আপিসে ঠিকমত সন্ধান পাওয়া গেল না। মনে হ'ল, এই আপিসটির বিরাট জঠরে আশ্রয় নিলে মানুষকে পুরাতন পরিচয়ে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

অবশেষে এক জন বুড়ো মত লোক বললে,—বেশ ফরসা রঙ ফিটফাট

ছোকরা—প্রায়ই সিগারেট টানছে—বুকে ফাউণ্টেন পেন—সেই তো? সে তো পরশু একখানা রেজিগ্‌নেশন লেটার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের আপিসে দিয়ে গেল।

সত্যাসত্য যাচাই করতে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কাছে যাওয়া নিরর্থক ভেবে তিনি পথে বার হয়ে পড়লেন। লালদীঘির বেড়াগুলো যুদ্ধের সময় থেকেই ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল—দীঘিটা পথের সঙ্গে মিশে আগেকার আভিজাত্য হারিয়েছে। নানান দিক দিয়ে তার পথ বেরিয়েছে—মানুষের চলাফেরায় ঘাস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—মরসুমী ফুলের কেয়ারীগুলি হতশ্রী—বিলাতী পাম কুঞ্জ ছাড়া ত দীঘিটায় দু'দণ্ড বসে ক্লান্তি দূর করবার জায়গাও বড় একটা নেই।

সেইখানে বসেই দুর্গামোহন ভাবতে লাগলেন—অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য। দেশে ফিরে যাবেন—না প্রশান্তকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবেন? পিতৃত্বের দাবিতে এই চেষ্টা সার্থক হবে কি? মাথা নেড়ে দৃঢ়নিশ্চয় হলেন—অবশ্য হবে। উপার্জ্জন না করলে ছেলেদের ভরসা ত পিতৃবিত্ত। কাজেই তাঁর আদেশের গুরুত্ব অস্বীকার করা প্রশান্তর পক্ষে সহজ হবে না।

জি, পি, ও-র ঘড়িটায় চারটে বাজেনি—তখন থেকেই অনেক লোক বাড়ি ফিরতে সুরু করেছে। এরা নিশ্চয় আপিস থেকে পালাচ্ছে। সিনেমার ত্বরা না রেসের তাড়া? আগে শনিবার ছাড়া রেস হতো না, আজ কাল ছুটির দিনেও রেস হয়। যুদ্ধের বাজারে টাকাটা ফেঁপে উঠেছে এ-ও একটি প্রমাণ। আজ ছুটির বার নয়—রেস হবে না। তবে রেসের প্রস্তুতি আছে তো। সবাই তো স্বহস্তে টিকিট কিনে রেস গ্রাউণ্ডে বসে চেঁচামেচি করে না—বুকির মারফৎ খেলাটা চলে বলেই আট আনার খেলুড়ে কেরাণী একখানা বই কিনে বা খবরের

কাগজ থেকে নিজের ইচ্ছামত ঘোড়ার নাম টুকে বুকির এজেণ্টদের দেয়। এই ভাবে ঠিকুজি কোষ্ঠী মিলিয়ে অঙ্ক কষে অশ্বের জাতি নির্ণয় করতে রীতিমত সময় নষ্ট হয় না কি? আর সিনেমা? রেসের মত তারও সার্ব্বজনীনত্ব আছে বৈকি। কম আয়ের মানুষই তো কষ্টকে অগ্রাহ্য করবার সোজা পথটি বেছে নেয়। রেঁস্তোরায় বসে প্রহরে প্রহরে চা খাওয়া—এও আজকালকার নেশা বা ফ্যাশান। আর সিগারেট? এক বছর সিগারেট ত্যাগ করলে স্বরাজ আসবে এ প্রলোভনও একদিন দেখান হয়েছিল। ফলে যে বেগ সেদিনকার প্রতিজ্ঞা পালনের ত্বরায় দেখা গিয়েছিল—আজ ধূমপানের বহর জোয়ার দেখলে ভাবা আশ্চর্য্য নয় যে, ভারতবর্ষের আর কোথাও না হোক অন্তত আপিস কোয়ার্টারে—আহার-পানীয়ের পরই প্রধানতম রসদ হচ্ছে ঐ সিগারেট। দুর্গামোহন গুনতে আরম্ভ করলেন—এই দীঘির পথ দিয়ে যারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা কত।

গুনতে গুনতে তাঁর নেশা চেপে গেল—কাছের লোকগুলিকে গুনে দূরের লোকগুলিকেও লক্ষ্য করতে লাগলেন। আর তারই ফলে—যা আশা করেন নি তাই ঘটে গেল অকস্মাৎ।

দূরে ঐ বিধ্বস্ত মরসুমী ফুল-ঝাড়টার ওপিঠে একটি মেয়ের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে যে লম্বা আর ফর্সা মত যুবকটি সিগারেট টানতে টানতে আসছে—ওই প্রশান্ত না? প্রশান্তই তো।

আর একটু এগিয়ে এলে লক্ষ্য করলেন—ঘেঁষাঘেঁষি নয়—মেয়েটির ডান হাতের সঙ্গে ওর বাঁ হাতখানি সংযুক্ত। পথ ওরা চলছে বটে—লক্ষ্যটা পথের আশেপাশে বা সম্মুখে নয়। হাসি আর গল্প আর সিগারেট খাওয়া এই নিয়েই ওরা মশ্‌গুল। ওধারে লালদীঘির জল—এধারে বিশ্রামরত মানুষ কিছুই ওদের লক্ষ্যে পৌছচ্ছে না—ওরা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

দুর্গামোহনের মনে হ'ল—পায়ের তলা থেকে হাতের তালু থেকে সব রক্ত মাথায় উঠে আসছে—চন্‌চন্‌ করছে মাথাটা। রগের রক্তবাহী শিরাগুলি রক্ত চলাচলের দ্রুততায় দপ্‌ দপ্‌ করছে—চোখেও দুপুরের রোদ লেপে মুছে এক হয়ে গেল। অসহ্য ক্রোধে চীৎকার করে উঠলেন—প্রশান্ত—প্রশান্ত।

একটা চাপা বিকৃত ধ্বনি বার হ'ল গলা দিয়ে—কেউ চেয়ে দেখলে—কেউ চেয়ে দেখলে না। প্রশান্ত তার সঙ্গিনীর হাত ধরে নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁর সামনের রাস্তা দিয়ে মাত্র দশ পনের হাত ব্যবধানে গট্‌ গট্‌ করে চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে দুর্গামোহনের সম্বিৎ ফিরে এল। আকাশ ইতিমধ্যে ঘোলাটে বোধ হচ্ছে—গাছের ছায়া হয়েছে দীর্ঘতর আর লালদীঘির চারধারে বয়ে চলেছে মানুষের বন্যা। মাথার ওপর সেই সঙ্গে ভেসে চলেছে ধোঁয়ার একটা ঘন স্তর—শীতের সন্ধ্যায় শহরের বস্তিপ্রধান জায়গাগুলি থেকে যেমন ধোঁয়ার কুয়াসা জন্মায়—অনেকটা সেই রকম। ক'টা মানুষ সিগারেট টানছে—এ নির্ণয় করা সম্ভব নয়—সারা শহরটাই ধূমপায়ী হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে তিনি চোখ বুজলেন।

-

চোখ চেয়ে দেখলেন তখনো পৃথিবী উজ্জ্বল নয়। এটা ফাঁকা খোলা জায়গা নয়, মাথাটাও বেশ ভারি বোধ হচ্ছে। একটি সঙ্কীর্ণ ঘরে তিনি শুয়ে আছেন—ব্রাকেটে টিক্‌ টিক্‌ করে টাইমপিস চলছে। অদূরে কারা ফিস ফিস করে কি যেন বলছে। ঘরটায় তরল ধোঁয়ার স্রোত—নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পাশ-ফেরার চেষ্টা করে অতিকষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন,—আমি কোথায়?

এক অচেনা যুবক ওঁর সামনে এসে দাঁড়াল। বললে,—ভয় নেই, একটু দুধ খাবেন?

তার হাতে ফিডিং কাপ দেখে দুর্গামোহন আচ্ছন্নের মত বললেন,—না—না—আমি সিগারেট খাই না।

যুবকটি মিষ্টস্বরে বললে,—সিগারেট নয়, দুধ।

দুর্গামোহন মাথা নাড়লেন। যুবকটি এগিয়ে এসে তাঁর মুখে কাপটা ধরলে। গলাটা শুকিয়ে গেছে—তরল পানীয় এক নিঃশ্বাসে শেষ করলেন। একখানি তোয়ালে দিয়ে যুবক তাঁর মুখ মুছিয়ে দিলে।

দুর্গামোহনের নাসিকায় নাতিতীব্র একটা গন্ধ ভেসে আসতেই তিনি প্রায় চীৎকার করে উঠলেন,—তুমি সিগারেট খাও?

যুবক চম্‌কে উঠে বললে,—এখন তো খাইনি।

না—খেয়েছ। তোমার গায়ে সিগারেটের গন্ধ—তোমার হাতে—

যুবক কি বলতে যাচ্ছিল—দুর্গামোহন চেঁচিয়ে উঠলেন,—গেট আউট, গেট আউট।

তাঁর উচ্চ চীৎকারে আর দু'জন যুবক দুয়ার ঠেলে ঘরে ঢুকল। তার মধ্যে একজন মলয়।

মলয় বললে,—ব্যাপার কি সুশীল?

মনে হয় ডিলিরিয়ম। আবার সেই সিগারেট—গন্ধ—

মলয় বললে,—প্রশান্তর নাম করেন নি?

না।

দুর্গামোহনের কানে প্রশান্তর নাম গেল। যেন কত দূর থেকে কারা—পরমবার্ত্তা বয়ে নিয়ে এল। ঘাড় ফিরিয়ে তিনি বললেন,—প্রশান্ত কই? প্রশান্ত।

মলয় কাছে বসে বললে,—সে আসছে কাকাবাবু।

বউমাকেও আসতে বল—আমি ওদের আশীর্ব্বাদ করব।

যুবক ক'জন পরস্পরের পানে চেয়ে কি ইঙ্গিতাভিনয় করলে। মলয় বাইরে এসে বললে,—এর মানে কি সুশীল? উনি নিশ্চয় জানেন যে প্রশান্ত বিয়ে করে নি।

সুশীল বললে,—ফ্রয়েড বলেছেন—মানুষের অবচেতন মনের স্তরে যে চিন্তা—

মলয় বিরক্ত হয়ে বললে,—মেডিকেল লাইনে তোমার ফ্রয়েডিয় গবেষণা উপকার দেবে—আপাতত—

সুশীল বললে,—ওই প্রশান্ত আসছে—ওকেই জিজ্ঞাসা কর।

প্রশান্ত সব শুনে বললে,—বাবার মাথা খারাপ হয়েছে।

সুশীল জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার কাছ থেকে কোনদিন কি উনি ইঙ্গিত পেয়েছেন—

প্রশান্ত হেসে বললে,—আয়ের পথ খোলা না থাকলে মানুষের বিলাস-চিন্তা আসে?

সুশীল বললে,—বিবাহ বিলাস?

মলয় বললে,—যাই হোক—তোমার বাবা তোমাকে খুঁজছেন—একবার যাও।

প্রশান্ত ঘরে এসে ডাকলে,—বাবা?

দুর্গামোহন পাশ ফিরে শুলেন—কোন উত্তর দিলেন না। আচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁর নাক ও ভ্রূ দু'টি বার কয়েক কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

জ্ঞান ফিরে আসতে আরও কয়েকদিন গেল। যে দিন বালিশ ঠেস দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন—সেদিন বাইরের আকাশটা ভারি ভাল লাগল তাঁর। পৃথিবীর রূপ আর রঙ মনের মধ্যে নতুন করে প্রলেপ লাগিয়ে দিলে। সেই সঙ্গে ফিরে এল পুরাতন কামনাগুলি।

প্রশান্তর পানে ফিরে তিনি মৃদুস্বরে বললেন,—চাকরি ছেড়ে দিয়েছ—কেমন ?

সে মর্মভেদী দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে অর্থাৎ মুখ ফিরিয়ে প্রশান্ত মৃদুস্বরে বললে,—হাঁ।

তারপর কি করে চলবে—কিছু ঠিক করেছ ?

প্রশান্ত একটু নড়ে বসল—কোন জবাব দিলে না।

তুমি নিশ্চয় জান উপযুক্ত ছেলেকে বসে খাওয়াবার জন্য আমি পেনসন্ পাই না—সে প্রত্যাশা তুমিও কর না নিশ্চয় ?

প্রশান্ত মাথা নেড়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে,—না।

তবে করবে কি শুনি ? ঈষৎ উষ্ণ স্বরেই তিনি প্রশ্ন করলেন।

যা হয় কিছু করব—কেরাণীগিরি ছাড়া।

মানে—কেরাণীগিরিটা তোমার কাছে সব চেয়ে নীচু চাকরি ? প্রশান্ত উত্তর না দেওয়াতে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। ঝাঁজের সঙ্গে বললেন,—স্বাধীনতা বলতে কি বোঝ তুমি ? চাকরি না করা ? সিগারেট টানা আর অনাত্মীয়া মেয়েকে নিয়ে পথে পথে আড্ডা মারা ?

প্রশান্ত সহসা ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখ দু'টিতে অস্বাভাবিক দীপ্তি —মুখখানা লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছে—ঠোঁটের কাছটা কাঁপছে। একটা কঠিন প্রত্যুত্তরকে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে সে ওষ্ঠচ্যুত হতে দেয় নি বেশ বোঝা গেল।

দুর্গামোহনও বুঝলেন—মাত্রাটা বেশি হয়ে গেছে। হয় তো শালীনতার গণ্ডি ছাড়িয়েছে—কিন্তু ধৈর্য্যের কি দোষ সে যদি আযৌবন প্রত্যাশার শেষ তৃণগাছটি হতে অবলম্বনচ্যুত হয়ে পড়ে ?

মিনিট দুই একদৃষ্টে বাপের মুখের পানে চেয়ে থেকে প্রশান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ির মুখে মলয় দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞাসা করলে,—কাকাবাবু কি খুব রেগে উঠেছেন?

প্রশান্ত বললে,—ওঁকে আজই দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা কর ভাই—নইলে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবে।

৭

অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে নূতন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প বাক্যে আর কার্য্যে অনেকখানি তফাৎ।

প্রশান্ত পথ চলতে চলতে ভাবছিল, চাকরিটা ছেড়ে দিয়েও উপার্জ্জনের চিন্তা মন থেকে যায় না—এ বড় আশ্চর্য্য! যে বিদ্যা সে অর্জ্জন করেছে—তার মূলে রয়েছে এই প্রেরণা। না হলে হাতে-কলমে সে এমন কিছু শিখল না কেন—যা বইয়ের হরপের চেয়ে বেশি কার্য্যকরী। স্থূল সংসারকে অগ্রাহ্য করা চলে না—যে হেতু ক্ষুধা-তৃষ্ণা আরাম-শয়নের দাবি নিয়ে দেহ প্রতি দণ্ডে মানুষকে তাড়না করছে। তার দাবি মিটিয়ে যে উদ্বৃত্ত সময় পাওয়া যায়—তাই নিয়েই তো জ্ঞানের বড়াই ভাল লাগে।

দুর্গামোহন এই ভাবের রূঢ় কথা বলবেন—সে অনুমান করা কঠিন নয়। নিজ উপার্জ্জনের উপর আশ্রয় না করলে—পৃথিবী সত্যকার রূপে বারবার দেখা দেবেই। স্নেহ-ভালবাসার রঙীন উত্তরীয়ে নিজেকে শোভন করে রাখা সহজ ততক্ষণ—যতক্ষণ না ঝড় উঠে সব বিপর্য্যস্ত করে দেয়। যে কোন প্রকারে উপার্জ্জনের দায়িত্ব নিয়ে সংসার-প্রতিষ্ঠার আশু কল্পনা তার ছিল না—অথচ দৈবচক্রে সংসার গুটিয়ে আসছে তার চারদিকে।

কালও শুভার সঙ্গে তার কথা হয়েছে। নীড়-বাঁধার তাগিদ কোন

দিক থেকেই নেই—তবু ছোট মত একটি বাসা চাই। শুভা করবে উপার্জ্জন—সেও বসে থাকবে না। কি কি দিয়ে সাজাবে গৃহ—কোথায় কোন জিনিসটি রাখলে মানাবে—তার একটা ছক প্রশান্ত মুখে মুখেই দিতে পারে।

শুভার তাতেই আপত্তি। এই নিয়ে ও বহুবার পরিহাস করেছে। বলেছে, কমরেড, খুব বড় ঘরের ছেলে তুমি নও—তবু বুর্জ্জোয়া মনোভাব তোমার কেন?

প্রশান্ত জবাব দিয়েছে, নিজস্ব একখানি ঘরের দাবিকে তুমি কি বলতে চাও—

হেসে জবাব দিয়েছে শুভা, কিছুই বলব না কমরেড। যত সামান্যই হোক—পুঁজির বীজ যেন মনের মধ্যে না থাকে। আমাদের সাম্যবাদের শ্লোগান—ধনীদের হিংসা করে তৈরি হয় নি—নিজেদের শুদ্ধ করে নেবার মন্ত্র ওটি। ওদের ধন ঘুচিয়ে নিজেদের আরাম চাই না আমরা—সমস্ত জগৎকে অসাম্য থেকে বাঁচানোই হচ্ছে আমাদের নীতি।

তা কি করে হবে? ধনটা কমিয়ে না বাড়িয়ে অসাম্য দূর করবে?

ধন কমবে কেন—ব্যক্তিগত মুনাফা শুধু থাকবে না। তোমার মোটা দেহের চর্ব্বি বৃদ্ধি করতে আমরা দেহের রক্ত ব্যয় করব কেন? তোমরা চড়বে মোটর, আমরা পড়ব তার তলায় চাপা—এ কেমন বিধান কমরেড?

তা হলে সকলের একখানি করে মোটর থাকুক এই চেষ্টাই করতে হবে তো?

না কমরেড, মানুষের মনের খবর যাঁরা জানেন—তাঁরা বলেন,—ধনকে রাখতে হবে লোভের সীমানার বাইরে। ব্যক্তিগত আরাম-বিলাস একটুতেই মানুষকে পেয়ে বসে—ওটা একেবারে বাড়তে না দেওয়াই ভাল।

মানুষের বৃত্তিকে ছেঁটে ফেলবার ব্যবস্থা! এতে তোমরা স্বস্তি পেতে পার—জগৎ সুস্থ থাকবে তো?

কেন?

এই ধর, প্রতিভাহীনের পর্য্যায়ে যদি প্রতিভাবানদের ফেলা যায়—জগৎ আবার পিছিয়ে যাবে না কি?

তুমি হাসালে—প্রতিভাকে অস্বীকার করবে কে! সোভিয়েটে এর প্রথম পরীক্ষা কি হয় নি? সোভিয়েট কি পিছিয়ে পড়েছে জগতের অগ্রগতি থেকে?

তাকেও অনেক জিনিস বর্জ্জন করতে হয়েছে—যা তাদের নীতিভুক্ত ছিল না।

তাও না। নীতির পরিমার্জ্জন মানে আমূল বদল নয়। পরীক্ষার কষ্টি-পাথরে যাচাই না করলে কাজের সোনাটুকু বার করবে কি করে?…একটু থেমে বললে, তোমার পৃথিবী তোমায় ক্ষমা করবে না কমরেড, যদি—নীতিকে কষে মেজে জীবনযাত্রার উপযোগী করে না নাও। ছোট ঘর বাঁধবার আশ্বাস দিয়েছ, কিন্তু বড় ঘর যখন ডাক দেবে তখন সে ঘরের মায়া তোমাকে ছাড়তেই হবে। ধন হচ্ছে নদীর জল, ওকে কোথাও আটকে রাখলে চলবে না।

তা হলে মোটর থাকবে না কারও? পরিহাসের ভঙ্গিতে প্রশান্ত কথাটি উচ্চারণ করেই হেসে ফেললে। শুভাও হাসলে সেই সঙ্গে।

না—না প্রশান্ত—আমাদের মটো, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে—মানুষের মত বেঁচে থাকিবারে চাই। একটু পরিবর্ত্তন করলাম—মানেটা স্পষ্ট হ'ল না?

হাঁ, যে মানুষ কীর্ত্তিহীন তার পক্ষে যথেষ্ট সুন্দর বলা যেতে পারে।

একটু একটু করে এগিয়ে এসেছে প্রশান্ত। শিরায় তার নীলরক্ত

ছিল না কিন্তু নীল রক্তের মোহ তো ছিল যথেষ্ট। যে বিদ্যা সে সঞ্চয় করেছে—উপকথা শুনে—দৃষ্টান্ত দেখে—সুখ সৌভাগ্যের নিরিখ নির্ণয় করে—তারই মাঝে আত্মনিমজ্জন করা সহজই ছিল তো! একটু চেষ্টা—হয়তো বিশেষভাবের চেষ্টা—তা কে না করে থাকে। উচ্চপদ, অট্টালিকা, মোটর, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, কেশবতী রাজকন্যা, সোনার পালঙ্ক, এর মধ্যেই তো রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ছোট্ট একটি বীজ। এর মধ্যেই কি ছিল না জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা—চরম স্বর্গবাস কল্পনা? তবু সে কেন্দ্র থেকে সরে এল কিসের প্রেরণায়? শুভার?

প্রশান্ত অস্বীকার করে না—যৌবনের নীতিকে। সেই সঙ্গে অঙ্গীকার করে দেহগত বিলাসকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্ব্বোত্তম পরীক্ষা হয়ে যায় নি কি সোভিয়েট রণভূমিতে? ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করতে ওরা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিল। সে ব্রহ্মাস্ত্র সহসালব্ধ কোন দিব্যাস্ত্র নয়—রীতিমত তপস্যার দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়েছে। কত বিপ্লব—কত অনর্থপাত, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আর রক্তনদী অতিক্রম করে একে আয়ত্ব করতে হয়েছে। একটি অনগ্রসর—বহুজাতি অধ্যুষিত—বহুধর্ম্ম ও কুসংস্কার-পোষিত দেশে যা সম্ভব হয়েছে—পৃথিবীতে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত না বলে অগ্রাহ্য করবে কে? তবে এ কথা ঠিক, এক মাটিতে যে গাছ যে ফল প্রসব করে অন্য মাটিতে তার তারতম্য ঘটবেই। যাঁরা জ্ঞানী গুণী তাঁরা মূল নীতিকে অস্বীকার করেন না। উপযুক্ত সার দিয়ে আবহাওয়াকে অনুকূল করে সামান্য অদল বদল করে ফসলকে তাজা রাখবার চেষ্টাই করে থাকেন। প্রশান্তর প্রথমটা মনে হয়েছিল—মানুষের জন্মগত বৃত্তি হিংসাকে সহজে লালন করা যায় বলেই বুঝি সাম্যবাদকে সে অত শীঘ্র মেনে নিতে পারলে। চিন্তাটার তলায় কিছু সত্য যে নেই তা নয়—তবে ওগুলিকে সাধনার পথে বাধা বলে

জয় করার চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? ক্রমে সত্য আলোকের পুণ্যভূমিতে সে পৌঁছবে আশা হচ্ছে। সন্দেহ এখনও লেগে রয়েছে মনে—জয় সম্বন্ধে সন্দেহ নয়—প্রকৃত কল্যাণ বা সত্য এই পথে লাভ হবে কিনা এবং এই নীতিতে আস্থাবান পৃথিবী স্বর্গভূমি হয়ে উঠবে কিনা! একটু সন্দেহ থেকে যায় বই কি! জার্ম্মানী থেকে নাৎসীরা ইহুদি-বিতাড়ন সম্পূর্ণ করে ভেবেছিল—যুদ্ধ জয়ের বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হ'ল! গায়ের জোরে মানুষকে কোন কিছুতে আটকে রাখা—তা সে যতই কল্যাণ-প্রসূ ও উত্তম প্রথা হোক—সম্ভব নয়। সু ও কু প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে জীবন দোলায়িত। চির শান্তি—জীবনকে অস্বীকার করার আর একটি স্বাদহীন শোভাহীন বৈচিত্র্যহীন দিক নয় কি? তা ছাড়া রক্তস্বাদলোলুপ বৃত্তিকে বিলুপ্ত করতে হলে আরও কঠিন ও বৃহত্তর পরীক্ষা দিতে হয়।

শুভার প্রতি মোহ—যার জন্য এই নীতিতে তার অনুরাগ বেড়েছে—এটা ঠিক নয়। যে নীতিতেই সে বিশ্বাস করুক—যৌবন তার ধর্ম্ম পালন করবেই। আর যৌবন তার ধর্ম্মে যে প্রভাব বিস্তার করে তাতে চোখকান বুঁজে ঝাঁপ দেওয়াকেই বলে মোহ। এমন মোহ মনের কোথাও ছায়াপাত করে নি। শুভা যদি বলত—একশো টাকার চাকরি না ছাড়লে আমায় পাবে না—তা হলে খোলা চোখে মোহের একটা রূপ দেখা যেত। ওরা বলে না যে—চাকরি করো না—শুধু বলে—ধন উপার্জ্জনে সঞ্চয়ের নেশা যেন না লাগে। তর্ক হয়েছিল. পুঁজিবাদীর চাকরি করে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলে কি না? চলবে না কেন? টাকাটাকে অস্বীকার করছে না কেউ—জীবন যাত্রার মাঝে ওটি অপরিহার্য্য বলে…কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের যে অন্যায় অত্যাচার—যে লোভ বহুজনকে নামিয়ে একজনকে উঁচুতে তোলে—বহু অস্থিচূর্ণসারে পরিবর্দ্ধিত একটি সুন্দর গোলাপ গাছ—এ কোন

কল্যাণ-কামীই চাইবে না। একে ধনীর প্রতি ধনহীনের হিংসা বলে না—মানুষের ন্যায্য অধিকারে বেঁচে থাকবার সহজ ও সুসঙ্গত একটি দাবি।

তবু সে চাকরি ছেড়ে দিলে। চাকরি অসহ্য বোধ হ'ল। চাটুবৃত্তি—দাসমনোভাব সকলের ধাতে সয় না। দু'পুরুষের বৃত্তি—বন্দীর বন্দনা ছাড়া কি! আপিসকে প্রথমটা মনে হয়েছিল--নিরাকার একটি প্রতিষ্ঠান। ধনিকতাবাদের উদ্ধত অহমিকায় সে কারও দুর্গতিকে বাড়াচ্ছে না বরং বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই করছে। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানের চাকায় তেল দিতে গিয়ে বুঝলে দেহের রক্তকে বিশুদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। এই প্রতিষ্ঠানের মূলে--সহস্রটা শিকড় রয়েছে, রস শোষণ-ক্রিয়া চলেছে অলক্ষিতে। অত্যন্ত শান্ত ও নিয়মানুগ বিভাগ—তবু কিছুদিন আগে নিরুপায়ের শেষ অস্ত্র ধর্ম্মঘট ঘোষণা করেছিল। ধর্ম্মঘট সাফল্য-লাভ করে নি। পুঁজিবাদ সূক্ষ্ম কৌশলে ভেদনীতির প্রয়োগে তা ব্যর্থ করে দিয়েছে। একটা লাভ হয়েছে এই—যারা মাসমাহিনায় চোখ বুজে দুঃখ অভাবকে ঘাড়ে নিয়ে মনে করত ভগবানের দান--কর্ম্মফল---কিংবা অদৃষ্ট—তারাও এইটুকু বুঝলে যে--মানুষ অনেক কিছুই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করে আর নির্ব্বিচারে মেনে নেয় বলেই সেগুলি চিরকালের সত্য নয়। আর একটা মহৎ শিক্ষা তারা পেয়েছে যে—সব জায়গার নির্য্যাতিতরাই এক গোত্রের। স্বদেশী হোক কিংবা বিদেশী হোক--ধনিকদেরও গোত্রভেদ নেই। দুই গোত্রকে সমভূমিতে দাঁড় করাবার চেষ্টাই হ'ল সাম্যবাদের মূল নীতি।

এসপ্ল্যানেডে শুভা অপেক্ষা করছিল। প্রশান্তকে আসতে দেখে চীৎকার করে বললে, হ্যালো কমরেড—এত ভাবছ কি? ঘর একটা ঠিক করলে বুঝি?

প্রশান্ত ম্লান হেসে বললে, তা করলাম। আকাশ তার আচ্ছাদন। —কুলোবে না আমাদের দু'জনকে?

শুভা বললে, অবশ্য। কিন্তু ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে!

প্রশান্ত বললে, পিতৃবিত্তের যত নিন্দাই করি—আহার আর আচ্ছাদন থেকে সে যে নিশ্চিন্ত করে রাখে।

শুভা বললে, নিজের উপর নির্ভরতা কমে গেলেই মানুষ সব দিকে উপায়হীন মনে করে। নিজেকে সৃষ্টি করে নাও না কমরেড—জীবনে সম্পদ কিছুমাত্র কমবে না।

না শুভা—পুঁজিবাদ যে জাতেরই হোক—বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

দু'জনে হেসে ঘাসের ওপর বসলে। মাথার ওপর একটা পুষ্পাকীর্ণ অজানা গাছ ছায়া বিস্তার করেছে—দুপুরের রোদ গরম লাগছে। ওদিকে চলেছে ট্রাম—বিদ্যুৎবাহিত গাড়ি রঙ করা কতকগুলি সরীসৃপের মত এঁকেবেঁকে চলেছে—এদিকে অতিকায় বাস—আর মসৃণগতি মোটর। রাজকীয় উদ্যান-পরিক্রমায় এরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

ব্রিটিশ পতাকা লাটভবনের মাথায় পত্ পত্ করে উড়ছে।

সামনের ও দু'ধারের সৌধশ্রেণীকে—ট্রামকে, মোটর ও অতিকায় বাসকে—প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করছে। এদের সৌভ্রাত্রকে স্বাগত জানাচ্ছে আরও উপরের আকাশ। ঘাসের আসনে বসে শুভা বললে, পরিত্যাগ করলে তোমার বাহাদুরিটা কি! ওদের জয় করে নিজের করে নিতে হবে।

আপাতত আমায় আশ্রয় দাও।

শুভা বললে, দিলাম আশ্রয়। তবে এ আশ্রয়ে এলে নিজেকে মনে রাখলে চলবে না কমরেড।

শুভা পরিহাস করছে মনে করে প্রশান্ত সব খুলে বললে।

শুভা বললে, ওঠ।

প্রশান্ত উঠলে।

শুভা তার হাত ধরে বললে, এস।

কোথায়?

শুভা হাসতে হাসতে বললে, রসাতলে।

৮

জায়গাটা রসাতলের কাছাকাছিই বটে। চন্দ্রসূর্য্য-লাঞ্ছিত এক গলির গহ্বরে নোনাধরা স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল-ঘেরা একখানি বাড়ি। এমন জীর্ণ বাড়ি কি করে পৌর আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আজও খাড়া রয়েছে ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। অথচ এই বাড়িতেও মানুষ বাস করছে।

শুভা বললে, আমার একটি অনুরোধ—এখানে যা কিছু চোখে পড়বে তাতে আশ্চর্য্য হবে না—কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না। শুধু জানবে পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যা তোমার কল্পনার বাইরে। অথচ তা সত্য।

স্খলিতদন্ত বৃদ্ধের মত সিঁড়ি একটা পাওয়া গেল। কিন্তু একতলার সঙ্গে দোতলার পার্থক্য খুব কম। সেই পলস্তরাখসা ইট-বার-করা দেওয়াল—দেওয়ালের গায়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে—দু' পাশের বাড়ির পক্ষপুটে ঢাকা পড়ে, শীত না থাকা সত্ত্বেও, বাড়িখানা যেন কাঁপছে। ব্যাধিগ্রস্ত বাড়ি।

ওরই মধ্যে চওড়া একখানি ঘরে প্রবেশ করে শুভা বললে, বস।

প্রশান্ত ইতস্ততঃ চাইলে—বসবে কোথায়? ঘরের অপ্রচুর আলো ভেদ করে দৃষ্টি বেশি দূর অগ্রসর হচ্ছে না। মনে হচ্ছে একটিও জানালা নেই—আলো আসবে কোন্ ফাঁকে?

শুভা ওর হাত ধরে মেঝের ওপর বসালে। একটা মাদুরের ওপরই বসলে—যদিও সেটার চেহারা স্পষ্ট নয়।

শুভা ডাকলে, নানিয়া রে—

একটা মোমবাতি নিয়ে আধবুড়ি গোছের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকলে। বাতিটা মেঝেয় বসিয়ে বললে, নেণ্টুর বোখার হয়েছে দিদিজী। বহুৎ তাঁত আছে—

আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

মেয়েটি চলে গেলে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, ওটি কি ঝি?

ঝি! এই বাড়িতে ঝি রাখা চলে—না আমাদের ঝি রাখা সম্ভব?

শুভার হাসিতে অপ্রতিভ হয়ে প্রশান্ত বললে, কিন্তু ওতো বাঙ্গালী নয়।

বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে এক হ'ল কি করে এই চাইছ জানতে? একটু বিশ্রাম কর, সব জানতে পারবে।

প্রশান্ত ঘরের চারি দিকে চাইছে দেখে হেসে বললে, পছন্দ হয় তো এই ঘরখানি নিতে পার। বাড়ির এক টেরে—কেউ তোমায় বিরক্ত করবে না।

প্রশান্ত মনে মনে বললে, সব সময়ে মানুষই মানুষকে বিরক্ত করে কি!

এই ঘর—! কারাকক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, তবু এর চেয়ে নিকৃষ্ট বন্দীনিবাস কল্পনাতে আসে না। এ ঘরের কোন দিকে একটি মাত্র দরজা ছাড়া আর ছিদ্র নেই কেন? ঘরে দিনের বেলায়

আলো জেলে পরিচিতকে সম্ভাষণ না করলে ভদ্রতায় বাধে। সুস্থ মন বা সুস্থ দেহ নিয়ে এ আশ্রয়ে একটি রাত্রি কাটানো দুষ্কর।

শুভা বললে, এ ঘরটি পৃথিবীর আরও বহু অকল্পিত আশ্চর্য্য জিনিসের অন্তর্গত। অথচ এদের পরিহার করবার উপায় নেই।

অসাম্যের এই রূপ প্রশান্ত কখনো দেখে নি। এ বস্তু অকল্পিতই বটে। সে বললে, চল না, ছাদে গিয়ে বসি।

ছাদ! এত বড় বিলাস আশা কর তুমি কমরেড?

তবে মানুষ থাকে কি করে এখানে? সাশ্চর্য্য প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

শহরের পথ নিরাপদ নয় বলে।

বুড়িটা দুটি ঠোঙা নিয়ে ফিরে এল। বললে, লাই চানা আছে দিদিজী। ঠোঙা দুটো মাদুরের ওপর নামিয়ে দিলে।

নাস্তা কর কমরেড—মুড়ি আর ছোলা। একটা ঠোঙা সে তুলে নিলে।

প্রশান্ত তবু সহজ হতে পারছে না। এই ভাবের জীবন যাপন—সে পারবে কি? এ বাড়িতে আলো রোদ নেই—আকাশ দেখা যায় না, শুধু নোনাধরা নির্মম ইঁটের দেয়াল—চার ধারে শান্ত্রীর মত খাড়া হয়ে পাহারা দিচ্ছে।

বললে, তুমি নিশ্চয়—এই বাড়িতে থাক না শুভা?

শুভা হাসলে, রাজ-অট্টালিকা কোথায় পাব কমরেড?

তা বলে এই নোংরা বাড়িতে—, খানিকটা ক্রোধযুক্ত ক্ষোভে সে প্রতিবাদ করলে।

উপায় কি! রুপোর চামচে মুখে পুরে জন্মাবার সৌভাগ্য সকলের হয় না।

কিন্তু তুমি—

বাড়িটার দোষ কি ? এখানে মানুষকে নোংরা মনে হচ্ছে—বিশ্রী মনে হচ্ছে, কিন্তু অপরিষ্কার এর কোথাও নেই। এই বাড়ি থেকে বেরুলেই তো পথে-চলা মানুষের গোত্রে অদ্ভুত ভাবে খাপ খেয়ে যাই কমরেড। আমার শাড়ী—চালচলন—কোথাও এই বাড়ির ছাপ লেগে থাকে কি ?

তবু এখানে মানুষ সুস্থ ভাবে বাস করতে পারে না। এই বদ্ধ ঘরে সঙ্কীর্ণ হয়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য্যও নয়।

হাসালে—তোমরাই গীতা আওড়াও—দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা—সুখেষু বিগতস্পৃহ—!

প্রশান্ত কোন কথা বললে না।

মুড়ি খাও কমরেড।

ক্ষিদে নেই।

মুড়ি খেয়ে ক্ষিদে মেটে কখনও ? বার বার এত ভুল করছ কেন প্রশান্ত ! ওহো—একটু ব'স—নেন্ট্‌ কেমন আছে দেখে আসি।

সে চলে গেলে প্রশান্ত নিরুপায় দৃষ্টিতে ঘরের পানে চাইলে। না—এই অবারিত নির্লজ্জ দারিদ্র্যে কোথাও এতটুকু সম্মান বা গৌরব নেই। এর থেকে পরিত্রাণ না পেলে মানুষের মূল্যই বা কি ! শুভা তার সঙ্গে পরিহাস করছে না তো ?

শুভা ফিরে এসে বললে, বাঃ রে—মুড়ির ঠোঙাটি ছোঁও নি ? সত্যি কি ভাল লাগছে না প্রশান্ত ?

প্রশান্ত মনকে সজোরে শাসন করে ঠোঙাটি টেনে নিয়ে বললে, তুমি পরীক্ষা করছ কিনা—তাই ভাবছি।

পরীক্ষা !—এমন নিষ্ঠুর পরীক্ষা করে আমার লাভ ? তুমি জান না প্রশান্ত—যার মাথার ওপর পুরুষ অভিভাবক নেই—ছোট দুটি ভাই বোন—রুগ্ন মা—অথর্ব্ব ঠাকুরমা এদের নিয়ে জীবনের যুদ্ধ চালাতে

হয়—তাদের এ ছাড়া গতিই বা কি? এ বাড়ির চারিদিকে যে বাড়িগুলি মাথা উঁচু করেছে—তাদের, নিরুপায় হয়ে, মাথা তুলবার অধিকার দিয়েছিলেন বাবা। তখন তাঁর উপার্জ্জন ছিল না—আমরা ঝুলছি গলায়—এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।···বলবার সময় একটুও গলা কাঁপল না—মুখের ভাব বদলাল না—অন্য কারও দুর্ভাগ্যের কথা অত্যন্ত সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে যেন বলে গেল।

প্রশান্ত বিচলিত হ'ল যথেষ্ট। দুটি ছোট অসহায় ভাই-বোন—রুগ্না মা—অথর্ব্ব ঠাকুরমা—অথচ বাইরে কোন দিন শুভা এ নিয়ে আক্ষেপ করে নি। কি করে চালায় সে সংসার? পার্টির কাজ করে কতই বা পায়! পার্টিতে কাজ করে কি না তাই বা কে জানে। কোন আপিসেই কি কাজ করে? মনে তো হয় না। পরিষ্কার শাড়ী সব সময়েই শোভন করে পরে—সব সময়ে অপরিমিত হাসে—তর্ক করে—সিনেমাতেও তার অরুচি নেই। রেস্তোরাঁয় ঢুকে কত দিন চা খেয়েছে—প্রশান্তর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা কি বন্ধুত্বের অভিনয় মাত্র নয়?

নানিয়া ফিরে এসে বললে, দিদিজী—মাজী বোলাতা আপকো।

মা—? প্রশান্তর পানে ফিরে বললে, এস প্রশান্ত—এ বাড়িতে থাকবেই যখন—সকলের সঙ্গে পরিচয় করে রাখা ভাল।

পরিচয়ের আগ্রহবশতঃ নয়—এই ঘর থেকে পরিত্রাণ পাবার আশাতে প্রশান্ত উঠে দাঁড়ালে। ঘরের বাইরে সরু মত একটা পথ—দুধারের দেয়ালের দৌলতে এটিকে সুড়ঙ্গ বলা যেতে পারে। তার পরে যে ঘরটায় এসে পৌছল ওরা—সেটা অপরিসর আর অন্ধকার আর আগেকার ঘরখানির মতই স্যাঁতসেঁতে ও নিরানন্দময়। ঘরের এক পাশে ছোট খাটিয়ায় এক স্থবিরা অশীতিপর বৃদ্ধা শুয়ে ছিলেন। বাতির আলোটা তাঁর জরা-শিথিল বহুধা-কুঞ্চিত মুখখানিতে পড়েছিল—চোখের

দৃষ্টি বোধ হ'ল ভাবলেশহীন। একহাতে মাথার বালিশটা ঠিক করছিলেন—অন্য হাতে গায়ের স্থানচ্যুত কাপড়খানি টেনে দেহ আবৃত করার চেষ্টা করছিলেন। এটা সম্ভ্রম রক্ষার অভ্যাসবশতঃই হয়ত ঘটছিল। কারণ দৃষ্টি বা শ্রুতি কোনটাই নতুন আগন্তুককে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠার অনুকূল নয়।

শুভা পায়ের শব্দ করে বললে, এটি ঠাকুমার ঘর—ওই যে উনি—

বৃদ্ধার কানে হয়তো শব্দটা প্রবেশ করল কিংবা অভ্যাসবশতঃ তিনি বললেন, কে? নানিয়া? আজ আমাকে খেতে দিবি নে তোরা?

ঠাকুমা—আমি। শিয়রে এসে শুভা বৃদ্ধাকে সচকিত করলে।

কে, নাতনী? বলি হ্যাঁলা—তোদের আক্কেল কি—আজ সারাদিন জলস্পর্শ করলাম না—

শেষের দিকে তাঁর স্বর অশ্রুর আভাসে কেঁপে উঠল।

প্রশান্ত বেদনা বোধ করলে। চলচ্ছক্তিহীন হয়ে বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা কেউ ঠেকাতে পারে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা—হাসি-কান্না তারই মাঝে নির্ম্মম জরার আঘাত—নিষ্ঠুর বিস্মৃতি। এই বেঁচে থাকার মত করুণ ব্যাপার পৃথিবীতে নেই।

তোমায় খাবার দিচ্ছি। কানের কাছ থেকে মুখ উঠিয়ে শুভা বললে, আসুন।

পিঠোপিঠি ঘর। এ ঘরেও একখানি খাটিয়া পাতা, তবে খাটিয়ার ওপর কেউ শুয়ে নেই—মেঝেতে বসে এক বর্ষীয়সী কি যেন করছিলেন। শুভা ডাকলে, মা। এই এঁরই কথা তোমায় বলেছিলাম—প্রশান্ত।

প্রশান্ত অদূরেই দাঁড়িয়ে রইল—প্রথম পরিচয়ের ক্ষেত্রে একটা প্রণাম—অন্ততঃ কিছু সম্বোধন করা উচিত এ তার মনেই হ'ল না। বর্ষীয়সী এদিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদুস্বরে কি যেন বললেন—প্রশান্ত অর্থহীন দৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়েই রইল। বর্ণহীন, অবয়বহীন এমন অস্থি-

কাঠামো তার চোখে পড়ে নি এর আগে। মুখের লাবণ্য মারীচিহ্নে নিঃশেষিত—ভ্রূতে বা চোখের পাতায় নেই লোম—গণ্ডাস্থিতে চোখ দুটি অপ্রকট—প্রেতিনী ছাড়া এ মূর্ত্তিকে কিছু বলা যায় না।

বর্ষীয়সী হতবাক্ প্রশান্তর মনোভাব বুঝলেন কিনা—কে জানে। শুধু বললেন, ছেলেকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে বস্না - কিছু খেতে দে।

ও ঘরে মানে আগের ঘরখানিতে। প্রশান্তই এবার প্রথম পা বাড়ালে। মনে হ'ল আগের ঘরখানি এ বাড়ির মধ্যে সত্যই ভাল। ঈষৎ প্রশস্ত বলে নয়--নির্জ্জন বলেও নয়—জীবনের বিকৃত রূপ ওখানে অন্ততঃ চোখে পড়বে না—এই আশ্বাসে ও দ্রুত পা চালালে।

শুভা বললে, আস্তে হাঁটে প্রশান্ত--এ বাড়ি সহজ মানুষের পক্ষে গুরুপাক তো বটেই।

শুভা হাসলে কি নিঃশব্দে? হায়ক। বাড়ির সঙ্গে নতুন পরিচয়টা কোন দিক দিয়েই ভদ্রতার গণ্ডিতে বাঁধবার উপযুক্ত নয়। সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টিছাড়া এই সব বস্তু—এরা মানুষের সহজাত আচার-ব্যবহার আদর-আপ্যায়ন এ সব দাবি করতে পারে না নিশ্চয়।

আগেকার ঘরে ফিরে আসতেই জীবনের আভাস পাওয়া গেল। দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে কোন অন্ধকারের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে সে শুভার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রশান্তর পানে চেয়ে অস্ফুটস্বরে বললে, দিদি—

শুভা হেসে বললে, তোর দাদা—প্রণাম কর খুকি।

মেয়েটি সসঙ্কোচে এগিয়ে এসে প্রশান্তর পায়ে হাত রাখলে। প্রশান্ত তাকে দু'হাতে তুলে ধরতেই ও কলকণ্ঠে হেসে উঠল। সেই হাসিতে মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় ছিটিয়ে পড়ল—প্রশান্ত ফিরে এল জীবনের রাজ্যে।

৯

ক্রমশঃ সহজ হয়ে এল পারিপার্শ্বিক। গভীর অন্ধকারে পথে নামলে প্রথমটা নিঃশ্বাস রোধ হয়ে যায়, দৃষ্টি অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে—এক পা এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব বোধ হয়। সে মাত্র কয়েক দণ্ডের ব্যাপার। তারপর দৃষ্টিতে সয়ে যায় অন্ধকার—অন্ধকার তরল হয়—মুক্ত প্রান্তর হাত-ছানি দিয়ে ডাকে রহস্যপুরীর অভিমুখে। একবার চলা সুরু হলে সঙ্কোচ, ভয়, ইতস্ততঃভাব কিছুই বাধা জন্মায় না।

তবু একটা কিছু করা দরকার। সংসারে ভার হয়ে থাকলে চলে না। এটি পরের দিন সকালে মনে হ'ল।

পরের দিন সকালে সবে ঘুম ভেঙ্গে সে উঠে বসেছে বিছানায়—শুভার মা এসে দাঁড়ালেন ঘরের সামনে। ওঁরা এ ঘরে বড় একটা আসেন না।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে ও জিজ্ঞাসা করলে, আমায় কিছু বলছেন?

শুভার মা বললেন, একটা টাকা দিতে পার বাবা? শুভা কোথায় বেরুল—সে এলেই দিয়ে দেব।

কয়েকটি টাকা মাত্র পকেটে আছে—তা থেকে একটি টাকা অনায়াসে দেওয়া যায়। তার নিজের খরচও তো আছে। কিন্তু টাকা ধার নেওয়ার মত করে চাইলেন কেন শুভার মা? উনি কি জানেন না—শুধু কয়েক দিনের জন্য প্রশান্ত এ বাড়িতে বাস করতে আসে নি!

টাকাটা দিয়ে আরও তার মনে হ'ল—উপার্জ্জন চাই বইকি। সাম্যবাদী হওয়ায় আপত্তি করবে না কেউ (বাবা-মায়ের কথা বাদ দেওয়া যাক—ওঁরা নিজ স্বার্থবিরোধী যে কোন সৎকাজেই আপত্তি তোলেন!) কিন্তু যে নীতিতেই আস্থা থাকুক—অলস হয়ে বসে থাকলে মুখে

প্রবিশন্তি মৃগাঃ হয় না। জীবন রাখতে জীবিকা বেছে নিতেই হবে। রেজিগ্‌নেশন-পত্রটা আপিসের উর্দ্ধতন কর্ত্তার কাছে যদি না পৌছে থাকে তো ফিরিয়ে নিতে হবে। আত্মসম্মানে বাধবে? সেখানে কিংবা এখানে সর্ব্বত্র আত্মসম্মানকে অক্ষুন্ন রাখা চলে না।

শুভা এলে সে বললে, আমি যদি আপিসের চাকরিটা ফিরে পেতে চেষ্টা করি—অন্যায় হবে কি?

শুভা বললে, নিশ্চয় নয়। বাঁচবার দাবিটা আমাদের জন্মগত দাবি।

প্রশান্ত ইতস্ততঃ করে বললে, একবার রেজিগ্‌নেশন দিয়ে—

শুভা বললে, পুরাতন বৃত্তিকে শেষ করে দাও কমরেড। মান-সম্মান ভক্তি ওসব নতুন পৃথিবীতে মানাচ্ছে না—অনেক দিনের পুরনো জিনিস।

প্রশান্ত বললে, তাই বলে মানুষ আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জন দেবে?

শুভা বললে, আত্ম-সম্মান তো পরের কাছ থেকে ধার করা জিনিস নয় যে নষ্ট হবে! যা তোমার মনের সঙ্গে জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে—তা মনেরই জিনিস, কিন্তু কমরেড, বড় সাংঘাতিক জিনিস ওই আত্ম-সম্মান। ওকে যতই বাড়তে দেবে—অহঙ্কার ততই প্রবল হবে। সামাজিক মূল্য আদায়ের চেষ্টা করে যারা ওই আত্ম-সম্মানের দাবি জানিয়ে—তাদের মনোভাব জনকল্যাণ-প্রবুদ্ধ নয়।

প্রশান্ত বললে, পথের ধূলোয় সব মিশিয়ে হীন হয়ে যাওয়া—সেও তো ভাল নয়।

কে করবে কাকে হীন? বিত্ত নিয়ে এক দিন সমাজবিধান তৈরী হয়েছিল? শ্রেণী বিভাগে বুদ্ধির বা প্রতিভার প্রভেদ অস্বীকার করি না—কিন্তু বিত্তবানেরা কি তথাকথিত মর্য্যাদা মান পূজা ভক্তি এ সবের বিধান দেন নি? তাঁরা পৃথক হয়ে গড়লেন রাজাকে—দেবতাকে। শ্রেণী ভাগ হ'ল। আরম্ভ হ'ল মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা।

প্রশান্ত বললে, আজ এসব তর্ক করব না—মানুষের বিধি-বিধানে যথেষ্ট গলদ ছিল বলেই এতবড় প্রমাদ ঘটতে পেরেছে আজ। এসব দূর করা কর্ত্তব্য এও বুঝি, কিন্তু পুরাতন জিনিস মাত্রেই যে খারাপ এ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কি জান কমরেড—শ্রেণীস্বার্থ—ব্যক্তিস্বার্থ থেকে দানা বেঁধেছে। শুভা দুয়ারে দুটি টোকা মেরে হাসলে। পুঁথিতে বিধানকে আটকে ফেলতে পারলেই—ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল—কিংবা অপৌরুষেয় কিছু লাভ করলাম এ ভাবা উচিত নয়। দেশের সঙ্গে দেশ মিশছে—মহাদেশে মহাদেশে আজ কোলাকুলি—পৃথিবীর বিস্তার কমে যে এসেছে সে তো অস্বীকার করে লাভ নেই। নানান দেশের সেরা মানুষেরা চেষ্টা করছেন কিসে মানুষ সুস্থ থাকতে পারে—স্বচ্ছন্দে চলতে পারে—বার বার যুদ্ধের নামে যে নরহত্যার অভিনয় হয়—তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। সত্য কিনা?

প্রশান্ত বললে, যাই হোক—তুমি বলছ পুঁজিবাদীর দুয়োরে ধরনা দিতে আমার লজ্জা হওয়া উচিত নয়।

শুভা বললে, যা তোমার প্রাপ্য—তা আদায় করতে দ্বিধা করবে কেন? পুঁজিবাদকে ধ্বংস করতে হলে তার মধ্যে না গিয়ে উপায় কি! দূরে আগুন জ্বলছে দেখে হায় হায় করা—আর ভাল ভাল স্লোগান আউড়ে জনযুদ্ধ জয় করা—একই ধরণের!

তর্ককে চালিয়ে যেতে উৎসাহ আসছে না। মনের সঙ্কল্পে অটুট থেকে প্রশান্ত বললে, একবার ঘুরে আসি।

ব্যাগে কয়েকটা টাকা ছিল—সোজা গিয়ে উঠল একটা মাঝারি গোছের রেস্তোরাঁয়। একই রাত্রিতে জিহ্বার রুচিবোধ প্রবল হয়ে উঠেছে।

অনেক ঘুরে সে এল আপিসের সামনে। কত লোকই স্বচ্ছন্দে গোল গম্বুজশোভিত আপিসের বিরাট জঠরে প্রবেশ করছে—বেরিয়ে আসছে। রামায়ণের একটা বর্ণনা মনে পড়ল। নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের বিরাট দেহ ঘুমে অচেতন—তার ব্যাদিত বদনের মধ্যে নিঃশ্বাসের টানে যে সব প্রাণী মুহূর্ত্তেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে—তারাই নাসিকা-ও শ্রবণ-ছিদ্র পথে স্রোতের মত বার হয়ে আসছে। বস্তু গ্রহণ ও বর্জ্জনের লীলায় নিদ্রা ভালই জমেছে কুম্ভকর্ণের। জি, পি, ও'র গোল গম্বুজওয়ালা সাদা বাড়িটাকে তেমনি মনে হচ্ছে। সময়ের সঙ্কেত তার তিন পিঠ-ওয়ালা ঘড়িটায়—তিনটি বুভুক্ষু চোখে—যারা আসছে আর যারা যাচ্ছে—তাদের লেহন করছে। ওর বিরাট জঠরে যারা উদয়াস্ত কলম চালনা করে—তারাই কি খাদ্যরূপে পরিপুষ্ট করছে না কুম্ভকর্ণকে? রাজকীয় উপচারে কুম্ভকর্ণের দেহে জমছে মেদ—চোখে জলছে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা—নিঃশ্বাসে বেজে চলেছে কালের জয়ডঙ্কা। কত এল আর কত গেল, এক পুরুষ—দুই পুরুষ—বহু পুরুষ রাজানুরক্তির প্রমাণ রেখে গেল—ধুলো-জমা পুরাতন ফাইলে তাদের জাতি গোত্র লেখা আছে। অল্প মূল্যে জীবন বিকিয়ে যায়—গম্বুজের ঘড়িতে টুং টাং করে শব্দ করে মহাকাল—মানুষ মুগ্ধ হয়ে শোনে আর এগিয়ে যায়।

প্রশান্ত ফিরে এল। আত্মসম্মান বটগাছের শিকড়। পুরাতন ইমারতের প্রতিটি অস্থিপঞ্জরে—তার শিরা সুদৃঢ় হয়ে জড়িয়ে আছে—উপড়ে ফেলব বললেই উপড়ানো সহজ নয়। অন্য আপিসে চেষ্টা দেখা ভাল তার চেয়ে।

যুদ্ধ থেমে গেছে—পৃথিবীতে শান্তি ফিরে এসেছে কি? হয়ত শান্তি আসবে এই আশ্বাসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চেষ্টা করছে যাতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বে। কিন্তু জাতিতে জাতিতে

দরকষাকষির ব্যাপারটা চলছে পুরোদমে। যারা যা গ্রাস করে আছে—তারা তা কণামাত্রও ছাড়বে না। সাম্রাজ্যবাদ শিথিল করবে না তার হাতের মুঠো—গণতন্ত্রীরা নতুন পৃথিবীর নতুন বিধান তৈরি করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে—এই আনন্দে মশগুল। আমেরিকা জয়ের পথে সৌভাগ্যের সন্ধান পেয়েছে—নিজেদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রসারিত হতে চাইছে—রাশিয়া য়ুরোপে সাম্যবাদের জিগির তুলছে—আর বৃটিশ সশঙ্কিত দৃষ্টিতে সন্দেহ-দোলায়িত মনে একবার চাইছে রাশিয়ার পানে আর বার স্বস্তি উচ্চারণ করছে নতুন পৃথিবীর। তার উপনিবেশে যুদ্ধ দোলা দিয়েছে প্রচণ্ড ভাবে—তার অধীন রাষ্ট্রগুলি নব কামনার বহ্নি-বেদনায় বিপ্লবোন্মুখ। এশিয়ার গণ-বিদ্রোহের বীজ মহীরুহে পরিণত হতে চায়। আগুন জ্বলছে ভারতবর্ষে—ব্রহ্মে—ইন্দোচীনে—ইন্দোনেশিয়ায়। দ্বীপময় ভারতের সমুদ্রে দাবানল প্রসারিত হচ্ছে। সুদূর ফিলিপাইনে তার অগ্রগামী শিখা পৌঁছে গেছে, কোরিয়ায় তার একটি স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়েছে। পারস্যে—প্যালেষ্টাইনে—মিশরে—প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে—সেখান থেকে আরব্যসাগরে—ভূমধ্যসাগরে পৌঁছে গেছে বার্ত্তা। লেক্ সাক্‌সেসে—লণ্ডনে—প্যারীতে—কাসাব্লাঙ্কা—তেহরান—ইয়াণ্টায় প্রতিক্রিয়া চলছে। এক একটি ঘোষণায় অগ্ন্যুৎপাতের দীপ্তি বিশ্বের আকাশ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ইনি ভাবছেন ওঁর ত্যাগেই শান্তিপ্রতিষ্ঠা—উনি ভাবছেন—প্রথমে গ্রাস করেছেন বলেই সম্পত্তিটা চিরকালের থাকবে এই বা কোন্ কথা! সুতরাং ছাড় তার স্বত্ব—শান্তি আসবে। ইহুদী আর আরব—পারস্য আর আজারবাইজান—কংগ্রেস আর লীগ—ব্রহ্মের জাতীয় দল ও সীমান্ত দল—কুওমিণ্টাং ও কম্যুনিষ্ট—সাম্রাজ্যনীতির দাবার ছকে চালের পর চাল দিয়ে যাচ্ছে। আগে-আসার দাবিতে ও

ডলার পাউণ্ডের স্বর্ণভারে—পৃথিবীকে ডাইনে থেকে বাঁয়ে—আর ঊর্দ্ধ থেকে নীচে হেলাচ্ছে যারা—তাদের গোত্র বর্ণ চিহ্নিত হলেও—অবশিষ্ট যে ক্ষমতা তাদের হাতে আছে—তাতে দাবার ছকে খেলাটা আরও খানিক চলবে। তবে সব খেলারই যেমন শেষ আছে—এ খেলাও এক দিন থামবে। সাম্রাজ্যবাদ ভেঙে পড়বার আগে যে চরম আঘাত হানবে—তারই সূচনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দেখা দিয়েছে।

কতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত বসেছিল প্রশান্ত জানে না। পায়ে পায়ে সে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। মনুমেণ্টের তলায়—স্লোগানবিদ্ধ পতাকা হাতে অপরিমিত চেঁচাচ্ছে—মজদুর দল। ওদের ক্ষোভ অভিযোগ প্রকাশ করবার দ্বিতীয় রাস্তা নাই। মাঠের চারধারে যে সব প্রাসাদ কেল্লা প্রমোদ-উদ্যান চোখ রাঙিয়ে শাসন করছে—এই স্বল্প পরিসর মাঠকে আর অবারিত আকাশকে—তারা কেঁপে উঠছে কি ধ্বংস-কামনার উষ্ণ নিঃশ্বাসে? ওরাই হানবে শেষ আঘাত শান্তিপ্রিয় মানুষকে—আর ওরাই মিশে যাবে এই নব-জাগ্রত জীবনের উদ্বোধন মন্ত্রে? ভাবতে ভালই লাগছে। দিবাস্বপ্নের মত মধুর—আবেগ-মদির চিন্তা। এ চিন্তা সফল হবেই—আসিবে সে দিন আসিবে।

কিসের মিছিল তোমাদের? চাকরি ছাঁটাইয়ের? কিসের অভিযোগ করছ তোমরা? মাগ্‌গি ভাতা—বেতন বৃদ্ধির? ধর্ম্মঘটের হুমকি কেন? মানুষের নিম্নতম পর্য্যায়ে বেঁচে থাকবার অধিকারটুকু চাই আমরা। আমাদের বাঁচতে দাও শুধু। রেশনে অর্দ্ধাহার—বসনে আদিম যুগের ব্যবস্থা—পশুত্বের স্তরে নামাবার প্রাণপণ আয়োজন কেন? তোমাদেরই সৃষ্ট সভ্যতাকে তোমরা হনন করছ। স্বর্ণ সঞ্চয়ের বাসনাকে নিরুদ্ধ কর—বাঁচাও আমাদের। দূরে চলে যাচ্ছে চকচকে মোটর—মোটরের গর্ভশায়ী কোন সুবেশ মানুষ চেয়ে দেখছে ময়দানের দিকে

সকৌতুকেই। রেস্তোরাঁয় বাজছে ফক্স ট্রটের হাল্কা স্থর—মেট্রোর নিয়ন লাইটের নীলিমায় অগ্নিঅক্ষরে 'বেদিং বিউটি'র ঘোষণা—আর ইস্থার উইলিয়াম্‌সের প্রায়নগ্ন নির্লজ্জ দেহভঙ্গিমা। পণ্যসম্ভারে চৌরঙ্গী কণ্টকিত। দোকানে কত রকমের খাবার—সাজে সজ্জায় নব নব ফ্যাসানের রীতি—সাম্রাজ্যবাদ শেষ আঘাত দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

১০

ফিরে এল শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহে। বাড়িটা শ্রান্তি দূর করবার মত নয়—তবু এই হ'ল তার আশ্রয়।...

দোতলায় উঠবার মুখে একটি উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে আরও কয়েকটি গলা শোনা গেল। বাইরের কেউ এসেছেন।

একটি বড় মোমবাতি জ্বলছে ঘরে—ঘরটা বেশ আলোকিত হয়েছে। মাছুরের ওপর বসে ছু' তিন জন যুবক আর শুভা—একটা বড় কলাইকরা প্লেট থেকে খাবার তুলে নিয়ে খাচ্ছে—পাশের প্রকাণ্ড শালপাতার ঠোঙাতেও রয়েছে খাবার। খাবার নিয়ে চলছে ছেলেমাম্নষি—কাড়াকাড়ি—আর চলছে গল্প আর হাসি। অন্তরঙ্গতার পরিমণ্ডলে বাতিটাকে বেশি উজ্জ্বল মনে হচ্ছে আর ঘরের শোকস্তব্ধ নির্জ্জনতাটা উপলব্ধি হচ্ছে না।

প্রশান্তকে দেখে শুভা কোলাহল করে উঠল, এস কমরেড—বসে পড়। তার পর যুবক তিনটির পানে ফিরে ওর পরিচয় সাধন করিয়ে দিলে।

প্রশান্ত আসন গ্রহণ করলে। বাতির আলোয় অত্যন্ত রুক্ষ চেহারার মানুষকেও কিছু কোমল বোধ হয়—একজনকে ওরই মধ্যে সমগোত্রীয় মনে হ'ল প্রশান্তর। আর ছু'জন নিতান্ত পথে-বেড়ানো গোছের

চেহারা। যেমন উস্কখুস্ক চুল—তেমনি আধ ময়লা পাঞ্জাবী গায়ে—মুখ রুক্ষ—আর খাবার খাওয়ার মুহূর্ত্তে চোখ দুটিতে খাদ্য-লালসার চিহ্ন ফুটে উঠছে। অতীন আর চারু ওদের নাম। কমরেড অতীন—কমরেড চারু—পদবীপুচ্ছ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কমরেড অবন্তীকে মোটের ওপর মন্দ লাগল না। বেশবাসে রুচি আছে—আর মুখে আছে লালিত্য। মাথার একপাশে টেরিকাটা—তেল কিংবা লাইমজুসের কল্যাণে চুলগুলি চকচক করছে।···সে-ই বললে, আরম্ভ কর কমরেড—নইলে হ্যাভনটদের দলে পড়বে।

শুভা বললে, এটাকে ভোজও বলতে পার। অবন্তী মীরাট যাচ্ছে কাল চাকরি নিয়ে—তারই খাওয়া।

কোন্ আপিস? জিজ্ঞাসা করলে প্রশান্ত।

মিলিটারি অ্যাকাউণ্টস্। মাইনেটা মন্দ নয়—আর শুনেছি—অনেক বাঙালীও আছে ওখানে।

অতীন বললে, বাঙালী না থাকলেই বা কি? দিস ওয়ার্লড ইজ আওয়ার হোম।

চারু বললে, পার তো আমাদেরও টেনে নিও। যুদ্ধের পর পৃথিবীটা বেশি বেয়াড়া হয়ে উঠেছে।

শুভা বললে, হোক, নব-বিধান রচনার পক্ষে এই তো সুযোগ। আরে—হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন—নাও। দুখানা সিঙাড়া ও প্রশান্তর হাতে তুলে দিলে।

চারু বললে, সন্ধ্যেবেলায় এই জলখাবার খেয়ে আমি কিন্তু রাত কাটাতে রাজী নই।

শুভা বললে, আজ রান্নাঘর থেকে ছুটি নিয়েছি কমরেড—উনুন জ্বলবে না।

চারু বললে, বেশ তো—তোমায় ছুটি দেওয়া গেল। কি হে অতীন—খিচুড়িটা নামাতে পারবে?

অতীন বললে, কেন পারব না—কিন্তু কমরেড খিচুড়ি নয়—রীতিমত ঘি চাই।

অবন্তী বললে, জগাখিচুড়ি বল! তার চেয়ে ব্যবস্থা যখন করবেই—আর একটু ওঠ। ঘি ভাত—খাঁটি বুর্জোয়া রীতিতে।

একটা হর্ষধ্বনি উঠল। অতীন দু'হাতে চাপড়ালে মেঝে—চারু দিলে করতালি—শুভা চাপড়ালে অবন্তীর পিঠ। প্রশান্তর মুখ ঈষৎ গম্ভীর হ'ল। মনে হ'ল ওরা অত্যন্ত ছেলেমানুষ।

শুভা বক্র দৃষ্টিতে প্রশান্তর পানে চেয়ে বললে, ঘি ভাত তোমার মনঃপূত নয় প্রশান্ত?

অমৃতে কার অরুচি।

ব্যস—ব্যস—। অতীন আর একটা চাপড় মারলে মেঝেতে।

প্রশান্ত বললে, কিন্তু রসনাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে কি? যে কোন ছিদ্রপথে—একটু আরাম প্রবেশ করলে—

অবন্তী বললে, পিউরিটানদের মত কথা বলছ কমরেড।

অতীন বললে, যা হাতে আসছে—তাকে না নিয়ে জাঁক করব এত বড় বোকা আমরা নই। কাল হয়ত পান্তা ভাত জুটবে না—তা বলে আজকের ভোজ ছেড়ে দেব? একটু থেমে বললে, আমরা হচ্ছি জ্ঞানী লোক—বোকাদের টাকায় ভোজ বাগিয়ে বুদ্ধি প্রকাশ করতে ভালবাসি।

শুভা অবন্তীর কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে বললে, শুনলে তো—প্রকারান্তরে ও তোমাকে বোকা বলছে।

চারু বললে, কাজের কথা কও। একটা কাগজ আর পেন্সিল দাও—ফর্দ্দটা করে ফেলি চট্‌পট।

অবন্তী বুকপকেট থেকে ছোট নোটবই আর ফাউণ্টেন বার করে বললে, বল। কলম উদ্যত করে সে বললে, কিন্তু ভাল চাল জোগাড় করবে কোথায়?

চারু বললে, সে ভার আমার। র‍্যাশন হয়েছে বলে কলকাতায় পোলাওয়ের চাল মেলে না—এ কথা ভুলে যাও।

ব্ল্যাকমার্কেট তো? তাতে আমি রাজী নই। অবন্তী নোটবই বন্ধ করলে।

অতীন বললে, আরে—চালের অভাবে পোলাও বন্ধ হবে—বাই নো মীন্‌স্। এক জায়গায় আছে চাল—ন্যায্য দামে পাওয়া যাবে। আলো চাল—গন্ধটা নেই।

চারু বললে, যা ব্যাপার—তাতে রাত্রিতে বাড়ি ফেরা সম্ভব বলে বোধ হয় না।

শুভা বললে, নাই বা ফিরলে!

অতীন বললে, এর আগে যেন কোনদিন এখানে রাত কাটাও নি? তুমিও কম পিউরিটান নও কমরেড! হাসতে হাসতে সে প্রশান্তর পানে ফিরে চাইলে।

ভাবটা—তোমার হয়ে প্রত্যুত্তরটা আমিই দিলাম।

একটু থেমে বললে, চাকরি করেন তো?

প্রশান্ত বললে, না।

ও—। মাথা চুলকে সে একবার কাসলে।

চারু বললে, আর একটা থ্যাট পাওনা রইল অতীন, নোটবইয়ে টুকে রাখ।

প্রশান্ত বললে, চাকরি পাই যদি—

পাবেই চাকরি, বাংলাদেশের পাস করা ছেলে চাকরি পাবে না ত পাবে কে শুনি! চাকরি তুমি পাবেই।

চারুর অদ্ভুত যুক্তিতে প্রশান্ত হেসে ফেললে। বললে, শুধু বাংলার দোষ দিও না। কিন্তু তুমিও ত চাকরি করছ না।

করব বৈকি—কলেজ থেকে বার হই আগে।

কলেজ!—প্রশান্ত একটু অবাক হ'ল। এই ছন্নছাড়া-চেহারার ছেলেটি কলেজে পড়ে?—বিত্তহীন পথে-ঘোরা ছেলে বলেই সে প্রথম দর্শনে একে অবহেলা করেছিল!

কিন্তু কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরিই বা করবে কেন তুমি? বিস্ময়কে সে এইভাবে প্রকাশ করলে।

চারু বললে, মহাজনদের পন্থাই জানি—তাই বলেছি। হাঁ, সুবিধা হলে অন্য কিছুও করতে পারি। তবে সেই অন্য কিছুটা যেহেতু জানি না—

ওঠ—ওঠ—যথেষ্ট বখামো হয়েছে—! অতীন তাকে একটি ঠেলা দিলে।

ফর্দ্দটা কিন্তু পাই নি। আর—

অবন্তী পকেট থেকে একখানি দশ টাকার নোট বার করে তার হাতে দিলে।

শুভা বললে, সেরখানেক ঘি আর এলাচ লবঙ্গ কিস্‌মিস সামান্য আনবে। অতীন, বাজারটা তুমি করবে আর চাল।

টাকা নিয়ে দু'জনে বার হয়ে গেল।

মিষ্টির ঠোঙাটা হাতে নিয়ে শুভাও দাঁড়ালে। বললে, বুড়িকে মিষ্টি খাইয়ে আসি—বোস কমরেড।

বাতিটা আধাআধি পুড়ে গেছে—আলোর জোর বেড়েছে। দু'জনকে দু'জনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। চুপ করে থাকা অশোভন। দুজনের চিন্তার ধারা ভিন্নমুখী বলে কয়েকটি মিনিট নীরবে কেটে গেল।

প্রশান্ত ভাবছে—অবন্তী ভাগ্যবান। আজকের রাত্রিটা ওরই নিজস্ব বলতে পারা যায়। এই নিরানন্দ পুরীতে আনন্দ-সৃষ্টি করেছে সে।

অবন্তী ভাবছে কালকের কথা। নির্ব্বান্ধব দূরদেশ—একা—অজানা আপিস। চাকরির জগতে এই তার প্রথম প্রবেশ—সহ্য হবে ত?

হঠাৎ সে প্রশান্তকে প্রশ্ন করলে, আপনি চাকরি করেছেন কখনও?

প্রশান্ত একটু অবাক হ'ল তার প্রশ্নের ধরণে। দু'জনে মুখোমুখি বসেই—কথার সুর পালটে গেল? আপনি সম্বোধন এই প্রথম অবন্তীর মুখ থেকে বেরুল। এটা কি চাকরি পাওয়ার সুর—ভদ্রতার সুরু? বললে, হাঁ—তবে বেশি দিন নয়।

অবন্তী বললে, চাকরি করা শক্ত—না চাকরি রাখা শক্ত?

এ প্রশ্নও অদ্ভুত। প্রশান্ত বললে, আমি দশ-বার দিনের বেশি চাকরি রাখতে পারি নি। তবে সকলের ধাত ত সমান নয়।

অবন্তী মাথা নাড়লে। ঠিক বলেছেন আপনি। চাকরিটা বলতে গেলে আমি নিচ্ছি না—সংসারই নেওয়াচ্ছে।

তাই নেওয়ায়। সংসার মানুষের কাছে দাবি করে—পাওনার বেশি—অনেক বেশি। অভিজ্ঞজনের মত প্রশান্ত জবাব দিলে।

আপনার সঙ্গে আমার মিলছে। আপনার ভাইরা নিশ্চয় ইস্কুল কলেজে পড়ে? বোনেরা বিবাহযোগ্যা? বাবা ইন্‌ভ্যালিড—আর মা নেই। ঘরে আছেন বিধবা পিসি আর নিষ্কর্ম্মা কাকা।

প্রশান্ত হেসে বললে, সব না মিলুক কতক মেলে।

তা হলে আমিই বা চাকরি রাখব কি করে? চিন্তায় ওর ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

তা জানি না। তবে চাকরির মাইনে হাতে না পেয়েও ভোজের ব্যবস্থা করতে পারেন যখন—কথাটা খোঁচার মত নিজের কানেই বেসুরো বাজতে ও সহসা থেমে গেল।

অবন্তী বললে, পয়সার চেয়ে বন্ধুবান্ধবদের দাবি অগ্রগণ্য নয় কি? ওদের সঙ্গ থেকে যে আনন্দ আমি পেয়েছি তার মূল্যও অন্ততঃ দেব না?

প্রশান্ত চুপ করে রইল। মনে মনে বললে, পৃথিবীতে সব জিনিসেরই দাম দিতে হয়। সে মূল্য ন্যায্য কিংবা অন্যায্য সে ত আর সাম্যবাদ ঠিক করে দিচ্ছে না। বিশেষ করে এই প্রীতিভোজনের ব্যাপারটায়।

শুভা ফিরে এল। বললে, অবন্তী, মা তোমাকে ডাকছেন।

অবন্তী শুভার সাহায্য না নিয়ে ভিতরে চলে গেল। অন্দরমহল তার অপরিচিত নয়—শুভার মায়ের সঙ্গেও স্নেহমধুর একটি সম্বন্ধ যে বিদ্যমান সে অনুমান করা কঠিন নয়।

প্রশান্ত বললে, আজ আমি আসি শুভা?

আসবে? কোথায় আসবে? ইস্, তোমার মুখ এত শুকিয়ে গেছে! শরীর খারাপ হ'ল নাকি? শুভা এগিয়ে এসে ওর ডান হাতখানি তুলে নিলে।

তুমি নাড়ী দেখতেও জান?

জানি—অত্যন্ত চঞ্চল তোমার নাড়ী—বায়ুটা বেড়েছে। গম্ভীর-ভাবে শুভা বললে।

আর কিছু বুঝতে পারছ না? কোমল স্বরে প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

আরও কিছু? হুঁ—তাও আছে, কিন্তু সে রোগের নিদান যে শাস্ত্রে আছে তার ব্যবস্থা আপাততঃ চলবে না। শুভা অতি কষ্টে হাসি টিপে গম্ভীর ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রশান্তর বুকে প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস নেমে এল—সহসা ও শুভার হাতখানা চেপে ধরে ভীষণ বেগে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে করতে বলে উঠল, তুমি জান শুভা—তুমি জান?

শুভা সে বেগের টান সহ্য করতে না পেরে তার বক্ষোলগ্ন হ'ল।

কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করলে না—বা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য অযথা বলপ্রকাশের অভিনয় করলে না।

কয়েকটি মুহূর্ত্ত। শুভার কপোলের উপর উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভূত হতেই সে অত্যন্ত সহজ ভাবে প্রশান্তর হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে বসল —বিস্রস্ত কাপড়খানা গুছিয়ে নিয়ে বললে, আমি জানি। দেহের দাবিটা অস্বীকার করে লাভ নেই কমরেড, কিন্তু মনকে ওর থেকে আলাদা করে রাখাই ভাল।

ওর এই নিরুত্তাপ উত্তরে প্রশান্তর রক্ত কয়েক ডিগ্রি নেমে এল। এত বড় কথা বললে শুভা! শুদ্ধান্তঃপুরের কোন বাঙালী মেয়েই এ ধরণের কথা উচ্চারণ করতে পারে না। ও স্তম্ভিত হয়ে হাতখানি গুটিয়ে নিলে।

শুভা বুঝলে এই উত্তর প্রশান্তর মনে কি প্রতিক্রিয়া এনেছে। গৃহধর্ম্ম বলতে যা বোঝায়—ও জিনিস তার অন্তর্ভুক্ত নয়। মন যুক্ত হোক আর নাই হোক, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ আর সপ্তপদীর মন্ত্র উচ্চারণ —এ সবের মারফৎ যে বাঁধন দেহগত দাবির প্রতিষ্ঠা করে—তারই আবহাওয়ায় প্রশান্ত মানুষ হয়ে উঠেছে। এই সমাজ-বিদ্রোহমূলক কথা ওদের কানে বেসুরো লাগবেই।

কি প্রশান্ত, আমার কথায় দুঃখ পেলে?

প্রশান্ত ম্লান হাসি হেসে বললে, এ ছাড়া তুমি কি-ই বা বলতে পারতে শুভা!

অভিমানের অন্তর্নিহিত সুরটা শুভা বুঝলে। কিন্তু এ নিয়ে আপাততঃ তর্ক করে লাভ নেই। অবন্তী ফিরে আসছে।

অবন্তী এসে ওদের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করলে না। বললে, তোমার মার অদ্ভুত স্নেহ শুভা—বলেন—দূর দেশে নাই বা গেলে।

শুভা মাথা নেড়ে বললে, ঠাকুরমা কি বললেন ?

বললেন—পশ্চিমে নাকি অনেক তীর্থ আছে, সেগুলি দেখতে ভুল না করি।

শুভা বললে, তুমি বুঝি বললে—তীর্থ দেখবার বয়স আগে হোক—

প্রশান্ত বললে, যাই বল, তীর্থস্থান নিয়ে এমন উপহাস করা ভাল নয়।

ওর স্বরে চমকে উঠল দু'জনে। অবন্তী বললে, দেবদেবীর ওকালতনামা নিশ্চয়ই নেন নি ?

না, দেবদেবী না মেনেও এটা মানতে বোধ হয় আপত্তি করবে না যে —দেশভ্রমণে অভিজ্ঞতা বাড়ে—মনের প্রসার হয় ?

তেমনি করে দেশভ্রমণ করি আমরা ? কোন তীর্থে কখনও কি যান নি, না মা ঠাকুরমার মুখে সেখানকার গল্প শোনেন নি ? দেবতার নামে এই যে বিরাট ব্যবসা—

শুভা বললে, প্রশান্ত জানে বৈকি—শুধু তর্কের খাতিরে—

প্রশান্ত বেগের সঙ্গে বললে, শুধু তর্কের খাতিরে নয়—তুমি বয়সের কথাটা তুললে—

বয়সের কথাটাই তো আসল। শরীরের সামর্থ্য গেলে তীর্থ করা দুষ্কর হয়ে ওঠে—এটা তোমরা বলে থাক, কিন্তু আমি জানি, দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে না এলে যথার্থ ধর্ম্ম—অবশ্য ধর্ম্ম বলতে সাধারণে যা বোঝে তারই কথা বলছি—যথার্থ ধর্ম্ম সাধন হয় না। কেন ?—শক্তি প্রবল থাকলে—মন ভক্তির চেয়ে শক্তিকে মেনে নিতে ভালবাসে—কিন্তু শক্তিহীনের অবলম্বন যে অদৃশ্য শক্তি সে অস্বীকার করি কি ক'রে! সুতরাং পলিত কেশ, গলিত দন্ত, পরনির্ভরশীল বুড়োবুড়ীদের ওই তো হ'ল একমাত্র আশ্রয়।

অবন্তী হেসে উঠে বললে, তোমার তর্কে যুক্তি আছে—কিন্তু যুক্তির চেয়েও বেশি আছে ঝাঁজ।

প্রশান্ত বললে, ধর্ম্মকে অস্বীকার কর—

অস্বীকার করলাম কোথায়? শুভা হাসিমুখে বললে, ধর্ম্ম—আর ধর্ম্মের আচার-আচরণ দুটিকে মিশিয়ে গোল পাকাই নি। সব মানুষের সমান অধিকার—এও কি বিশেষ একটা ধর্ম্ম নয়? আমরা ধর্ম্মের বিচার করি তার pragmatic value দিয়ে।

অবন্তী বললে, ব্যস—ব্যস আর নয়। উনুনটায় এই বেলা কিছু কয়লা দিয়ে দাও—

শুভা বললে, আজ আমার ছুটি বলি নি?

বলেছ—কিন্তু রান্নার উদ্যোগ করে দেবে না—এ ত বল নি।

অতীন ও চারু শুধু ঘি-ভাতের জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এল না—তার সঙ্গে এল দু'জন মহিলা আর তিন জন পুরুষ বন্ধু। হৈ-চৈ রীতিমত হ'ল—রান্নাও করলে সবাই মিলে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত্রি দুটো বেজে গেল। তারপর সেই ঘরেই মাদুর, চট, সতরঞ্চি বিছিয়ে ঢালা বিছানা হ'ল। স্ত্রী-পুরুষ শুয়ে পড়ল পাশা-পাশি। শুয়ে শুয়ে খানিক চলল গল্প—তর্ক—পুঁজিবাদীদের নিয়ে—আচার-প্রথা নিয়ে হাসিঠাট্টা—তারপর একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রশান্তর চোখে ঘুম এল না। এক ঘর লোকের নিঃশ্বাস পতনের দরুণ ঘরের বায়ুস্তর উষ্ণ হয়ে উঠেছে। এ রকম অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। যদিও ঘরে আলো নেই, তবু সে কল্পনায় অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করছে। নিদ্রার অসতর্ক মুহূর্ত্তে—মানুষ কত অসহায়—! আলোর শাসন কোন কোন বৃত্তির পক্ষে পরম কল্যাণকর—অন্ধকারের

আশ্রয়ে তারা নিরঙ্কুশ। ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো মস্তিষ্কের রক্ত-চালনা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে—কিন্তু মাথার রক্তে যদি কামনার আগুন জ্বলে, ঘুম আসবে কোথা থেকে! শুভার সব কথা তখন মুছে গেছে—শুধু জাগছে ওই কথাটি :

দেহের দাবিটা অস্বীকার করে লাভ নেই কমরেড। দেহের দাবি? শুভাকে সে ভালবেসেছে? এ ভালবাসার কি অর্থ? সে অর্থ কি ওর কথায় পরিস্ফুট হয় নি? তবু প্রশ্ন জাগে—মানুষের মন কিছু জলে-ডোবা পদ্মপাতা নয়—কিংবা হাঁসের পালকও নয়। আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত পুড়বেই—অথচ আগুন নিয়ে খেলতে না পেলেও মনের অতৃপ্তি ঘোচে না। মন না জড়িয়ে পড়লে সে এতদূর এল কেন? আর কোন মেয়েকে না চেয়ে শুভাকেই বা কামনা করে কেন? অথচ শুভা—ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঞ্চয়ের বিরোধী। মানুষ কি সম্পত্তি? হাঁ—ওরা বলবে ভালবেসে যাকে আপন করে নিতে চাও তার স্বাধীনতা হরণ করবার জন্যই তোমার আবেগ--উচ্ছ্বাস—ত্যাগ এ-সবের কলকৌশল। দুটি স্বাধীন মানুষ--তাদের স্বাধীন মত নিয়ে মিলতে পারে শুধু সাময়িক ভাবে। কতকগুলি সুবিধা, সুবিধা বলতে আপত্তি হয়—সহযোগিতা বলতে পার--এই নিয়ে তারা পরস্পরের সহযোগিতা করবে—একটি মহৎ প্রচেষ্টা অর্থাৎ ভালবাসা থাকবে এই মিলনের মূলে। কিন্তু কায়ার সামীপ্য থেকে মনের গভীরে যদি প্রসারিত হয় সেই মহৎ প্রচেষ্টা অর্থাৎ ভালবাসা—তা হলেই কি বলতে পারবে তোমার স্বাধীন সত্তাকে অপহরণ করবার কৌশল? মানুষকে সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করে পেতে গেলেই যত আপত্তি, অথচ—মানুষের মুখ্য বৃত্তি এই একান্ত করে পাওয়ার সাধনাতেই সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে ধন্য হচ্ছে। পুঁজি-পতিরা নিজেদের সুযোগসুবিধা কায়েমি করবার জন্য

যেমন সৃষ্টি করেছে অতিমানবীয় সত্তা—কিনা ঈশ্বর—তেমনি দেহকে আর মনকে এক সঙ্গে কিনে নেবার জন্য সঞ্চারিত করেছে এই আবেগ অর্থাৎ ভালবাসা। ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গের যোগাযোগে এই বৃত্তিকেও সে আখ্যা দিয়েছে স্বর্গীয় সম্পদ। সমাজ সমন্বয়ের মূলে ঈশ্বরকে অস্বীকার করতেই হ'বে, কেননা, ধনিকতা-বাদের যে 'ক'টি দৃঢ় স্তম্ভ ভূমিসাৎ না হলে সমভূমিতে দাঁড়িয়ে হাতে হাত মেলানো যাবে না—এটি তার অন্যতম। প্রধানতমও বলা যায়। কিন্তু ধনিকতাবাদ থাক—আজ রাত্রিতে কিছুতেই কি ঘুম আসবে না? কিসের উত্তাপে মস্তিষ্কের রক্ত-প্রবাহ নিদ্রার আলস্যে শীতল হচ্ছে না? কেন এ উত্তেজনা?

টং টং করে তিনটে বাজল—সাড়ে তিনটে—চারটে। প্রশান্ত বিছানায় উঠে বসল। নিষুপ্ত নরনারীর নিঃশ্বাসে কেমন একটা গন্ধ ঘরের বাতাসকে করেছে ভারি। অত্যন্ত গাঢ় হয়ে উঠছে চিন্তা—একমুখীন চিন্তা, উগ্র—কামনা-কলুষিত চিন্তা। দেহলগ্ন শুভার দেহ-আস্বাদ-লোলুপ চঞ্চল রক্ত কণিকায় তরল আগুন জ্বেলে দিয়েছিল যে মুহূর্ত্ত—তা যেন নতুন আবেগে ফিরে এল নিদ্রাহীন প্রহরে। নিজেকে সম্বরণ করা অত্যন্ত কঠিন।

গলা শুকিয়ে গেছে, জল-তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে। একটু জল চাই—আলোটা জ্বালবে কি? না শুভাকে ডাকবে?

তখনই মনে হ'ল এ সবের দরকার হবে না। জলের কুঁজোটা কোণের দিকেই আছে—যেদিকে সে শুয়ে আছে সেই কোণের দিকে। একটু হাত বাড়ালেই কুঁজোটা হাতে ঠেকবে। কিন্তু শুভাও বেশি দূরে নেই। এক, দুই, তিন। ঠিক দোরের সামনে। শিয়রের দিকে বালিশের নিশানা ধরে অনায়াসে সে ওখানেও পৌছতে পারে। এক,

দুই, তিন। ওরা ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্ত—নির্ভয়ে। গভীর রাত্রি ওদের মস্তিষ্ক-কোষে ঘুমের স্নিগ্ধতা ভরে দিয়েছে।

বিছানা থেকে এগিয়ে গেল প্রশান্ত। এক, দুই, না, কুঁজোটাই ঠেকল হাতে। গ্লাসটাও রয়েছে কুঁজোর মুখে। গ্লাস ভরে সে জল নিলে—ঢক্ ঢক্ করে পান করলে আকণ্ঠ। সেই জলে হাত ডুবিয়ে কপালে, গালে, বুকে, ঘাড়ে, পায়ের পাতায় ও হাতের চেটোয় ভাল করে লেপে লেপে দিলে। তারপর বিছানায় শুয়ে কল্পনায় টেনে আনলে নিজের গ্রাম-খানিকে। সেই সঙ্গে ভেসে এল অশ্রুসজল একখানি মুখ—সেই করুণাস্নিগ্ধ মুখখানি আর কারও নয়—তার মায়ের।

এতক্ষণে প্রশান্ত সত্য সত্যই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল পরিপূর্ণ নিদ্রার শেষে। এ ঘরে সময়ের পরিমাপ করা করা যায় না—অন্ধকার অনেকখানি তরল হয়েছে এই মাত্র। রাত্রি নেই বেশ বোঝা যায়। প্রশান্ত উঠে বসল। চারিদিকে চেয়ে দেখলে —ঘরে কেউ নেই। তবে কি বেলা অনেকখানি হয়েছে? অতঃপর সে কি করবে? এ বাড়িতে এই তার প্রথম রাত্রি যাপন। কোথায় কলতলা—কোথায় শৌচাগার কিছুই তার জানা নেই। আশ্চর্য— তাকে কিছু না জানিয়েই ওরা চলে গেল?

শরীরে আলস্য লেগে রয়েছে—আরও খানিকটা ঘুম দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু এ বাড়ি থেকে আজই বিদায় নিতে হবে। এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। মনুষ্যত্বের দাবি জানাতে গিয়ে মানুষ হারিয়ে যায় এর অন্ধকারে। অন্ধকারে বসে আলোকের সাধনা!

নড়বড়ে দরজায় শব্দ হ'ল—কে এল বুঝি? চোখ চাইবার আগেই সে ডাকলে, ঘুম ভাঙল প্রশান্ত?

তড়াক করে সে বিছানায় সোজা হয়ে বসল। বললে, কোথায় গেছলে সব ?

অবন্তীকে তুলে দিতে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়েছিলাম প্রথমে—তারপর—

হাওড়া ষ্টেশনে ? কিন্তু ক্যালকাটা-দিল্লী মেল তো—

ও পাটনায় হল্ট করবে—পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে গেল। একটু হেসে বললে, সারারাত জাগলে বেলার পরিমাণ ঠিক রাখা যায় কি কমরেড ?

কে তোমায় বলেছে আমি সারারাত জেগেছি ?

কথাটা ভুল বলেছি কি ?

ভাগ্যে ঘরটা সব সময়েই আলো-আঁধারি! মুখের ভাব গোপন করতে মুখ ফিরিয়ে নেবার দরকার হয় না। প্রশান্ত বললে, তা হলে তুমিও ঘুমোও নি শুভা ?

কেন ঘুমোব না—যথেষ্ট ঘুমিয়েছি।

তবে কি করে বুঝলে আর একজন জেগে রয়েছে ?

অত্যন্ত সোজা জিনিস। ঠাঁইনাড়া হলে শীগ্‌গির ঘুম আসে না।

আর সকলের এল কি করে ?

ওদের অভ্যাস আছে। তা ছাড়া ওরা কালই প্রথম রাত কাটিয়ে গেল না এ বাড়িতে।

প্রশান্ত বললে, এ রকম্‌ করে হুল্লোড় করে লাভ কি ? এতে আসল কাজের ক্ষতি হয় না ?

কিছুমাত্র না। যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছি—তাতে মানুষে মানুষে যত হৃদ্যতা বাড়ে ততই কাজটা সহজ হয়ে আসে। নিজস্ব একটা বাড়ি—নিজস্ব একখানি ঘর—নিজের রুচিমত শয্যা—এর মোহ না কাটলে জগৎকে টেনে নিতে পারব কেন নিজের মধ্যে।

জগৎকে কোন দিনই এ ভাবে টেনে নেওয়া যাবে না। মানুষের প্রবৃত্তির ওপর জুলুম খাটাতে গেলে—

শুভা বললে, জুলুম এর কোন্‌খানে দেখলে ? একটি ছেলেকে জন্মাবধি বিলেতে রাখলে সে যদি কথায় আচারে ব্যবহারে সায়েব হয়ে ওঠে—তার ভারতীয় বৃত্তিগুলি বিজাতীয় প্রভাবে ভারতীয় সংস্কারমুক্ত হয়, তবে—ঘরের প্রসার বাড়িয়ে নেবার মন্ত্রটি সহজাত প্রবৃত্তির মত করে কেন গড়ে তোলা যাবে না ? মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বলছ যাকে—সে প্রতিবেশ-অর্জ্জিত কতকগুলি সংস্কার মাত্র। বুনিয়াদি শিক্ষার দ্বারা এ সংস্কার দূর করা অত্যন্ত সহজ।

প্রশান্ত বললে, তেমনি যাদের এই রকম বুনিয়াদি শিক্ষার অভাব তাদের পক্ষে তা অর্জ্জন করা শক্ত নয় কি ?

কেন শক্ত ? অভ্যাস—চেষ্টা—বলতে পার সাধনা—এগুলি আছে কি করতে ? আমাদের ত্যাগের দ্বারা—সহ্যের দ্বারা গড়ে তুলব এই রকম জগৎ। প্রথমটা সাম্য আনতে অনেক বাধা—বাইরে থেকে আর ভেতর থেকে—আসবে বইকি—তবু সব বাধার শেষ আছে এ আমরা জানি।

প্রশান্ত কথা কইলে না। সে ভাবতে লাগল। এখনও সময় আছে। ঘরকে সে ভুলতে পারছে না। নীতিকলুষিত আবহাওয়া—হাঁ, বার বার তার মনে হচ্ছে—এ আবহাওয়ায় নৈতিক পবিত্রতা নেই। কাল রাত্রিতে নিজেকে সে স্পষ্ট চিনতে পেরেছে—সর্ব্বমানবীয় কল্যাণবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়—নিজেরই কামনাকে পরিতৃপ্ত করতে সে এই পথে পা দিয়েছে। বাইরে স্বার্থত্যাগের বড়াই করে লাভ কি—মনের অসামঞ্জস্য বার বার তাকে পীড়ন করছে।

শুভা বললে, ওঠ শিশু মুখ ধোও—

রহস্যচ্ছলে বললেও সে স্বীকার করলে, সে শিশু। ছেলেরা চাঁদের লোভে আকাশে আঙুল তুলে বায়না ধরে—আর যৌবনের ধর্ম্মবশতঃ সে এসেছে এই পরিমণ্ডলে। শুভাকে সরিয়ে নিলে তার ত্যাগের কোন মূল্যই থাকবে না।

সত্যই সে কি অর্দ্ধেক পথ এগিয়েছে? পিছু হটে যাত্রা আরম্ভ করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়?

১১

বিরাজমোহিনী মলয়কে একান্তে ডেকে বললেন, তুমি আমার ঘরের ছেলের মত—হাঁ বাবা, সত্যি করে বল ত—প্রশান্ত কি সত্যই বয়ে গেছে?

তাঁর অশ্রু-গদগদ কণ্ঠস্বরে মলয় বেদনা বোধ করলে। মিথ্যা করে সান্ত্বনা দিতে তার মন সরলো না। বললে, কাকিমা, সত্যি কথা বলব রাগ করবেন না। কাকে আপনারা বয়ে যাওয়া বলেন? যে ছেলে চাকরি করতে চায় না—দেশের কাজে জেলখানায় যায়—যক্ষ্মায় ভোগে—

বিরাজমোহিনী বললেন, লেখাপড়া জানি না বলে কি ভালমন্দও বুঝতে পারি না বাবা? ও সব কাজ করে অখ্যাতি পেয়েছে কেউ সে কথা তো জানি না। অবশ্য—যে ছেলে সংসার-ধর্ম্ম কি উপার্জ্জন করে না তাকে দুনিয়ার বার বলে থাকি আর সেই ছেলের জন্যই মায়ের মন পোড়ে বেশি।

মলয় বললে, তবে কি ভেবে আপনি বললেন ও কথা?

বিরাজমোহিনী মনে কি যেন হিসাব করলেন। কথাটা বলা যুক্তিযুক্ত কিনা হয়তো ভাবলেন মুহূর্ত্তকাল—কিন্তু মনের সন্দেহ ও বেদনাকে মুক্ত করে না দিলেও তো নিস্তার নাই। অবশেষে বললেন, মায়ের মনের

সাধ-আহ্লাদের কথা তো বুঝতে পার বাবা, একটি মনের মত টুকটুকে বউ পেলে সংসারটা তাদের ভরে ওঠে—

মলয় বললে, টুকটুকে বউ হলেই তো মনের মত হয় না কাকিমা।

তা না হোক—ছেলে সুখী হলেই আর সমাজে নিন্দে না হলেই আমাদের শান্তি। একটু থেমে বললেন, শুনলাম একটি মেয়ের সঙ্গে প্রশান্তর ভাব হয়েছে। আর মেয়েটি নাকি আমাদের স্বজাতি নয়।

ওঁর প্রকৃত ব্যথা বুঝতে পেরেও মলয় বললে, নাইবা হ'ল স্বজাতি কাকিমা—প্রশান্ত যদি এতে সুখী হয়—

সমাজ সে মেয়ের মর্য্যাদা দেবে কেন বাবা? এখনও তো খ্রীষ্টান হই নি আমরা।

মলয় বললে, আপনি ভাববেন না কাকিমা—হয়ত—এমনটা না-ও ঘটতে পারে। কিন্তু যদি ঘটেই—তো একটি ছেলে আপনার—তার জন্য সমাজ ছাড়তে পারবেন না?

না বাবা—আমাকেও পাঁচ জন আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে ঘর করতে হয়। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে—ছোট মেয়েটিকেও পার করতে হবে। আমি সমাজে চিরকাল মাথা উঁচু করে এসে কিসের জন্য হেনস্থা সইব সকলের বল তো? শেষের দিকে স্বরে তাঁর দৃঢ়তা ফুটে উঠল।

মলয় বুঝলে উনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মায়ের মনে অন্য যুক্তির ঠাঁই নেই। পুরুষরা কালধর্ম্মের স্রোতে পা রেখেও যখন পরিবর্ত্তনকে সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়ে মানতে পারেন না—যুক্তির সারবত্তা করেন না স্বীকার, তথাকথিত আচার-পদ্ধতিকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলে সংস্কারমূলক কল্যাণকর্ম্মকে বলেন অনাচার—সে অনাচারের অনুষ্ঠাতাদের গালিগালাজ করেন নির্ম্মমভাবে—তখন অন্তঃপুরের বিধিতে ও সমাজের বিধানে অভ্যস্ত মেয়েদের কাছ থেকে কি বা প্রত্যাশা করতে পারা যায়!

বিরাজমোহিনী পুনরায় অনুনয়ভরা কণ্ঠে বললেন, সত্যি করে বল তো বাবা—সে কি সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করবে?

মলয় বললে, আমি বিশেষ কিছু জানি না কাকিমা, খোঁজ নেব।

শুধু খোঁজ নিলে হবে না, এগিয়ে এসে তিনি মলয়ের দুটি হাত চেপে ধরলেন, এর উপায় তোমায় করতে হবে।

উপায়! কি উপায় করব আমি? মূঢ়ের মত জিজ্ঞাসা করলে মলয়।

যাতে এ বিয়ে না হয়—

মাপ করবেন কাকিমা, তাদের মধ্যে যদি ভালবাসা হয়ে থাকে···না, না, আমায় মাপ করবেন।

বিরাজমোহিনী খানিকটা অভিভূতের মত চেয়ে রইলেন মলয়ের পানে। তারপর মনে হ'ল—ও তো হেমলতারই ছেলে। নিকট প্রতিবেশিনী—যারা সর্ব্বদাই অন্বেষণ করছে প্রতিবেশীর ছিদ্র—তাদের সততায় বিশ্বাস রাখা কঠিন—অত্যন্ত কঠিন। প্রতিবেশীরা ভাল—এ কথা পাঁচিলের পিঠে ঘর তুলে স্বীকার করা কঠিনই তো।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, তা বলবে কেন বাবা, তুমি তো অজাতের মেয়ে ঘরে আন নি—সমাজে কোন নিন্দেও হয় নি তোমাদের—

মলয় দুয়োরের কাছ থেকে ফিরে এল। নীচু গলায় বললে, আপনি দুঃখ পাবেন জানলে একথা কখনই বলতাম না কাকিমা। কিন্তু এ-ও জেনে রাখবেন—প্রশান্তকে যদি আমাদের সমাজ ঠাঁই না দেয়—আমার ঘরে ওদের জায়গা আমি রেখে দেব।

বিরাজমোহিনী এ কথায় সান্ত্বনা লাভ দূরে থাক—রীতিমত রুষ্ট হয়ে উঠলেন। মলয় ভাগ্যিস তাঁর সামনে নেই—না হলে ক্রোধের বশে তাকে কটু-কাটব্য করা তাঁর পক্ষে একটুও অসম্ভব ছিল না। দ্রুতপদে তিনি দুর্গামোহনের শোবার ঘরে এলেন।

কিন্তু ওই বার্দ্ধক্য-পীড়িত শয্যাশায়ী মানুষটিকে তিনি কি বলতে পারেন? তাঁর মনে যে বেদনা—সে কি ওঁর মনেও গুরুভার হয়ে নেই? উনি বার বার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, প্রশান্ত ওঁর ছেলে নয়—সে যদি অসবর্ণ মেয়ের পাণিগ্রহণ করে—এ ঘরে তার স্থান হবে না—এক কাণাকড়িও তাকে দেবেন না উনি। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য-উদাসীন ছেলের প্রতি কিসের বা মমতা!

দুর্গামোহন মাথা তুলে বললেন, এখন তো ওষুধ খাবার সময় হয় নি—

না—এমনি দেখতে এলাম ঘুমিয়েছ কি না?

দুর্গামোহন একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে বললেন, কাঁদছিলে বুঝি?

বিরাজমোহিনী ত্রস্তে চোখের কোলে তর্জ্জনীটা বুলিয়ে নিয়ে হাসলেন। বললেন, তুমি শীগ্‌গির করে সেরে ওঠ দেখি—

আমি সেরে উঠলেও চোখের জল শুকোবে না—শুকোবে না—শুকোবে না। ছেলেমানুষের মত তিনি হেসে উঠলেন।

বিরাজমোহিনীর বুকখানা কেঁপে উঠল। দুর্গামোহনের মাথার গোলমাল হয় নি তো? সত্যিই তাঁর চোখের জল শুকিয়ে গেল। বেদনাকে ঢাকা দিতে দুশ্চিন্তার মত বস্তু আর নেই।

শিয়রের টুলের ওপর বসে বললেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?

তা দাও। তবে কিছুতেই কিছু হবার নয়। বলে একটু হেসে বিরাজমোহিনীর হাতখানি টেনে এনে বুকের ওপর রাখলেন।

বিরাজমোহিনী বললেন, আজও কি বুকে তেল মালিশ করে দেব?

না—হাতখানা রাখ। তাঁর হাতখানি চেপে ধরলেন।

আর কোন কথা হ'ল না—ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে দুটি অন্তরের মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করতে লাগল।

মলয় বাড়ি এসে দেখল—হুলস্থুল ব্যাপার লেগে গেছে। মা পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছেন, দোতলায় ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি চলছে। বড় বউয়ের ফিট্ হয়েছে। খবরটা কাঁদতে কাঁদতে মা-ই দিলেন।

এর বেশি কিছু জানতে হলে সুচিত্রা ছাড়া গতি নেই। ও এতক্ষণ বড় বউয়ের শুশ্রূষায় লেগে রয়েছে। ছেলেরা গোলমাল করছে—হয়ত বা ভিড়ও জমিয়েছে।

উপরে উঠে দেখে—সত্যিই ব্যাপারটি কিছু গুরুতর। একটি ঘটি কাত হয়ে বারান্দার রেলিঙে ঠেকেছে—জল গড়াচ্ছে সারা মেঝেয়। পাখা খান-দুই এসেছে—আর জলে ভিজে সপ সপ করছে। রোগীর সারা দেহে আক্ষেপ তো আছেই—মাথার চুল আর বিশৃঙ্খল পরিধেয় থেকে জল পড়ছে গড়িয়ে। দশ বছরের ভাইঝিটা শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে পাখা নাড়ছে। হাওয়াটা রোগীর মাথায় লাগছে না—মেঝেয় লাগছে। দাঁতে দাঁত লেগেছে রোগীর। একটি মাঝারি গোছের চাবি অতি কষ্টে সুচিত্রা দাঁতের মাঝখানে বসাতে পেরেছে। এখন সে হাঁটু গেড়ে বসে রোগীর হাতের মুঠো খুলে দিচ্ছে—আর চাবিটা যাতে দাঁতের চাপ থেকে আলগা হয়ে না পড়ে সেই চেষ্টা করছে।

মলয় বললে, হঠাৎ এ রকম হ'ল কেন?

বলছি। তুমি ভাল করে হাওয়া লাগাও তো মাথায়।

কেন, স্মেলিং সল্টের শিশিটা কোথায় গেল?

বড়দির হার্ট খুব উইক—এ্যামোনিয়া চলবে না। ব্লটিং পুড়িয়ে ধোঁয়া দিতেও পারতাম—সাহস হ'ল না।

মেয়েটির হাত থেকে পাখাখানি নিয়ে মলয় বাতাস করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে আঁ-আঁ—করে রোগী পাশ ফিরল। হাতের মুঠি নরম বোধ হ'ল।

সুচিত্রা বললে, তুমি ঘরে গিয়ে বোস—এখনি জ্ঞান হবে বড়দির।

বাড়ির এই আবহাওয়া কোন কালেই ভাল লাগে না মলয়ের। বহু পুরাতন জটিল রোগের তীব্রতা না থাকলেও—নিত্য নূতন উপসর্গে যেমন বিরক্তি জন্মায়—তেমনি মনে হয় বাড়িটাকে। কয়েক বিঘা জমির মালিক হয়ে—নানা প্রকারের অশান্তি বাসা বেঁধেছে এখানে। বাপ-ঠাকুরদাদারা চেয়েছিলেন—উপার্জ্জনের অর্থে ভাবী বংশধরদের খাওয়া-পরার সুব্যবস্থা করতে। লক্ষ্মী যে চঞ্চলা—যাঁদের জমি আছে—তাঁরা এ প্রবাদবাক্যের মর্ম্ম বোঝেন। আজ জমির স্বত্ব থেকে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না—জমির হাঙ্গামা পোহাতে হয় শুধু। চাষায় হাল-বলদ দিয়ে জমি চাষ দেয়—ভাগ আধাআধি। কিন্তু সেই আধাআধি ভাগের সিকিও ঘরে ওঠে না যথাসময়ে তদারক না করলে। খাজনা মিটাবার দায় তাদের—জমিতে সার দেবার খরচ সেও তাদের—আবার কোন্ জমিতে কি ফসল দেওয়া কর্ত্তব্য এ নির্দ্দেশ দিতে পারলেও ভাল হয়। শ্রাবণে বা ভাদ্রে ধান রোয়া শেষ হলেই চাষের কর্ত্তব্য শেষ হবে না। কার্ত্তিকে একবার জমি দেখা দরকার—কি ফসল হ'ল। তার পর পৌষে দিন পনর ধরে সেই ফসল কাটা—ভাগ বুঝে নেওয়া—খড় বিক্রী করা—ধান গোলাজাত করা—গেল বার যাদের ধান ধার দেওয়া হয়েছে—তাদের কাছ থেকে বুঝে নেওয়া—এ সব বহু জটিল ব্যাপারের অন্তর্গত। বার দুই মলয়কে এই সব তদারক করবার জন্য যেতে হয়েছিল। বড়দা থাকতে তিনি পোয়াতেন এসব হাঙ্গামা। তাঁর অবর্ত্তমানে মেজদা প্রতি বছরে এই সময়ে এক মাস করে ছুটি নেন। কিন্তু একবার বিশেষ জরুরি কাজ পড়াতে অফিসার মেজদাদাকে ছুটি দেয় নি

—আর একবার উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই দু'বারের অভিজ্ঞতা —সারাজীবনে ভুলতে পারবে না মলয়। ধনধান্যেপুষ্পেভরা—বা মাঠে মাঠে ভরা সোনার ধান—মনে হয়েছিল কবিদের অত্যুক্তি। যে কবির জমি ছিল না—পাকা ধানভরা মাঠের শোভা দেখে মুগ্ধ হওয়া তাঁরই মানাতো। কিন্তু সরল চাষীদের কাছে ভাগ বুঝে নেওয়া ও হিসাব মিল করা—ধান কাটা—আছড়ানো—কড়তা বাদ—সুদের হিসাব —পায়ে ধরাধরি—ফাঁকি দেবার কচকচি—এ সব বাস্তব ব্যাপারকে লক্ষ্মীর আবাহন বলে ভুল করবেন না কেউ। চাষারা সরল দুঃখী আর নির্ব্বোধও বটে—তবে পয়সার দিক দিয়ে তারা শক্ত। একটি পয়সার জন্য তারা অজস্র কথা বানিয়ে বলবে—রাতারাতি মাঠের মাড়াই ধান সরিয়ে ফেলবে—না দেখলে ত কথাই নেই। সব চাষার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না—তবে মলয় যাদের সংস্পর্শে এসেছে তাদের কথা ভোলা শক্ত। হয়তো অনেক দিনের অত্যাচার সয়ে—এই সংস্কার তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে যে যারা হিসেব বুঝে নিতে আসে তাদের সঙ্গে শঠতা না করলে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবেই। হয়তো পাইকদের হাতে লাঞ্ছনা সয়ে—নায়েবের ধমক ও চোখ রাঙানী পেয়ে স্বভাবটা ওদের অমনিই দাঁড়িয়েছে। পীড়ন শুধু দেহকেই পঙ্গু করে না—মনকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে—নীতি থেকে করে ভ্রষ্ট। ওরা যা হতে পারত তা হতে পারে নি—লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা রয়েছে এর মূলে। সেইজন্য প্রভুজাতীয় কোন লোককে ঠকাতে ওরা সিদ্ধহস্ত। এই বঞ্চনা যে ঘৃণার নামান্তর নয় তাই বা কে বলবে ?

বহুদিন থেকে একটা কথা কানাকানি হচ্ছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাকি থাকবে না। মধ্যস্বত্বভোগীদের সুবিধাটুকুও আইন করে কেড়ে নেওয়া হবে। যে নিজের হাতে হাল-বলদ দিয়ে জমি চষতে পারবে— জমির স্বত্বে সেই হবে স্বত্ববান। এতে করে প্রত্যেক রায়তের হাতে জমি

আসবে—ঋণের দায়ে মহাজনের কাছে তাদের মাথা বিকিয়ে থাকবে না। সরকার বাহাদুর আর প্রজা—মাঝখানে হিস্যাদার কেউ থাকবে না। হোক না আইন—মলয় এতে অমঙ্গল কিছু দেখতে পায় না। লোকে বলে বটে—লক্ষ্মী বসতি করেন তারই ঘরে—যার দু'বিঘে আছে। গত মহা দুর্ভিক্ষে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যাদের জমি ছিল—তারা পেট ভরে খেয়েছে আর সিন্দুক ভরে জমিয়েছে টাকা। সম্পন্ন চাষা দশ টাকা দামের শাড়ি কিনে গৃহিণীকে উপহার দিয়েছে, নিজের জন্য কিনেছে সাইকেল। যারা জনমজুরি করে খায়—দু' এক বিঘে জমিতে ভাঙা লাঙ্গল ও রুগ্ন বলদ খেদিয়ে চাষ দেয়—তারাই মরেছে দুর্ভিক্ষে। এই ব্যবস্থা হলে—সামান্য জমির মালিকরা কিংবা যাদের জমি নেই তারা অন্ততঃ খেয়ে পরে বাঁচবে। মধ্যস্বত্বদারেরা যাবে কোথায়? জমির উপস্বত্ব যাদের উপরি আয়ের সামিল—তারা করুক না যা খুশী। নিজের হাতে লাঙ্গল ধরতে পারে জমি থাকবে হাতে—না পারে, যার শ্রম—তারই ঘরে বিতরিত হোক কমলার কৃপা। এতে দুঃখ করবার কি আছে।

সুচিত্রা ঘরে এসে বললে, একবার নন্তু-দাদুর কাছে যাও তো। তিনি নাকি বটু ঠাকুরের কি খবর এনেছেন।

দাদার খবর! কে বললে তোমাদের?

কেন—পটার মা এই মাত্র বলে গেলেন মাকে। তা তিনি যদি খবরটা চুপি চুপি বলেন তো বড়দির ফিট হয় না।

কি বললে পটার মা?

নাকি—মথুরা না বৃন্দাবন কোথায় ট্রেনে এক সাধুর সঙ্গে ওঁদের দেখা হয়। সাধু ওঁদের গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করে—আরও অনেক কথা শুধায়। এক সময়ে নাকি জিজ্ঞাসাও করেছিলেন—তে-মাথা

রাস্তায় যে বড় বটগাছটা আছে সেটা এখনও আছে—না কেটে ফেলা হয়েছে? যেমন বলা, নন্তু-দাদু চেপে ধরেন—তিনি জানলেন কি করে তে-মাথা রাস্তায় বটগাছ আছে? সাধু একটু হেসে বললে, ও গ্রামে আমি একবার গিয়েছি। কবে? কেন? কত দিন ছিলেন সেখানে? এই সব জিজ্ঞাসায় সাধুকে জেরবার করে ফেলবার পর নন্তু-দাদু বুঝতে পারলেন—এক বার নয়—হয়তো অনেক বার উনি ওখানে গেছেন আর অনেক দিন ছিলেনও ওখানে। কোন জংশনে গাড়ী বদল হতেই সাধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়—কিন্তু তাঁর আশ্রমের ঠিকানা ওঁরা নিয়ে এসেছেন।

ও—ওঁদের বিশ্বাস হয়েছে দাদাই সেই সাধু?

সুচিত্রা বললে, বিশ্বাস কি সাধে হয়েছে? নামবার সময় সাধু আমাদের বাড়ির কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছেন যে।

তারপর?

তারপর—তোমার তো অনেক বন্ধুবান্ধব আছে বহু জায়গায়—খোঁজ নাও।

আর খোঁজ না পেলে আমাকে সেই আশ্রমের ঠিকানা খুঁজে বার করতে হবে?

কেন—সে কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?

কিন্তু দাদার বিরুদ্ধে খুনের চার্জ্জ উইথড্র হয় নি। এ্যাবস্‌কণ্ডারকে খুঁজে বার করার মানে বোঝ তো?

সুচিত্রা শুষ্ক স্বরে বললে, এত দিন পরেও কি—

রাজার আইন কাউকে ক্ষমা করে না।

কিন্তু মা যে কাঁদছেন?

কাঁদুন।

বড়দির জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়, সে কথা ভাবছ কি ?

মলয় মাথা নেড়ে বললে, যদি কোন দিন আইন হয় দুষ্কৃতিবান স্বামীকে হিন্দু-স্ত্রী অনায়াসে বর্জ্জন করতে পারবে—আমি সে আইন সমর্থন করব।

তুমি তো আইন-সভার কেউকেটা নও—তোমার সমর্থনের মূল্য কি! সুচিত্রা হাসলে।

কিন্তু এ নিয়ে প্রোপাগাণ্ডা করতেও তো পারি।

ক'রো—উপস্থিত খবরটা নেবে কিনা ভাল করে ?

চটি পায়ে দিয়ে মলয় বললে, এইজন্য বাড়িতে আসতে চাই না—একটা-না-একটা হাঙ্গামা তোমরা বাধাবেই।

হাঙ্গামা! তোমরা যে স্বদেশী কর—সেকি বিনা হাঙ্গামায় ?

মলয় উত্তর না দিয়ে বার হয়ে গেল।

নস্তু-দাদুর পুরো নাম নারায়ণ রায়। বয়স সত্তর দাঁড়িয়েছে—তবু দেহের প্রান্তে যৌবনের পড়ন্ত রোদটুকু লেগে রয়েছে। এ বয়সে মাথার চুল ক'গাছি পেকেছে গুনে বলে দেওয়া যায়। চালছোলা ভাজা চিবোবার মত মজবুত দাঁতের অভাব নেই। যৌবনকালে তিনি নাকি দুঃসাহসিক ছিলেন। লোকে বলত উচ্ছৃঙ্খল। এখন বছরের তিন-চার মাস ঘুরে বেড়ান তীর্থে তীর্থে। একই তীর্থে বহু বার গেছেন—তীর্থকৃত্য তাও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে থাকেন। সকালে আর সন্ধ্যায় পুরো দুটি ঘণ্টা কাটে তাঁর রুদ্ধ-দ্বার ঠাকুরঘরে। যৌবনে যে উদ্যমে একটিও দেবতাকে মাথা নুইয়ে স্বীকার করেন নি—জরার অধিকারে এসে তেমনি উদ্যমে তাদের তেত্রিশ কোটিকে জীবনের জপমালায় গেঁথে নিয়েছেন। সংসার তাঁকে সৌভাগ্য দিয়েছে—আঘাত দিয়েছে। নারায়ণ রায় আর এক দিক দিয়ে গ্রামের অগ্রণী হয়েছেন বলা যায়।

তাঁকে সেথো করে প্রতি বছর বহু নরনারী ভারতের বিভিন্ন তীর্থে পুণ্য সঞ্চয় করে বেড়ায়। তাঁর আহার, গাড়ী-ভাড়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুর দায়িত্ব বহন করে—এই পুণ্যকামীরা।

তা ছাড়া দেশ-বিদেশের গল্প বলার—পুরাণ-ইতিহাস মিলিয়ে সে গল্পকে মিষ্ট করার কৌশল তিনি জানেন। তাঁর বাইরের ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়াও সব রকম বয়সের মেয়েপুরুষের ভিড় প্রায় সর্ব্বক্ষণ লেগেই থাকে।

মলয় ঘরে ঢুকে দেখলে ক'টি শিশুকে নিয়ে তিনি আসর জমিয়েছেন। ছেলেরা সব গল্পের চেয়ে ভূত-পেত্নী রাক্ষস-ব্রহ্মদৈত্য বা যুদ্ধের গল্প শুনতে ভালবাসে। নন্তু-দাদু রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণ থেকে গল্প বলেন—দৈত্য রাক্ষস আর যুদ্ধ এ সব প্রচুর থাকে তাঁর গল্পে।

তিনি বলছিলেন, জানিস দাদু—ব্রহ্মার বরে কুম্ভকর্ণ দিচ্ছিলেন ঘুম। ছ'মাস ঘুমের পর এক দিন তিনি জাগেন—সেই এক দিনই সারা পৃথিবীতে স্বর্গে আর পাতালে হুলস্থুল কাণ্ড। যেমন তেমন রাক্ষস ত নয়। যে ঘরে তিনি ঘুমোন—সেই ঘরটা লম্বায় হ'ল ত্রিশ যোজন আর চওড়ায় দশ যোজন—এই থেকে বোঝ কত বড় রাক্ষস তিনি।

মলয় ঘরে ঢুকে বললে, থাক দাদু—বেচারী কুম্ভকর্ণকে আর অকাল নিদ্রা ভাঙিয়ে তুলবেন না—

তিনি হেসে বললেন, বোস রে ভাই—বোস। ছেলেগুলোর এই ত চেহারা কিন্তু ভীষণ ভীষণ রাক্ষস দৈত্য এ সবের গল্প না শুনলে ওরা ঘুমোতেই পারবে না।

ছেলেরা গল্পে বাধা পড়াতে বিরক্ত হ'ল। বললে, গল্পটা শেষ কর দাদু, নইলে—

নন্তু-দাদু বললেন, না করলে কি যে হবে তা জানি। গাছের পেয়ারা কুল কি বাগানের আম একটিও থাকবে না।

বাঃ রে, আমরা বুঝি আপনার গাছে হাত দিই?

কেন দিবি নে ভাই—ফল ত তোদেরই জন্যে। কুল পেয়ারা ওসব বুড়ো বয়সের জন্য নয়—তবে আমটি যদি ভাল হয়—

আচ্ছা দাদু—আম আপনার একটিও নষ্ট হবে না। দেখবেন পাকা আম পেড়ে কেমন না দিদিমাকে দিয়ে যাই।

পাকা আম খাওয়াবি এ মস্ত প্রলোভন বটে। মলয়ের পানে চেয়ে হাসলেন, কিন্তু কাঁচা আমগুলো যদি তোদের লোভ থেকে বাঁচে···আহা হা—রাগ করিস কেন ভাই—বুড়ো হয়েছি বলেই কি চিরকেলে বুড়ো আমি? আমাদেরও ছেলেবয়স ছিল।

মলয় বললে, গল্পটা সেরে নিন—কিছু কথা আছে দাদু।

খানিকক্ষণ মলয়ও সে গল্প শুনলে। দাদু বলেন ভারি মিষ্ট করে—রসিয়ে রসিয়ে—কৌতূহলকে জাগ্রত করে। মন্দ লাগছে না গল্প।

ছেলেরা চলে যেতেই ও প্রশ্ন করলে, আচ্ছা দাদু, এমন আজগুবি গল্প শুনিয়ে কি লাভ? চার কোশ ধরে কপাটের পাল্লায় যে রাক্ষস থাকত—তাকে আঁটতে গোটা লঙ্কা শহরটাই যে লাগে। আর প্রত্যেক রাক্ষসের সঙ্গে দশ কোটি বিশ কোটি বীর চলতো যুদ্ধ করতে—বানরদের এক এক জনের সঙ্গে আশি কোটি নব্বুই কোটি সৈন্য—এ সব সারা ভারতবর্ষে ধরে না—লঙ্কায় ধরল কি করে!

দাদু বললেন, যুদ্ধের বর্ণনা অনেক বাড়ানো—নাতি। তোদের কালটারই কথা ধর। এই যে দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে লোক মরল—কেউ বলছে দশ লক্ষ—কেউ বলছে পনেরো—কেউ বা বলেন—ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ। এ মহাযুদ্ধের হিসাব-নিকাশ এখনো হয় নি—

গেল মহাযুদ্ধে সবসুদ্ধ আশি লক্ষ লোক মরেছিল—এ সব ঠিক বলে মেনে নেওয়া হয়। যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু উনিশ-বিশ হয়ই।

কিছু নয়—আকাশ-পাতাল তফাৎ। আর এই আজগুবি গল্প—!

দাদু বললেন, পৃথিবীতে কোন্‌টা আজগুবি আর কোন্‌টা সত্যি কে বলবে ভাই! দুটো বোমা খেয়ে দুর্দ্ধর্ষ জাপান ঘাল হবে—একথা তোমরা কোন দিন বিশ্বাস করতে কি? অথচ তাই হ'ল। যখন তর্ক করার প্রবৃত্তি থাকে মানুষের তখন বয়সটা থাকে তোদের কোঠায়—আমাদের কোঠায় বয়স গড়ালে বিশ্বাসই হ'ল আসল বস্তু। দাদুর কথার সুর ঈষৎ গম্ভীর হ'ল।

বেশি দিনের কথা নয়—সেকেণ্ড ইয়ারের গ্রীষ্মের ছুটিতে মলয় তখন দেশেই রয়েছে। দাদুর ছোট ছেলে নিশীথ—মলয়ের বন্ধুই ছিল সে—কাজ করত একটি মার্চ্চেন্ট আপিসে, এক শনিবারে জ্বর নিয়ে বাড়ি এল। দারুণ জ্বর, বেহুঁস অবস্থা। ডাক্তাররা কেউ বললেন, পক্স—কেউ বললেন, ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া—কেউ বা বললেন, মেনিন্‌জাইটিস। মোট কথা তাঁদের মতভেদ হওয়াতে সে রাত্রিতে ফিভার মিক্‌শ্চার ছাড়া বিশেষ কিছু পড়ল না। তার পর দিন আসল রোগ ঠিক হ'ল বটে—রোগীকে ফেরানো গেল না। সেইটি দাদুর শেষ ছেলে। তার পরই দাদু মন্ত্র নিলেন—নিয়ম করে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পড়তে লাগলেন। কেউ তর্ক করতে এলে বলেন, ও সব পাট মিটিয়ে দিয়েছি ভাই—আর কেন!

আপনার মনের বল কমে গেছে দাদু।

দেহের বলও কমছে যে ভাই। কিন্তু সে কথা নয়। আসলে আমরা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারি একটি অবলম্বন পেলে। সে মানুষই হোক, আর ঈশ্বরই হোক। তুমি তো বলবে ঈশ্বর নেই? তোমাদের কাজ

যথেষ্ট—নতুন পৃথিবী না হোক—পৃথিবীতে নতুন বিধান তৈরি করবে ওই আশ্বাসে আর উৎসাহে মানুষের বেশি কিছু স্বীকার করতে চাও না। কিন্তু আমরা জানি পৃথিবী পুরাতন। নতুন মানুষের মনে বার বার নতুন হয়ে সে ফিরে আসে—এই মাত্র।

কিন্তু দাদু, আপনাদের ছেলেবেলাকার পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীর কত তফাৎ দেখুন তো।

হাঁ—বিজ্ঞান পৃথিবীকে নতুন করে তৈরী করছে। আমাদের কালে যে পৃথিবী প্রকাণ্ড ছিল—আজ সে ছোট হয়ে গেছে। তবু এ তার বাইরের সাজসজ্জা। আমার এই ময়লা কাপড়টার সঙ্গে তোমার ধবধবে খদ্দরের পোষাকটার যেমন তফাৎ—তোমার দেহের সঙ্গে আমার দেহের গঠন মিলবে না—তবু তুমি মানুষ—আর আমি মানুষ ছাড়া আর কিছু এও তো ঠিক নয়। বুড়ো হলেই মানুষের লাঠির দরকার হয় ভর দিয়ে চলবার জন্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার সেই লাঠি দাদু।

এ সব তর্ক বহু বার হয়ে গেছে। যুক্তির শক্ত পথ থেকে দাদু বিশ্বাসের নরম ভূমিতে নেমেছেন; এ পরিবর্ত্তনের গভীরে রয়েছে যে হেতু—তা বিয়োগ-বেদনায় বাষ্পাকুল। বেশি তর্ক করে তাকে উদ্‌ঘাটন করা চলে না। শোকে সান্ত্বনা দেওয়া মামুলি প্রথা—তাতে আশ্রয় পাওয়াও দুর্ঘট। নিজের মন থেকে সহজাত প্রবোধ ও আশ্বাস না পেলে—কোন্ যুক্তিতে চিত্ত স্থির হতে পারে!

মলয় এক মুহূর্ত্তে অনেক কিছু ভেবে নিয়ে বললে, দাদার খবর জানতে এলাম দাদু—সত্যিই কি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

দাদু বললেন, এরই মধ্যে খবরটা পাড়ায় রটে গেছে? ভাল হয় নি দাদু। তোমার মাকে সামলানো কঠিন।

মার চেয়ে বৌদিদির অবস্থা খারাপ—তাঁর ফিট হচ্ছে।

দাদু বললেন, আমার কথা যদি শোন তো তাঁর খোঁজ করো না ভাই।

কেন দাদু?

মানুষ এক বারই জন্মায় না ভাই—মৃত্যুও তার বহু বার ঘটে।

যদি বলি জন্মান্তর মানি না?

দাদু হেসে বললেন, দেহ বদলে যে জন্ম তার কথা তো বলি নি ভাই। তোমার মন—বুদ্ধি—রুচি—প্রবৃত্তি বা সংস্কার—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত বহু বার বদলাবে। তারই জন্যে ছেলেবেলাকার নাস্তিক দাদু তোদের আস্তিক হয়েছে রে। একটু থেমে হেসে বললেন, বৃন্দাবনে যাবার পথে যে সন্ন্যাসীকে দেখে আমার সন্দেহ হয়—তাকেই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—আচ্ছা আপনি তো সংস্কারমুক্ত পুরুষ—বিশেষ করে ওই গ্রামখানির কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হতেও পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম,—জাতিস্মররা শুনেছি পূর্ব্বজন্মের কথা ঠিকমত বলতে পারেন।

সন্ন্যাসী বললেন,—জাতিস্মর না হয়েও কি মানুষের জন্মান্তর হয় না? দ্বিজত্বে ওঠে কি করে মানুষ? আপনার দশ বছরের দেহ আর বিশ বছরের দেহ কি এক? সেই সঙ্গে মনও খোলস বদল করছে বার বার।

সাহস করে বললাম,—তবু হারানো জনকে ফিরে পেলে আত্মীয়-বন্ধুরা কম সুখী হয় না। তাদের মধ্যে বাস করার যে শান্তি—

সন্ন্যাসী হেসে বললেন,—শান্তির স্তরভেদ আছে জানেন কি? যে মধুর স্বাদ পেয়েছে—চিনিতে স্বভাবতঃই তার স্পৃহা থাকবে না—পরম সঙ্গ পেলে আসঙ্গলিপ্সা তেমনি ফিকে বোধ হয়। আপনি

জ্ঞানী—সংসারের স্বাদ আর পরব্রহ্মের অনুভূতি—একের সঙ্গে অন্যের তুলনা—এ তো চলে না জানেন।

মলয় জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে তিনিই যে আমার দাদা—এ সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ নেই ?

কিন্তু তিনি নবজন্ম লাভ করেছেন—তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক টানতে গেলে তোমরা হয়ত দুঃখই পাবে ভাই। অন্ততঃ বড় বৌমাকে এ সব না শোনানই ভাল।

কিন্তু দাদু, মন্দ যা তা ঘটে গেছে।

তারা, তারা! দাদু একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন। যা ভাল বোঝ কর ভাই—না ছাড, তাঁর আশ্রমের ঠিকানাটি দিচ্ছি, কিন্তু মেয়েদের নিয়ে সেখানে যেও না। মানুষের ইচ্ছা ব'লে যে জিনিষটি আছে তার প্রতিকূলে কিছু করা যুক্তিসঙ্গত নয় ভাই।

মলয় বললে, তা কি সম্ভব দাদু! তবে আমাদের কর্ত্তব্যে যেটুকু না করলে নয়···আচ্ছা আসি দাদু।

দাদু তার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহ হাসি হেসে বললেন, হাঁ রে—তুই নাকি একবার জেল খেটেছিলি ?

মলয় মাথা নীচু করে হাসলে, সে আর বেশি কি দাদু।

কবে ?—আমি তো শুনি নি—

সে এমন কিছু নয় শোনাবার মত। ওই যে আগষ্ট মাসে 'কুইট ইণ্ডিয়া'-রেজল্যুশন হ'ল না—তারই ফলে ভারতবর্ষে একটা ঢেউ বয়ে গিয়েছিল তো—

বলিস কি—আগষ্ট মুভ্‌মেণ্ট! সিপাহী বিদ্রোহের পর ও ধরণের বিক্ষোভ ভারতবর্ষে আর দেখা দেয় নি। শুনি তো বহুলোক রক্ত দিয়ে তাদের ভুল কাজের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

মলয় মাথা উঁচু করে স্থির দৃষ্টিতে চাইলে তাঁর দিকে। অসহায় ক্রোধ কিংবা বেদনা—কয়েকটি রেখার কুঞ্চনে মুখে ফুটিয়ে তুলল মৌন প্রতিবাদ। ভঙ্গিটা তার উদ্ধত নয়—উদ্দীপ্ত। মৃদু—অথচ স্পষ্ট স্বরে বললে, ভুল কাজের নয় দাদু—সময়ের। নেতাজীও তা হলে ভুল করেছিলেন বলতে চান?

ভুল যারই হোক ভাই—রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত—

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায়—ভুলেরও দণ্ড নিতে হয়, বারে বারে যত রক্ত দিয়েছে ভারতবর্ষ তা প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড নয়। জন্মগত অধিকার ফিরে পাবার জন্যে বার বার এগিয়ে আসে মানুষ—প্রাণ দেয়, নির্য্যাতন সয়—তার জন্য দুঃখ কিসের!

দাদু বললেন, তোমাদের বিশ্বাস—

আপনিই একটু আগে বললেন না—একটি জিনিসে নির্ভরতা না থাকলে—মানুষের জীবনের অর্থও থাকে না? আমাদের বয়সে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আমরা মেতে উঠেছি এ কথার চেয়ে—নতুন পৃথিবীতে আমাদের সম্মান আর গৌরব যাতে সবাই স্বীকার করে নেয়—সেই মহৎ চেষ্টায় জীবনপাত হ'ল সবচেয়ে বড় সত্য। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা একটু ঠাঁই পেতে চাই—এ কি আমাদের অন্যায় ইচ্ছা? না রক্ত দিয়ে দু' এক বার প্রায়শ্চিত্ত করলেই এই ভুল শুধ্‌রে যাবে?

দাদু অবাক হয়ে মলয়ের জ্বলন্ত চোখ দুটির পানে চেয়ে রইলেন। তরুণ বয়স—সংসারের বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় পরেছে। মায়ের স্নেহ—প্রিয়ার ভালবাসা—জীবিকার সংস্থানে নির্বিঘ্ন সংসারে লেখাপড়া শিখে জগৎকে জেনেছে মোহমুক্ত বুদ্ধির দ্বারা—পরিণাম-অনভিজ্ঞ উচ্ছ্বাস-প্রবণ যুবক মাত্র নয়—একে পথের নির্দ্দেশ দেখার ছলে কি উপদেশ দেবেন তিনি? নির্দ্দেশ দিতে যাবার ধৃষ্টতাও তাঁর নেই। তীর্থে তীর্থে

সংসারমুক্ত বহু সন্ন্যাসীকে দেখেছেন দাদু—আর স্বাধীনতাকামী এদের কয়েকজনকেও দেখেছেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন-মুখী দুই জাতের সাধনাতে আশ্চর্য্য রকমের মিল তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল আজ। দুই সাধকই তো মৃত্যুকে ভয় করেন না—দুই যোগীই ধ্যাননিবদ্ধ দৃষ্টিতে দেবভূমির মহিমা নিরীক্ষণ করছেন। এক জন দেবতার জ্যোতিকে আর এক জন তাঁর মহিমাকে আয়ত্ত করতে চায়। এদের মধ্যে বড় ছোট কেউ নেই।

দাদু প্রসন্ন স্বরে বললেন, আমার ভুলটাই মেনে নিলাম ভাই—

মলয় হেসে বললে, ছি দাদু—বুড়ো হয়ে আপনি সত্যিই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। মনের আনন্দে পাক খেয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

১৩

বাড়িতে পা দিতেই হেমলতা একখানা পাঁজি এনে বললেন, এই মাসে কবে ভাল যাত্রার দিন আছে দেখ তো ?

যাত্রার দিন! কেউ বাপের বাড়ি যাবেন বুঝি ? মার হাত থেকে পাঁজিখানা নিয়ে—মলয় পাতা উল্টাতে লাগল।

হেমলতা বললেন, আমি তীর্থে যাব। আর তুমি আমাকে নিয়ে যাবে।

ওরে বাপরে—এরই মধ্যে আমার তীর্থে যাবার বয়স হয়েছে!

অতি দুঃখে হেমলতা হেসে ফেললেন।

আমাকে তীর্থে ঘুরিয়ে আনা তোমাদের উচিত নয় ? অথর্ব্ব হয়ে পড়লে ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় ?

মলয় বললে, মেজদাকে চিঠি লেখ—ওসব কাজ সে ভালই পারবে।

হেমলতা গম্ভীর হলেন। বললেন, বলতে গেলে এত বড় সংসারটা

তারই ঘাড়ে। সাহেবের আপিসে চাকরি—হুট্ বলতে কোথায় নিয়ে যাবে শুনি?

আমিও এবার সাহেবের আপিসে চাকরি নেব মা।

মা হাসলেন না—গম্ভীর স্বরে বললেন, তখন তোমাকে কোন কথা বলব না—এখন তো চল।

রহস্যচ্ছলে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া গেল না। মা তীর্থে যাবেনই। শুধু তীর্থ করার আকাঙ্ক্ষা থাকলে নিজেদের অসুবিধাগুলি বড় করে স্নেহাতুর মাকে সে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারত, কিন্তু পুণ্যসঞ্চয় এ ক্ষেত্রে উপলক্ষ মাত্র। নন্তু-দাদুর কাছে সন্ন্যাসী-ছেলের বার্ত্তা পেয়ে মার মন ছুটেছে সেই দূরতম দেশে। যে স্নেহ পুণ্য-সঙ্কল্পকে বার বার শ্লেটের লেখার মত মুছে দেয় সেই স্নেহই বাইরে যাবার জন্য টান দিয়েছে; মা শুনবেন না।

সুচিত্রা বললে, শুধু মা নয়, দিদিও কাপড় জামা গোছাচ্ছে।

মলয় বললে, তাহলে আমার সুটকেসটাও আজ রাত্তিরে গুছিয়ে দাও।

তবে যে বললে যাব না?

না গিয়ে উপায় আছে? তোমায় তো বলেছি—আলেয়ার পিছনে ছোটা আমার কর্ম্ম নয়। হাঁ করে ভাবছ কি—তীর্থে যাব না—কলকাতায় পালাব।

সুচিত্রা বললে, সব কথা হাল্কা মনে করে উড়িয়ে দাও কেন!—মার ব্যথাটা বোঝ না।

মলয় বললে, বুঝি বলেই ওঁকে তীর্থে নিয়ে যাব না। আশা ভঙ্গ হলে সব মানুষ কি সামলে উঠতে পারে? তখন বিদেশে আমি কি করব বল তো!

স্থচিত্রা বললে, সে কথা আমিও ভেবেছি। উপায় ভেবেছ কিছু ?

তারপর দু'জনে উপায় উদ্ভাবন করতে লেগে গেল। একের উপায় অন্যের যুক্তিতে কেটে যেতে লাগল। কোনটা বুদ্ধিগ্রাহ্য হ'ল না—কোনটা মনে হ'ল ছেলেমানুষি—কোনটা আঘাত দেওয়ার মত পরিত্যক্ত হ'ল।

অবশেষে মলয় বললে, আমার হঠাৎ যদি জ্বর হয় তো ভাল হয়।

স্থচিত্রা হেসে বললে, সেটা তো তোমার হাত নয়।

নিশ্চয় আমার হাত। মলয় সোৎসাহে বিছানায় উঠে বসল। জ্বর না হয়ে এমন কোন অসুখও তো হতে পারে যা অন্যের চোখে ধরা পড়ে না অথচ বিছানা ছেড়ে ওঠা নিষেধ। এমন কোন অসুখের নাম কর দিকি ?

স্থচিত্রা বললে, মাকে ঠকানো যেতে পারে কোন অসুখের দোহাই না দিয়েও—কিন্তু সেটা উচিত হবে কি ?

মলয় মাথা নেড়ে বললে, ঠিক বলেছ। একটু পরে বললে, আজকের রাতটাও বড় কম সময় নয়—

স্থচিত্রা বললে, তাহলে আজাদ-হিন্দ ফৌজের গল্প বল।

মলয় বললে, সে তো তুমি কাগজে পড়েছ।

স্থচিত্রা বললে, তবু বল।

মলয় বললে, কাবুল থেকে রাশিয়া দিয়ে বার্লিন গেলেন নেতাজী। সেখানে প্রথমে আজাদ-হিন্দ দল গড়লেন—সাড়ে তিন হাজারের বেশি লোক পাওয়া গেল না।—পাওয়া যাবে কোত্থেকে ? বেনগাজী—এল্-আলেমেন মানে লিবিয়া থেকে যুদ্ধ-বন্দী ভারতীয় যে ক'জনকে পাওয়া গেল—তারাই নাম লেখালে দলে। তারপর জাপানী সাবমেরিন করে নেতাজী এলেন সিঙ্গাপুরে। সেখানে জাপানের সঙ্গে সর্ত্ত করে নতুন করে গড়লেন আজাদী দল। হাজারে হাজারে এল মানুষ—লক্ষ লক্ষ উঠল টাকা।

অদ্ভুত জীবন, অদ্ভুত তার কর্ম্মপ্রণালী আর তেমনি বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র। ইংরেজের নজরবন্দী থেকে পলায়নকাহিনী কি কম বৈচিত্র্যবহুল! কোথায় কাবুল, কোথায় বার্লিন—সিঙ্গাপুর—টোকিও—সাইগন—রেঙ্গুন। তাঁরই আজাদী দল দুশো বছরের পরাধীন ভারতের মাটিতে নতুন করে বুনলে স্বাধীনতার বীজ। ইম্ফালের মৃত্তিকায় স্বাধীন বীরের দল নিয়ে এল সমুদ্রের জোয়ার—যার আঘাতে আজও কেঁপে উঠছে এর মাটি আর আকাশ। যে মানুষ চল্লিশ কোটি মানুষের বুকে জীবন এনে দেয়—তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করবে বিশ্বে এমন দুঃসাহসিক কে আছে!

গল্প শেষ হ'ল—নিস্তব্ধ রাত্রির প্রহরগুলি শূন্য পথে চলে যেতে যেতে সুচিত্রার জানালার ধারে নির্ব্বাক বিস্ময়ে খানিক উঁকি দিয়ে গেল। সময়ের স্রোতে তারা ভেসেই চলেছে। তারা ভেসে যেতে যেতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কোথাও—কোথাও অনুরাগলিপ্ত আরক্ত কপোলের মত সুকুমার—কোথাও বা বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ মেঘের গায়ে অগ্নি-তরবারির আঘাত করছে। কোন হৃদয়ে আনন্দ-উত্তেজনা—কারো কর্ম্মে প্রেরণা—কারো কল্পনায় মহত্ত্ব—কারো জ্ঞানের বর্ত্তিকায় একটি নতুন শিখা জ্বেলে দিতে দিতে চলেছে তারা। বর্ত্তমান বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অতীতকে এক অনাগত কালের সমুদ্রসমীপে।

প্রহর ঘোষণা করে শৃগাল ডেকে উঠল—গ্রামের প্রান্তে।

চমকে উঠে সুচিত্রা বললে, ঘুমোও।

মলয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, ঘুম আসছে না।

জ্বর নয়—এক অভাবিত ঘটনা মলয়কে তীর্থযাত্রার দায় থেকে উদ্ধার করলে।

সকাল থেকেই গোছগাছ আরম্ভ হয়েছে। যাই বললেই কিছু

যাওয়া সম্ভব নয়। সহস্রটা শিকড়ে বনস্পতি আঁকড়ে আছে সংসারের মাটি। তার থেকে গুটিয়ে গুছিয়ে নেওয়া দুই-এক দিনের ব্যাপার নয় তো! তবু হেমলতা অনেক কাজ তাড়াতাড়ি সারলেন। রান্না খাওয়ার উপদেশগুলি সংক্ষেপে দিলেন—কাঠ বা কয়লা কোন রীতিতে পোড়ালে অপচয় হয় না—ভাজা তরকারিগুলোয় হিসেব করে তেল দেবার প্রণালী কি—গরু দুটিকে ক'বার জাবনা আর ক'বার শুকনো বিচালী দিতে হয়—ছেলেদের সর্দ্দি কাসি ইত্যাদির ওপর নজর রেখে—গরম-ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে স্নান করানো—গৃহদেবতা নারায়ণের জলপানি কাচা তসর বা গরদ পরে দেওয়ার বিধান—কোনটাই বাদ গেল না। ভাঁড়ার গুছোতে পুরো একটি দিন যাবে। চাল ডাল মুগ কলাই গুড় চিনি ঘি ময়দা মশলা—এক মাসের মত আলাদা করে—আর ঢেকেঢুকে না গেলে খরচ বেশি হবে—ইঁদুরে পোকায় নষ্টও করবে। এসব ঝেড়ে ঢেকে রাখা—আন্দাজ মত নেওয়া—রোদে দেওয়া—সংসারের ক্ষতি ঠেকানো যে সে গৃহিণীতে পারে না। কথায় বলে না :

আট পিঠে দড়—
তো ঘোড়ার ওপর চড়।

সংসার হচ্ছে তেমনি বস্তু—চারিদিকে চোখ আর হুঁস রেখে চালাতে হয়। এই সব গোছানোর কাজ পুরো দমে চলছে।

বেলা দশটা আন্দাজ মলয় বাজারের দিক থেকে ফিরছিল। গাঁয়ের এক ছোকরা বললে, মলয়দা, আপনাকে একজন খুঁজছিলেন।

কে ?

মনে হ'ল বিদেশী। কুলির মাথায় মোট রয়েছে, সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও রয়েছেন দেখলাম। বললেন—বিদেশ থেকে আসছি।

কে এল কোথা থেকে? নিকট বা দূরের বন্ধু অনেকের নাম মনে এল—কিন্তু তাদের কেউ হঠাৎ খোঁজ করে এই গাঁয়েই বা আসবে কেন!

বাড়ি আসতেই সন্দেহ ভঞ্জন হ'ল। মনীশ—তার কলেজ-বন্ধু; তারপর কর্ম্মক্ষেত্রেও ওরা দু'জনে এক সঙ্গে নেমেছিল। যুদ্ধের মধ্যেই ওদের আলাপ-পরিচয়—আবার যুদ্ধের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি। এই যুদ্ধে ভারত সম্বন্ধে—ব্রিটিশের নীতি স্পষ্ট রূপ না নেওয়ায় কংগ্রেস যোগ দেয় নি। সুতরাং কংগ্রেস-সেবক হয়ে এদেরও যুদ্ধে যোগ দেবার যুক্তি ছিল না। একদিন মনীশ বললে, যুদ্ধ শেখা আমাদের দরকার।

মলয় বললে, কিন্তু কংগ্রেসের নির্দ্দেশ—

মনীশ হেসে বললে, আত্মানাং সততং রক্ষেৎ—এই নীতিই সবচেয়ে বড়। সে যুদ্ধে নাম লিখিয়ে রেঙ্গুন চলে গেল।

তারপর প্রাচ্যে সুরু হ'ল শ্বেতজাতির ভাগ্যবিপর্য্যয়। ভারতীয় সেনাদলও সেই বিপর্য্যয়ের মুখে পড়ল। কিন্তু তারা ভেসে গেল না। এক শক্তিশালী নেতা তাদের একত্রিত করলেন। এ যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ তাঁর কাছ থেকেই তারা জানলে—অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা হয়ে গেল। দিল্লীর লাল-কেল্লায় বিচারের সমারোহ করে—কারা প্রচার করলে এই গৌরব-কাহিনীকে এক গোলার্দ্ধ থেকে আর এক গোলার্দ্ধে!…এ সব কালেরই বিচিত্র রহস্যে ঘটল। যুদ্ধোত্তর জগতে এশিয়াখণ্ড জেগে উঠল—বিচিত্র ছলনাজাল—বহুশতাব্দী-সঞ্চিত জাড্যভার আর তাকে মোহগ্রস্ত করতে পারছে না। লাল-কেল্লায় বিচার প্রহসন শেষ হ'ল—বন্দীরা অধিকাংশই মুক্তি পেলেন—মনীশও মুক্তি পেয়ে ফিরে এল কলকাতায়। এসব মার্চ্চ মাসের কথা। তার পর মনীশ চলে যায়—পশ্চিম বঙ্গের কোন একটি জেলা-শহরে। ঝাঁসীর-রাণী দলের অনুকরণে মেয়েদের সামরিক শিক্ষা দেবার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন সেখানকার কংগ্রেসকর্ম্মীরা।

সেই বাহিনী গঠনের ভার নিলে মনীশ। কাজে উৎসাহ ছিল, উপার্জ্জন ছিল না। নাই থাকুক, মনীশ বেশ কিছুদিন রয়ে গেল সেখানে।

তারপর সেই জেলা-শহর থেকে মনীশ কেনই বা চলে এল—আর সঙ্গে নিয়ে এল একটি মেয়েকে—মলয় বুঝতে পারলে না।

সুচিত্রার ব্যবস্থায়—মেয়েটি অন্দর মহলে জায়গা পেয়েছে—মনীশ ইতিমধ্যেই হাতমুখ ধুয়ে এক কাপ চা নিয়ে বসেছে বাইরের ঘরে।

প্রথম পরিচয় সম্বর্দ্ধনা সংক্ষেপেই শেষ হ'ল। মনীশ বললে, আপাততঃ দুই এক সপ্তাহের জন্য আশ্রয় দিতে হবে।

কেন—এ গাঁয়েও কি ঝাঁসীর-রাণী ফৌজ তৈরী হবে?

দরকার হলে হবে বৈকি। আমার কথাটা শোন তবে।

এখন নয়—নাওয়া-ধোওয়া আহারাদি কর—

কিন্তু সব না শুনে তুমিও আমাকে আশ্রয় দিতে পারবে কি?

সেটা এমন কিছু গুরুতর কাজ নয়। যিনি আশ্রয় দেবার তিনি ত সব ব্যবস্থা করেছেন।

কিন্তু তিনি জানেন না—

না-ই বা জানলেন—

বাধা দিয়ে মনীশ বললে, যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে এখানে এসে থাকি—

গুরুতর অপরাধ করা তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়—যেহেতু তুমি লালকেল্লায় আটক ছিলে—

রাজনৈতিক অপরাধের কথা বলছি না—সামাজিক—

মলয় শব্দ করে হেসে উঠল।

মনীশ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে, যদি আমি মেয়েটিকে ইলোপ করে থাকি?

মলয় বললে, ইলোপমেণ্ট ? মেয়েটি কি সাবালিকা ?

আইনকে ভয় করছ ত ?

ভয় করছি একটা বিশ্রী ব্যাপার না ঘটে। তোমরা অতিথি—তোমাদের অসম্মান না হয় এটুকু দেখা অন্ততঃ আমার কর্ত্তব্য।

নিজের সামাজিক অসম্মানকে ভয় কর'না ?

মলয় জবাব না দিয়ে হাসলে। বললে, এক মিনিট—আমি আসছি।

নিজের মনে বিচার সুরু হ'ল, মনে হয় না এরা সামাজিক কোন অপরাধে অপরাধী।

দোতলায় উঠবার মুখে মা ডাকলেন, মলু—শুনে যা তো।

সে এলে বললেন, শুনলাম ছেলেটি তোমার বন্ধু। বউমার সঙ্গে মেয়েটি যখন ওপরে যায় মনে হল সে কাঁদছে। ওর শাশুড়ী কি ওকে খুব যন্ত্রণা দিত ?

মলয় বললে, জানি না তো ?

মায়ের অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্ত হ'ল না। বললেন, যাই হোক—ব্যাপারটা ভাল করে জান। একে আমার কপাল মন্দ—অশান্তির ওপর না অশান্তি জোটে!

মলয় বললে, আচ্ছা মা—বউটি শাশুড়ীর অত্যাচারে যদি পালিয়েই আসে—তুমি তাকে জায়গা দেবে না বাড়িতে ?

মা বললেন, জায়গা দেব না এমন কথা বলিনি তো—তবে অশান্তি খিটিমিটি এ সব আমি ভালবাসি না। আমার শোকা-তাপা শরীর—এত হাঙ্গামা পোয়াতে পারব না বাছা।

আচ্ছা, জেনে বলব তোমায়। মলয় যাবার উদ্যোগ করতেই তিনি বললেন, জিজ্ঞেস কর বউটির খাওয়া হয়েছে কিনা। আমাদের স্বজাতি তো ?

মলয় বললে, বন্ধুটিকে জানি ত স্বজাতি কিন্তু মেয়েটি—

মা বললেন, আর জ্বালাসনে বাপু! একটু চুপ করে থেকে বললেন, তা কথাটা মন্দই বা বলেছি কি! জাত নিয়ে তো তোদের ভারি মাথা ব্যথা! অজাতের ঘরে বিয়েথা কি হচ্ছে না? এই নিয়েই ত বাপে-ছেলেয়—মায়ে-বৌয়ে এত খেয়োখেয়ি।

মলয় নীরবে সেখান থেকে উঠে গেল। কয়েক বছর আগেকার কথা তার মনে পড়ল। ক্ষুণ্ণ-স্বার্থের অছিলাতেই—স্বাজাত্যাভিমান মার মনে কি প্রবল হয়ে ওঠে নি? সুচিত্রাকে মানিয়ে নিতে এ সংসারে বড় রকমের ঢেউ ওঠেনি কি!

সুচিত্রাকে একান্তে পেয়ে সে শুধোলে, ওদের কথা কিছু শুনেছ?

সুচিত্রা বললে, এমন কথা কিছু আছে নাকি?

মনীশ বলছিল কিনা যে আমাদের কথা শুনলে তোমরা হয়ত—

আশ্রয় দেব না। সুচিত্রা সাধারণভাবে কথাটা শেষ করে দিলে।

মলয় অবাক চোখে সুচিত্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে। খানিকক্ষণ পরে বললে, যদি ওরা সামাজিক কোন অন্যায় করে এখানে এসে থাকে—

সে বিচার পরেই করব না হয়।

না না, যদি—মলয় ইতস্ততঃ করলে।

মলয়কে আশ্বস্ত করে সুচিত্রা বলে উঠল, ইলোপমেণ্ট পর্য্যন্ত মেনে নেওয়া যেতে পারে—কি বল?

মলয় ওর হাত চেপে ধরলে, সুচিত্রা, তুমি তা হলে সব শুনেছ? আমি ঠাট্টা মনে—

চুপ। ওষ্ঠে তর্জ্জনী চেপে সে চোখের ইঙ্গিত করলে।

মেয়েটি ততক্ষণে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। মলয় ও সুচিত্রাকে একত্রে দেখেও ও থামলে না—অকুণ্ঠিত গতিতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলে। তার পর মলয়ের পায়ের কাছে হেঁট হতেই ও বিব্রতভাবে সরে যাবার চেষ্টা করলে।

মেয়েটি ততক্ষণে ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম শেষ করেছে।

সুচিত্রা মুখ টিপে হাসছিল। বললে, অন্যায় করলে ভাই।

মেয়েটি মুখ তুলে বললে, অন্যায় করলাম দাদা?

এ প্রশ্ন সরাসরি সে মলয়কেই করলে। এখন কুণ্ঠা প্রকাশ করলে ওকে অসম্মান করা হবে। কণ্ঠে ওর স্নিগ্ধ-করুণ সুর—প্রশ্নের ভঙ্গিতে সুবিচারের প্রত্যাশা। মলয় চোখ তুলে বললে, না—অন্যায় করনি।

দুটি মেয়ে পরস্পরের পানে চেয়ে ইঙ্গিতময় হাসি হাসলে।

মেয়েটি বললে, কোন অন্যায় করে আপনার বাড়িতে ঢুকবার সাহস হ'ত না দাদা। তবুও অনেক কথা বলবার আছে।

আচ্ছা—খাওয়া-দাওয়া হলে সবাই এক সঙ্গে বসে শুনব।

আহারাদি শেষে ওরা চারজনে মলয়ের শোবার ঘরে একত্রিত হ'ল। মলয় আপত্তি করলে, একটু বিশ্রাম কর।

মনীশ বললে, যথেষ্ট বিশ্রাম করেছি—এবার শোন। বউদি আপনাকেও বসতে হবে।

মেয়েটি উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে।

সুচিত্রা বললে, দরজা বন্ধ করার দরকার ছিল না। তোমরা রয়েছ, এ ঘরে কেউ আসবেন না।

মেয়েটি বললে, কেউ আমাদের কথা শুনলে কোন ক্ষতি হবে না—তবে ছেলেরা এসে গোল করতে পারে এই ভেবে—। সে অর্গল মুক্ত করবার জন্য এগিয়ে গেল।

সুচিত্রা বললে, থাক—। ঠাকুরপো, খুব সংক্ষেপে বলুন। উনি আবার ভাল বা মন্দ কোন কাজেরই ব্যাখ্যা শুনতে ভালবাসেন না।

মলয় বললে, আর তুমি ?

হেমলতা ডাকলেন—ছোট বৌমা, শোন।

উপর থেকে সন্তর্পণে নেমে এল মন্দাকিনী। বললে, ছোট বউকে এখন ডাকবেন না মা—ওরা চারজনে মিলে দুয়োরে খিল দিয়ে গল্প করছে।

কিসের গল্প ?

কি জানি, মেয়েটি কেন ওর স্বামীর সঙ্গে চলে এসেছে—সেই গল্পই হবে হয় ত!

হেমলতার মুখখানা চক্ চক্ করে উঠল।

মন্দাকিনী বললে, আপনার দোক্তা দেওয়া পান আর জল—

থাক বাছা—তুমি বরং নীচের ভাঁড়ার গুছিয়ে নাও—আমি একবার ছাদের বিছানাপত্তরগুলো রোদ্দুরে উল্টে দিয়ে আসি।

ছাদে যাবার পথে—সুচিত্রার ঘরের পাশে একবার উঁকি মারলেন। একটু এগিয়ে গেলেন—ওদের ঘরের দিকে। যে ফালি ঢাকা-বারান্দাটা ওদের ঘরের উত্তর কোণ ঘেঁসে—সিঁড়ির গোড়ায় মিশেছে—সেইখানে এসে দাঁড়ালেন। দেওয়ালের একটু ওপরে ঘুলঘুলির মত—কিংবা হাওয়া চলাচলের পথও বলা যায়—সেখান দিয়েই ঘরের ভেতরের কথাগুলি অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহে ভেসে আসছে। মনোযোগী শ্রোতার পক্ষে সে ধ্বনির অর্থ উদ্ধার করা কঠিন নয়।

সুতরাং হেমলতা ছাদে যাবার কথা ভুলে গেলেন।

সাধারণতঃ প্রণয়-কাহিনী যেমন হয়ে থাকে, মনীশ-অনিমার গল্পও

সেই ধরণের। সামাজিক বাধা প্রবল না হোক—অন্য বাধা ছিল। আই, এন, এ, সারা দেশকে দু'শো বছরের ভুলে-যাওয়া অপূর্ব্ব এক বস্তুর আস্বাদ দিয়েছে; অভাবিত জিনিস। এ জিনিস পেয়ে জাতি আত্ম-সম্মানে প্রতিষ্ঠালাভ করছে—আশা হচ্ছে, ভাবের বন্যা মিলিয়ে গেলেও বস্তুর কাঠিন্য লুপ্ত হবে না—হয়ত নতুন জগতের মাঝে—নতুন ভারত নতুন গৌরবে স্থান নেবে। নতুন মানুষরা—নতুন সমাজ আর বিধিবিধানের সঙ্গে অখণ্ড একটি সত্তাকে রূপ দেবেন। কিন্তু আপাততঃ বন্যার বেগ প্রবল। ঢেউ দেখে সবাই উল্লসিত। এ ঢেউ ফিরে গেলেও যে টান গভীরে আকর্ষণ করবে—তার পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন।

মনীশ আই, এন, এ-র গৌরব নিয়ে ফিরে এলেও—সামাজিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সে উপার্জ্জনশীল নয়। পুরাতন সমাজ—তাকে সম্বর্দ্ধনা করলেও—সংসার পরিচালনার দায়িত্ব সে নিতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সংশয়শীল। কাজেই অনিমার সঙ্গে তার মিলনটা জাতি-গোত্রের দিক দিয়ে না বাধলেও—এই দিক দিয়ে বাধল। ফলে এই ইলোপমেণ্ট। অনাত্মীয় নরনারীর সম্বন্ধ নিয়ে—মানুষের যেমন আলোচনার অন্ত নেই—তেমনি সমাজকে সে গড়েছে শুচিশীল করে। এ শুচিতার অর্থ নিছক পবিত্রতা নয়। যাই হোক এর অর্থ—মনীশ নিজের প্রবৃত্তির বেগে ভেসে গিয়ে সমাজগর্হিত এমন ধরণের কাজটা করতে পারে—আর এতে আই, এন, এ-র গৌরব ক্ষুণ্ণ হতে পারে—এটি তার কল্পনাতেই আসে নি। আধখানি মানুষ—আর আধখানি সামাজিক নিষ্ঠা—এমন উপকরণে সে সৃষ্ট নয়। এই ব্যাপারের মূলে যা রয়েছে—সেটি দৈব—আর তাকেই ইলোপমেণ্টের হেতু বলা সঙ্গত।

অনিমাও কম দুঃসাহসী নয়। আগের দিন রাত্রিতে ওরা

ঠিক করেছিল—দেশসেবাব্রতটিকে মুখ্য করে নিয়ে এই বিচ্ছেদ-বেদনা, অনায়াসে না হোক, কর্ত্তব্য ভেবেও গ্রহণ করবে তারা। মনীশ ক্ষেত্রান্তরে গিয়ে—গঠনমূলক কাজ করবে। অনিমা নেবে এখানকার ভার।

তখনও ভোর হয় নি। শুক্লপক্ষের প্রথম দিকের কোন একটি তিথি —শেষ রাত্রির অন্ধকার আকাশ আর গাছের মাথায় জড়িয়ে আছে, সপ্তর্ষি দিকপ্রান্তে হেলে পড়েছে—ধ্রুবতারার ঠিক নীচের দিকে। নিষুপ্ত গ্রাম। দু'মাইল গেলে তবে ষ্টেশন পাওয়া যায়। একলা মানুষ—প্রয়োজনীয় বস্তু গুছিয়ে নিতে সময় লাগল না—একটা ব্যাগের মধ্যে সবকিছু নিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে দিল ব্যাগটি—তার পর যাত্রা। নিজের পায়ের শব্দ নিষুপ্ত রাজপথে বেজে উঠল। খানিকদূর এসে মনে হ'ল নিজের পায়ের শব্দই। মনে হচ্ছে গম্ভীর রাত্রির বুকে তার মৃদু প্রতিধ্বনি—কখনও দূর থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে—কখনও দূর থেকে এগিয়ে আসছে কাছে। হাঁ—এগিয়েই আসছে—কাছে—আরও কাছে।

অনিমা বললে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

মনীশ বিস্মিত হ'ল—আনন্দিত হ'ল। মাথার ওপর একটা তারা সহসা খুব জলজল করে কেঁপে উঠল। ওদের মনের আনন্দ গ্রহের অন্তর স্পর্শ করেছে—তাই দ্যুতিময় হয়ে শিউরে উঠল সে। পুলক শিহরণ।

আত্মবিস্মৃত মুহূর্ত্তে মনীশ প্রশ্ন করল তবু, এর অর্থ—বোঝ ?

অনিমা মাথা নেড়ে স্বীকার করলে। এগিয়ে এসে ওর হাত ধরলে। বললে, চল।

তাই চলে এলাম। গল্প শেষ করে মনীশ হাসলে।

সুচিত্রা বললে, ঠাকুরপো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি রাগ করবেন না। লোকাচার রক্ষার দায়টা নিলে কি ভালবাসার অসম্মান হ'ত ?

মনীশ বললে, কোথায় পেলাম সে অবসর! ওতে আপত্তি নেই

আমার—না হলেও ক্ষোভ নেই। সমাজের চোখে সমান অপরাধীই থেকে যাব ত।

সুচিত্রা বললে, বিবেকে বাধবে না?

মনীশ বললে, বাধবে অনিমা?

অনিমা মুখ ফিরিয়ে নিলে। রাত্রিশেষের তারার আলোয় পথ চলতে চলতে সেই উত্তর কি দেয়নি সে?

মলয় বললে, যতই দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট নিয়ে এস ভাই—সামাজিক লাঞ্ছনা তোমাদের ঘুচবে না।

মনীশ ও অনিমা দু'জনেই মুখ তুলে চাইলে তার দিকে। মলয় বললে, আশা করি সব কিছু সহ্য করবার মনোবল নিয়েই তোমরা—

মনীশ বললে, না ভাই, দৈববশে আমরা মিলেছি—দৈবের হাতেই আমাদের দিয়েছি ছেড়ে। অনিমা ট্রেনে আসতে আসতে আমাকে বলছিল যে আকাশের সূর্য্য আর দীঘির পদ্ম যেমন মেলে—

অনিমা বললে, আপনারা সাহস করেন আমাদের আশ্রয় দিতে?

মলয় বললে, সুচিত্রা, উত্তর দাও।

সুচিত্রা বললে, সাহস করি। সেই সঙ্গে একটু নিবেদন আছে ভাই। যদি আমাদের লাঞ্ছনাও ঘটে—তোমরা নিজেদের দোষী মনে করবে না?

মনীশ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বললে, আপনার কথায় বড় আনন্দ পেলাম বউদি, সেই সঙ্গে আক্কেলও।

মানে?

মানে—এতক্ষণ আমাদের লাঞ্ছনার দিকটিই দেখছিলাম—অন্য দিকের কথা ভাবি নি। ঠিকই বলেছেন—অন্যের শান্তি নষ্ট করে নিজের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব না।

আমাদের আপনি আত্মীয় মনে করেন না ?

অনুযোগের উত্তরে মনীশ হাসলে। বললে, মলয়কে জানতাম—আপনার সঙ্গে আজ মাত্র পরিচয় হ'ল। তবু আপনাকে বহুদিনের চেনা বলে মনে হচ্ছে।

মলয় বললে, এই গ্রামেই তোমার প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন কর না ?

মনীশ বললে, কিছুদিন যাক। আইন মতে বিয়েটা চুকিয়ে ফেলে—তার পর,—ও কি ! চারজনেই চমকে উঠল।

ঘরের বাইরে গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হ'ল।

সুচিত্রা বাইরে এল—তার পিছনে মলয়। কোথাও কেউ নেই। ওরা সিঁড়ির ধারে এসে দেখল—বহু দিনের পুরনো যাঁতার একাংশ কোথা থেকে গড়িয়ে ঘরের দেওয়ালে কাত হয়ে পড়েছে। বাতাস নেই—ছেলেরাও বারান্দায় খেলা করছে না—অথচ—

সুচিত্রা বললে, ছাদে কেউ নেই ত ? দেখে আসি। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে সে উপরে উঠে গেল।

হেমলতা ভারি তোষকটা দু' হাতে উল্টে দেবার চেষ্টা করছেন দেখে সুচিত্রা তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে এল।

হেমলতা গম্ভীর মুখে বললেন, থাক—থাক—আমিই পারব'খন। তোষক উলটে দিয়ে তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

সুচিত্রা বললে, আমাদের কাউকে ডাকলেন না কেন মা ?

তোমাদের ডেকে আমার লাভ! গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন হেমলতা। এই অবেলায় তোষক কাচলে শুকোবে ?

তোষক কাচবেন কেন ?

এত কচি খুকী নও বউমা যে একথা বোঝ না! বলি এটা হিঁদুর বাড়ি—এটা মান তো ?

সুচিত্রা স্তম্ভিত হয়ে তাঁর পানে চেয়ে রইল। ক্রোধের আবেগে ঘৃণা প্রকাশটা সহজ হয়ে আসে। হেমলতা শেষ আঘাত হানলেন। আমি তো পা বাড়িয়েই আছি, কিন্তু তোমাদের আক্কেলটা কি? পরপুরুষের সঙ্গে যে মেয়ে বেরিয়ে আসে—তাকে তোমরা জায়গা দাও কোন্ সাহসে শুনি?

মলয় ছাদে আসতেই হেমলতা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, ওদের না তাড়ালে আমি দাঁতে কুটো ভাঙব না—আত্মহত্যে হব। তোমাদের এত বড় আস্পদ্দা যে—

মাকে প্রবোধ দেওয়া মলয়ের সাধ্যাতীত। মাথা নীচু করে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল।

বারান্দায় পৌঁছে মলয় বললে, ওদের বুঝিয়ে বলো সুচিত্রা,—আমি মুখ দেখাতে পারব না। সে নীচেয় নেমে গেল।

রাজ্যের লজ্জা মাথায় নিয়ে সুচিত্রা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। থমথমে কয়েকটি মুহূর্ত্তের মাথায় ভর দিয়ে বাতাস হ'ল নিশ্চল।

মনীশ বললে, বউদি, আপনাদের দুঃখের জন্য নিজেদের দায়ী করছি না। এইটেই যে আমরা আশা করেছিলাম। পুরনো সমাজ খোলসের মত জড়িয়ে আছে গায়ে। দেশের গৌরবের আলোয় তার অন্ধকার দূর হবেই—তবে সে দিন আজ নয়।

সুচিত্রা মুখ তুললে না। ওর দু' চোখের কোল সিক্ত হয়ে উঠল।

মনীশ বললে, আমরা কলকাতায় যাব। আজই। আপনার কাছে মাপ চেয়ে আপনার কষ্ট বাড়াব না—তবু একটা কিছু বলা দরকার কেবলই মনে হচ্ছে। আপনাদের কি যে বলব—! দারুণ অস্বস্তিতে ও দু' হাত বুকে চেপে ধরল।

সুচিত্রা ততক্ষণে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে। সহজ ভাবে বললে, বেশ ত, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

মনীশ বললে, যাবেন বই কি—নিশ্চয় যাবেন। আজ নয় বউদি, একটা আশ্রয় ঠিক করি আগে—

ওরা প্রণাম করলে সুচিত্রাকে। মনীশ হাত জোড় ক'রে—অনিমা হেঁট হ.য় পায়ে হাত দিয়ে। কাউকে ও নিষেধ করলে না। ক্ষমা চাওয়া—দোষ স্বীকার করা—দু'পক্ষের কাছে ভদ্রতার বাঁধাবুলি আওড়ানো এ সব থাকুক। মানুষ সহজ হলেও আচরণে সরল হতে পারে না। ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্যে নতি স্বীকারের ভঙ্গি সব সময়ে সুষ্ঠু কি? সংসারে স্বাভাবিক নিয়মে যা আসবে—প্রকৃতির বিপর্য্যয়ের মত, তাকেই অক্ষুব্ধ চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। তোমার চোখের জল আমার স্নায়ুকেন্দ্রে যদি আঘাত করেই—চোখের জল ফেলেই জানাব সমবেদনা। মুখের ভাষায় বাহুল্য প্রকাশ করে নিজেকে খাটো করব কেন!

সুচিত্রার কাছে বিদায় নিয়ে ওরা নীচেয় নেমে এল। এ বাড়িতে আর যেন প্রাণী নেই—আর কারও কাছে বিদায় নিতে গেলে আঘাত না নিয়ে ফিরতে পারবে না।

এমন কি মলয় কোথায় এ প্রসঙ্গমাত্র ওরা উত্থাপন করলে না।

বাইরের দরজার কাছে এসে অনিমা সহসা ফিরে দাঁড়াল। এগিয়ে এসে সুচিত্রার একখানি হাত পরম সমাদরে টেনে নিয়ে বললে, আপনি যাবেন ত দিদি? আমরা চিঠি দেব কিন্তু।

চোখের কোলে অবাধ্য অশ্রুকে আর সামলে রাখা গেল না—সুচিত্রা অশ্রু গোপনের প্রয়াস না করে ধরা গলায় বললে, যাব।

এই সংসারের মত ভারতের রঙ্গমঞ্চেও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পালা সুরু হয়েছে। ঠিক স্বাধীনতা নয়—তবে ভারত যাতে সেই পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে লক্ষ্যে পৌছতে পারে তার জন্য বিলাতের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রী-মিশন পাঠিয়েছেন। তাঁরা একটা কিছু দেবেনই—এই প্রতিজ্ঞা করে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছেন। বিভিন্ন দলকে নিয়ে তাঁদের বৈঠক বসল দিল্লীতে—সকাল বিকাল আর সন্ধ্যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক—তা তাঁরা অল্প নামজাদা বা অধিক খ্যাতিসম্পন্ন—নরম, গরম কিংবা মধ্যপন্থী যাই হোন না কেন—সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের সব দলের মাথা-ধরা গুলিকেও—মহারাজা কিংবা তপশীলী নেতা, সবাইকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। লোকে ভাবল ধৈর্য্য বটে এঁদের। সব দলকে এক করে—আলাদা আলাদা তাদের মত নিয়ে সুবিধা-অসুবিধা বুঝে যে শাসনতন্ত্রের খসড়া ছকে দিয়ে যাবেন—সর্ব্ব-জাতি-ধর্ম্ম ও মত সমন্বয়ে না জানি সে কি অপূর্ব্ব বস্তুই দাঁড়াবে! বিভিন্ন দলের মত-স্বাতন্ত্র্যে বৈঠক টলমল করে উঠল। দিল্লীর গরমে তিষ্ঠুতে না পেরে মন্ত্রীরা গেলেন সিমলায়, সেখানকার ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মতবিরোধ মিটল না। স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী শাসনতন্ত্র নিয়ে বাধল গোলমাল। অবশেষে তিনটি গ্রূপে ভাগ করা হ'ল ভারতবর্ষকে—পঞ্জাবের সঙ্গে সীমান্ত আর বেলুচিস্থানের লেজুড় জুড়ে দেওয়া হ'ল—আসামের কাঁধে চাপানো হ'ল বাংলাকে। মন্ত্রী-মিশন ঘোষণা করলেন—পাকিস্তানের দাবি অযৌক্তিক। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠরা যাতে সংখ্যালঘুদের নস্যাৎ করতে না পারে তার জন্য যথোচিত রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রইল। কোন কোন রাজনীতিবিদ বললেন—বাহ্যতঃ পাকিস্তানকে অস্বীকার করে—কার্য্যতঃ গ্রূপের মধ্য দিয়ে তাকে স্বীকার

করেই নেয়া হ'ল। ল্যাজা মুড়োয় পাকিস্তানী প্রলেপ লাগিয়ে ধড়টাকে ঢাকের বাদ্যে মোহিত করে দেবার ব্যবস্থা—এ কথাও বললেন কেউ কেউ। স্বল্পমেয়াদী স্বত্ব বাতিল করলে কংগ্রেস—লীগ দুটোই মেনে নিলে। কিন্তু মন্ত্রীদের জিদ কংগ্রেসকে এর মধ্যে ঢোকাতেই হবে। পনেরই মে-র ঘোষণার ভাষ্য—টীকা ইত্যাদি সুরু হ'ল। কিন্তু ইংরেজী ভাষাটাই এমন যে রবারের মত যতই টেনে নেয়া যায়—বিভিন্ন অর্থসম্পদে ততই ওটি প্রসারিত হতে থাকে। প্রদেশসমূহকে এক জোয়ালে জুতলেও—আলাদা হয়ে যাবার ক্ষমতা ওদের থাকবে। তা ছাড়া অনিচ্ছুক কোন প্রদেশের ঘাড়ে বাধ্যতামূলক বিধান চাপানো চলবে না। ইচ্ছে করলে প্রদেশসমূহ গ্রুপিং-এর বাইরে চলে যেতে পারে।…কংগ্রেসের মীটিং চলছে ক'দিন ধরে। কি-হয় কি-হয়—এই উত্তেজনাতে বঙ্গদেশের দূর প্রান্তের এক অখ্যাত গ্রামেও তর্ক-আলোচনা চলছে।

কেউ বলছেন, উনিশ শো বিয়াল্লিশের ক্রীপস্ সায়েব সঙ্গে থাকলেও—এবার হেস্তনেস্ত একটা করবেনই এঁরা। এ, ভি, আলেকজাণ্ডার জাঁদরেল লোক—তাঁর সঙ্গে আছেন ভারত-সচিব প্যাথিক লরেন্স। প্যাথিক লরেন্সকে দেখলেই মনে হয়—লোকটি এ দেশেরই একজন—হাসিমুখ—গায়ের রংটাও উগ্র রকমের শাদা নয়, হতে পারে ওটা ফটোগ্রাফির খুঁৎ—কিন্তু ওঁর মুখের হাসিটি যে নিখুঁৎ। ওটি সমবেদনা-জাতীয় হাসি। যাই হোক—ভারতবর্ষ যে পরিবর্ত্তনের মুখে এ বিষয়ে সংশয় নেই।

মলয় ভাবছিল, আজ বাড়ি ফেরা অসম্ভব। মায়ের রোষ কোন্ পথ ধরবে সে জানে না—তবু সে না থাকলে তা হয়ত তেমন উগ্র না-ও হতে পারে। নন্তু-দাদুর ওখানেই রাতটা কাটিয়ে দেয়া যাক না।

বটতলায় খুব হৈ-চৈ হচ্ছে। কোন সভা বসেছে—না সভার

প্রস্তুতি? জয় হিন্দ্—বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শোনা গেল—সেই সঙ্গে বাছা বাছা স্লোগান।

হঠাৎ কি হ'ল যে ওরা এমন করে আনন্দ প্রকাশ করছে?

কাছে আসতে-না-আসতেই একটি ছেলে লাফিয়ে দল থেকে বেরিয়ে এল, মার দিস্ কেল্লা! মলয়দা—কংগ্রেস 'লং-টার্ম অ্যাক্সেপ্ট করেছে। এই মাত্র টেলিগ্রাম এল।

মলয় ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। তারপর চলল জল্পনা-কল্পনা তর্ক উচ্ছ্বাস। ভিড়ের মধ্য থেকে যখন বেরিয়ে এল সে—তখন ভারতের ভাগ্যবিপর্যায়ের চিন্তায় বাড়ির অপ্রীতি নিঃশেষে মুছে গেছে।

সন্ধ্যার পর সে বাড়িতেই ফিরে এল।

নিস্তব্ধ বাড়ি—নিষ্প্রদীপ। কংগ্রেস মন্ত্রী-মিশন-প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পর ভারতের বৃহৎ অংশ যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে—তেমনি মনে হ'ল বাড়িটাকে। মনীশরা গেল কোথায়? সবাই ঘুমিয়েছে কি?

সুচিত্রার ঘরে আলো নেই—ঘরে মানুষও নেই—এমনি নিস্তব্ধতা।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ও ঘরের মাঝখান পর্য্যন্ত এসে ডাকলে, ঘুমুলে কি? চিত্রা—

শাড়ির খস্ খস্ শব্দ হ'ল—কে যেন বিছানার ওপর উঠে বসল। দেশলাই খোলার শব্দ—ফ্যাস করে কাঠি ঘষার শব্দ—আলো জ্বলে উঠল। শিয়রের কাছে একটা টুলের ওপর মোমবাতি ছিল—সেটা জ্বেলে দিয়ে সুচিত্রা বিছানা থেকে মেঝেয় এসে দাঁড়াল।

অদ্ভুত আলো—এই মোমবাতির। কোমল আধ-আলো আধ-ছায়ায় রহস্যময়। সুচিত্রার ঘুম-ভাঙা চোখে সে আলো পড়ে ওকে গম্ভীর আর বিষণ্ণ বোধ হচ্ছে। মুখখানাও ওর ফুলো-ফুলো—অকাল-নিদ্রাভঙ্গজনিত কিনা কে জানে।

মনীশ কোথায় ?

সুচিত্রা অদ্ভুত চোখে মলয়ের পানে চাইলে। মনীশ কোথায় সে কথাটা তার চেয়ে মলয়ই ভাল জানে না ? কার পরিচয়ে মনীশ এ বাড়িতে এসেছিলেন ?

ও—চলে গেছে বুঝি ?

অনেকক্ষণ—তুমি যাবার সঙ্গে সঙ্গেই।

মোমবাতিটা কখনও ম্লান—কখনও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই সুচিত্রাকে। আলোর ম্লান শিখায় কাঁপছে অসম্মান। গভীর অস্বস্তিতে স্তব্ধ হয়ে আছে জানালার বাইরের আকাশ—পৃথিবী তমোবসনাবৃতা।

ওকি, সুচিত্রার চোখের কোল চক্‌চক্ করছে না ? দু' গাল বেয়ে দুটি ধারা নামছে ? মোমবাতির কাঁপুনি সুচিত্রার ঠোঁটের কাঁপুনির সঙ্গে মিশে গেল এই মুহূর্ত্তে। মলয় এগিয়ে এল সুচিত্রার দিকে।

সে রাত্রি অন্ধকারেই গভীর হ'ল। বাতাস ভারি নিঃশ্বাসের মত—আর থেকে থেকে পেঁচার ডাকটা বুকচাপা কান্নার মত। পৃথিবী সমবেদনা জানাচ্ছে।

মনীশরা চলে গেছে—ঝড় থামে নি। প্রথম বিয়ে হয়ে সুচিত্রা যেদিন এ বাড়িতে আসে সেদিনকার চাপা অসন্তোষ আজ মনে পড়ছে। মানুষের মন থেকে কিছুই কি মুছে যায় না ? কতকগুলি প্রবল বৃত্তির প্রতিযোগিতা চলছে মনের মধ্যে। কোনটা সুযোগ পেয়ে কোনটিকে হটিয়ে দেয়—কোনটা বা স্পর্শভীরু। নিঃশেষে লুপ্ত হয় না কোনটিই। মানুষী-প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ বুঝি পূর্ণ হতে পারবে না কোন মুহূর্ত্তে ? যে মানদণ্ডের চারপাশে এই বৃত্তিগুলি পাক খাচ্ছে, তাকে নিজ[illegible]—কি না স্বার্থ বলাই সঙ্গত। এরই মাঝে টানছে সে মানুষকে—পৃথিবীকে

—নব বিধানকে। যাই হোক—এ বাড়ি আজ মুখ ফিরিয়েছে সুচিত্রার দিক থেকে। এক পক্ষে ত ভালই হ'ল। নিত্য অসম্মানের দায় থেকে সে অন্ততঃ বাঁচল। নিত্য অসম্মানের দায় নয় তো কি? সুচিত্রার তো মনে পড়ে না হেমলতা তার হাতের নিরামিষ রান্না খেয়েছেন কোন দিন! রান্নাঘরেই তার অধিকার সাব্যস্ত হয় নি। মন্দাকিনী বলে—তোমরা ছেলেমানুষ—এখন সেজেগুজে হাসি-আহ্লাদ করে কাটাবে—হাতাবেড়ি-খুন্তি ঠন্ ঠন্ এসব কি মানায় ভাই! কথাগুলি স্নেহ-কোমল কিন্তু ওখান থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা তার মধ্যে নেই কি? ছোঁওয়া বা খাওয়াটাই জাত-বিচারের কষ্টিপাথর এ কথাটা আজ স্পষ্ট করেই বলেন নি কি হেমলতা? ওরা এ বাড়িতে থাকলে আমি জলস্পর্শ করব না।

অভিমানে বার বার চোখের কোল ভিজে উঠছে।

আজ কারও খাওয়া হয় নি। ছেলেগুলোকে মুড়ি মিষ্টি, ও বেলার ভাত রুটি যা অবশিষ্ট ছিল তাই খাইয়ে ঘুম পাড়ান হয়েছিল। সুচিত্রাকে খাবার জন্য অনুরোধ করেছিল মন্দাকিনী—ও উত্তর দেয় নি। এই ঘটনার পর এ বাড়িতে থাকা কিংবা এ বাড়ির অন্ন মুখে তোলা ওর পক্ষে অসম্ভব নয় কি?

ভোরবেলা মন্দাকিনী হেমলতার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলে,—মা—মা—শুনছেন?

হেমলতা জেগেই ছিলেন। খুব ভোরবেলাতেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেলেও বিছানা ছেড়ে তিনি ওঠেন না। ঘরের বাইরে থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—অনুচ্চ স্বরময় উচ্চারণে ঠাকুর-দেবতার স্তব পাঠ করেন—পঞ্চকন্যাদের স্মরণ করে মহাপাতক ক্ষয় করেন—আর যে দিন আসছে তাকে স্বাগত জানিয়ে তেত্রিশ কোটির কাছে সংসারের কল্যাণ

কামনা করেন। আজও জেগেছিলেন—তবে মন ভাল ছিল না বলে বিছানায় বসে ফিস ফিস করে ঠাকুরদেবতাকে স্মরণ করছিলেন।

কে—মেজ বউমা—?

হাঁ মা—একবার শুনুন ত।

ওর কণ্ঠস্বরে ভয়ের আভাস পেয়ে হেমলতা ধড়মড় করে উঠে দুয়োর খুলে বারান্দায় বেরুলেন।

কি মেজ বউমা—ভয় পেয়েছ নাকি?

না মা—ছোট বউ আর ঠাকুরপোকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

সে কি কথা—ওদের ঘরে ঘুমুচ্ছে না ওরা?

ঘরের দুয়োর খোলা খাঁ খাঁ করছে।

বাইরের দরজাটা দেখেছ কি?

না মা, একলা যেতে ভয়-ভয় করছে বলে আপনাকে ডাকছিলাম।

আচ্ছা চল দেখে আসি।

হ্যারিকেনের দম বাড়িয়ে হেমলতা সদর দরজা পরীক্ষা করতে চললেন।

সদর দরজায় টানা খিলটি ছাড়া আর একটি ছোট ঘুরনো খিল আছে—যেটা বাইরে থেকেও দেওয়া যায়। সেইটাই দেওয়া রয়েছে।

হেমলতা ফিরে এসে বললেন, কাল সন্ধ্যেবেলায় সদরের খিলটা বুঝি দেয় নি কেউ?

ওমা—সে কি কথা! অন্ধকারে ঠাকুরপো যখন আসে তখন ত আমি জেগে। খিল দেওয়ার শব্দ স্পষ্ট শুনেছি।

ভাল করে উটকে দেখ ত বাইরের ঘর, ছাদ, বড়বোয়ের ঘর—

উপর নীচে আলো হাতে করে হেমলতা নিজেই খোঁজাখুঁজি সুরু করলেন। এক-একটি জায়গা খালি দেখেন আর তাঁর বুক ঠেলে

ঠেলে কান্না আসে। শেষে তিনি চীৎকার করে ডাকলেন, মলয়—মলয়, ছোটবউমা—ওরে মলু রে—

পূব দিক ফরসা হতে স্থরু হয়েছে, আমগাছে বসে দোয়েল শিস্ দিয়ে প্রভাতকে স্বাগত জানাচ্ছে।

মলয়ের ঘরের মেঝের ওপর বসে পড়ে পরিশ্রান্ত হেমলতা আর্ত্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, ওরা চলে গেছে মেজ বউমা—ওরা আর আসবে না।

১৫

এগিয়ে গেলে ফেরা যায় না। নদীর স্রোত সামনে চলে—দিন চলে যায় সামনে—আর সব ঘটনার গতিও সোজা। মানুষের বয়স—শৈশব থেকে কৈশোর—কৈশোর পেরিয়ে যৌবন—তার পর বার্দ্ধক্য—সেও সময়ের স্রোতে সামনে চলছে ভেসে। পরিবর্ত্তন আসে দেহে—পরিবর্ত্তিত হয় মন। উনিশ-শো বিয়াল্লিশ আর উনিশ-শো ছ'চল্লিশ এক নয়। সেদিনকার ক্রীপ্‌স দৌত্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন—ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। স-চার্চ্চিল টোরিগোষ্ঠী আজ ক্ষমতার শিখর থেকে নেমে পড়েছেন—শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট সেখানে সমাসীন। আজও ক্রীপ্‌স এসেছেন দৌত্য নিয়ে—তবু উনিশ-শো বিয়াল্লিশের পটভূমিকায়—কতকগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষমতা প্রদানের সর্ত্ত নিয়ে যিনি এসেছিলেন—সে ব্যক্তির সঙ্গে এ ব্যক্তির অনেকখানি তফাৎ। 'ভারত ছাড়' এই শ্লোগানের অন্তর্নিহিত শক্তি উনিশ-শো বিয়াল্লিশে গণ-অভ্যুত্থানে আগষ্ট বিপ্লবের মধ্যে সার্থকতার পথ খুঁজেছিল। নেতাহীন সে বিপ্লব বন্দুকের গুলিতে বায়ুযান-বাহিত মেসিনগানের

মৃত্যুবীজ বর্ষণে গ্রাম ধ্বংসের লীলায়—পাইকারী জরিমানার আবর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল। ঝড় উঠলে সমুদ্রের রুদ্র ঢেউ কূলে এসে সগর্জ্জনে আছড়ে পড়ে—আবার ফিরে যায় সমুদ্রের গর্ভে। ফিরে যায় বলেই কি সে লুপ্ত হয়ে যায়? তবু—এই পরিবেশে যুদ্ধোত্তর শোণিত-ক্ষরিত অবসন্ন পৃথিবীতে স্বস্তিবাচনের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। যাদের মুঠি আল্‌গা হয়ে পড়েছে—তাদের থেকে যা কিছু পার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও—যুদ্ধক্ষত হৃতসর্ব্বস্ব রাষ্ট্রগুলির দিকে। যারা পরাধীন তাদের শোনাও শান্তির ললিত বাণী। যুদ্ধ ভাল নয়—যুদ্ধ রাষ্ট্রকে করে ধ্বংস, মানুষকে করে নীতিহীন—শক্তিহীন। বিশ্বমৈত্রীর বাণী নিয়েই এসেছেন মন্ত্রী-মিশন—এশিয়ার পুণ্য-ক্ষেত্রে মানব-মহিমার জয়গান ঘোষিত হচ্ছে। আজিকার পটভূমিকায় যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে নিজ নিজ নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে নিলে পরমাণু-শক্তি তোমাকে ক্ষমা করবে না। কালের স্রোত সামনে বয়ে চলেছে। ফ্যাসিবাদের অবসানে—ডিমক্রেসির কাঁধে কাঁধ মেলাতে এত দ্বিধা, এত সন্দেহ কেন! সুপারিশ না হলে যেমন চাকরি মেলে না—তেম্‌নি মুখ ফেরালে মিলবে না স্বাধীনতা। পিছনে তাকিও না—হাত বাড়িও না—সামনে যা পাচ্ছ তাই নাও দু'হাত ভরে। অঞ্জলি কিংবা মুঠিতে ভরে—বিনা রক্তপাতে—বিনা বিপ্লবে—আরাম কেদারায় শুয়ে চুরুট টানতে টানতে যদি পেয়ে যাও এ জিনিস—পৃথিবীর ইতিহাসে—সে কি অভিনব বলে সোনার অক্ষরে ক্ষোদা থাকবে না?

এই পর্য্যন্ত লিখে প্রশান্ত থামলে। এ লেখা মিটিঙে পড়া চলবে না। রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে। তাই ব'লে হৃদয়-গলার সততা নিয়ে গদ্‌গদ্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চলবে না। এত দর কষাকষির পিছনে বণিক-মনোবৃত্তির খেলা—কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি? নতুন

পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ ভিত্তি দৃঢ় করতে চাইছে—চতুঃস্বাধীনতাকে আপাততঃ ভাষায় কীর্ত্তন করতে ক্ষতি কি।

বাইরে গোলমাল হচ্ছে—কারা যেন আস্ফালন করছে। কলকাতা শহরটাই কোলাহলে ভরা।

দুপ্‌দাপ করে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। চারু, অতীন আরও অনেকে আসছে বুঝি? লেখাটা তাড়াতাড়ি জামার পকেটে পুরলো।

ওরা বারান্দায় এল—ঘরে ঢুকল না।

বিস্মিত প্রশান্ত প্রশ্ন করলে, কে?

বাইরে আসুন। বাইরে আসুন। চার-পাঁচটি কণ্ঠস্বর একসঙ্গে ধ্বনিত হ'ল।

এদের কাউকে প্রশান্ত চেনে না। তবে এরা যে শুভার সুহৃদ-গোত্রীয় নয়—এটা বুঝা গেল এদের উত্তেজিত হাবভাবে। এরা চায় কি?

আপনার নাম কি? আপনি মেয়েটির কে হন? এক সঙ্গে চার-পাঁচটি স্বর।

প্রশান্ত বললে, একে একে জিজ্ঞাসা করুন। কিন্তু আপনারা কে আগে তাই বলুন।

আমাদের পরিচয় পেলে খুব খুসি হবে না যাদু! আর পরিচয় দিলেও চিনতে পারবে না।

ভদ্রলোকের পাড়ায় বসে খুব মজা মারছ তো? ভাবছ আইন বাঁচিয়ে চালাকি করে ফুর্ত্তি করছি যখন কার কি বলবার আছে!

প্রশান্ত অনুমানে বুঝলে—ওরা শুভাদের প্রতি প্রসন্ন নয়।

কথাগুলিও ওদের ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়েছে। মনে ঘৃণা জাগল—

ক্রোধ হ'ল—কিন্তু এসব প্রকাশের ক্ষেত্র এখানে নয় ভেবে সে দৃঢ়স্বরে বললে, পরের বাড়ি চড়াও হবার ক্ষমতা কে দিলে আপনাদের ?

যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়ল। সবাই একসঙ্গে কোলাহল করে উঠলে, ইস্—আবার রোয়াব দেখ ! এ্যাইসা রদ্দা লাগাব গালপাট্টা খসিয়ে দেব। পাড়ার মধ্যে বেলেল্লাগিরি—এটা কি সোনাগাছি পেয়েছ যাদু

নিরুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে লাগল প্রশান্ত—কোন উত্তর দিলে না।

ওরই মধ্যে বয়সে প্রবীণ গোছের একজন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বললে, মিত্তির মশাই আপনাকে ডাকছেন, আসুন।

প্রশান্ত বললে, কিন্তু এ ভাবে অভদ্র গালাগালি করছেন কেন এঁরা ?

সবাই হুম্‌কি দিয়ে উঠতেই প্রবীণ লোকটি হাত উঠিয়ে একটা ধমক দিলে, এই—চুপ চুপ। একটি কথা কয়েছ কি—যাও, নেমে যাও সিঁড়ি দিয়ে—যাও বলছি।

জলের স্রোতের মত হুড় হুড় করে সবাই নেমে গেল। নেমে তারা সঙ্কীর্ণ উঠোনে দাঁড়িয়ে কোলাহল করতে লাগল।

প্রবীণ লোকটি বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

প্রশান্ত বললে, আপনার মিত্তির মশাইকে আমি জানি না—

জানেন না ! অত্যন্ত বিস্ময়ে সে মিনিটখানেক চোখ কপালে তুলে রইল—তারপর একটু হেসে বললে, এ পাড়ার বলতে গেলে উনিই মাথা। পুলিসে কাজ করতেন—এক একটা জেলা চরিয়ে এসেছেন। ওঁর প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেয়েছে। এখনই না হয় রিটায়ার করেছেন—তবু পুলিস কমিশনার···

প্রশান্ত অধৈর্য্যকণ্ঠে বললে, কিন্তু আমি ওঁকে চিনি না—উনিও আমায় চেনেন না···

বিলক্ষণ! তোমরা ওঁকে না চিনতে পার—কিন্তু ওঁর চোখ এড়িয়ে কাক-পক্ষীতে কিছু করতে পারে না—তা মানুষ তো মানুষ! এস—এস।

প্রশান্তর ত্বরা দেখা গেল না। ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলে সে। বললে, আমার বোধ হয় আপনি ভুল করছেন। এ বাড়ি আমি ভাড়া নিই নি—ওঁর প্রতিবেশীও নই আমি।. আমাকে উনি ডাকতেই পারেন না।

এই কথায় লোকটির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে উঠল সে, বটে—ইয়ারকি পেয়েছ! বাড়ি যদি তোমার নয় তো কি সুবাদে এখানে আস বলতে পার বাপু? মজা লুটতে বুঝি?

ওঁর চীৎকারে নীচের লোকগুলি কলরব করে উঠল, কি হ'ল মেজদা—আমরা যাব কি?

মেজদা গলা বাড়িয়ে বললে, না। প্রশান্তর পানে ফিরে বললে, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না জানি। তার ব্যবস্থাও করা আছে। বলি যাবে কি যাবে না?

প্রশান্ত কোন উত্তর দিলে না।

মেজদা গলা বাড়িয়ে বললেন, ওহে কালীপদ—রায় সায়েবকে বল যে বাবু যাবেন না। তিনি যেন এর ব্যবস্থা করেন। আর শোন—পুলিস না আসা পর্য্যন্ত তোমরা পাহারা দাও—কিছু যেন সরাতে না পারে।

প্রশান্ত বিদ্যুদ্বেগে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললে, বাড়ি সার্চ্চ করাবেন মানে?

মানে—রায় সায়েবের পেছন দিকেও দুটো চোখ আছে। তাঁর নাকের ওপর বসে তোমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করবার মতলব আঁটবে—সেটি বড় সোজা কথা নয়। ওঁর নিজের একটা দায়িত্ব নেই?

প্রশান্ত বললে, আমি যদি ওঁর সঙ্গে দেখা করি তা হলেও বাড়ি সার্চ্চ হবে?

লোকটি আড়চোখে প্রশান্তর পানে চেয়ে মনে মনে হাসলে। হাঁ, ঠিক জায়গাতেই পড়েছে আঘাতটা। সে অত্যন্ত উদাসীনভাবে বললে, বাড়ি সার্চ্চ করা না-করা রায় সাহেবের ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা না হয় যেও না।

এ বাড়ির মালিক না আসা পর্য্যন্ত আমি কোথাও যেতে পারি না—আপনি সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট নিয়েই আসবেন।

লোকটি এই কথায় দমে গেল—কিন্তু মুখে বললে, আচ্ছা যাদু—কুঁদের মুখে বাঁক কতক্ষণ সোজা না হয় দেখা যাক।

ওঘরের জানালাটায় টক্ টক্ করে শব্দ হতেই লোকটি বললে, গ্যাট হয়ে বসে থেক না যাদু—মেয়েরা ডাকছে তোমাকে।

প্রশান্ত উঠে গেল। শুভার মা উদ্বেগে আকুল হয়ে উঠেছেন—ওকে দেখেই কেঁদে ফেললেন, তাই ত বাবা—কি হবে?

ভয় নেই, কিছুই হবে না। প্রশান্ত ওঁকে আশ্বাস দিলে।

না বাবা—তুমি এঁদের জান না। আমাদের অবস্থা খারাপ হওয়া ইস্তক ওঁরা কম গণ্ডগোল করছেন না। এখন তো বাড়িতে ঢিল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, তবু।

বলেন কি—এরা আপনাদের প্রতিবেশী!

শুভার মা বললেন, প্রতিবেশীদের মত বন্ধুও নেই—শত্রুও নেই।

ও মশাই—বলি জমে গেলেন নাকি? মেজদার কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল।

শুনছ তো বাবা—আমাদের পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই বলে—ওরা যা খুসি তাই অপমান করে। শহরের লোকগুলো—

প্রশান্ত বললে, দোষ শহরের লোক বলে নয়, এক শ্রেণীর লোক আছে যারা এই ধরণের।

শুভার গলা শোনা গেল,—কি চান আপনারা? কাকে চান? বিনা অনুমতিতে বাড়ি ঢুকেছেন, আইন জানেন না?

ভিড় মনে হ'ল—উঠোন থেকে পথের দিকে সরে গেল। সেই সঙ্গে শাসানিও কানে এল। আচ্ছা—আইন আমরাও জানি। দেখাচ্ছি—দাঁড়াও।

শুভা গলির প্রান্ত থেকে তীক্ষ্ণ গলায় বললে, চলুন তো আপনাদের রায় সায়েবের কাছে—

প্রশান্ত বারান্দায় এসে দেখলে—মেজদা নেই—উঠোনেও কেউ নেই। সত্যিই কি শুভা রায় সায়েবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেল? এতগুলি লোকের বিরুদ্ধে ও একা যুঝবে কি করে? যাদের ভদ্রতার বালাই নেই—তাদের কাছ থেকে ও কি-ই বা প্রত্যাশা করতে পারে! একটা বিশ্রী রকমের ব্যাপার না ঘটে।

ও তাড়াতাড়ি নেমে বাড়ির বাইরে এল।

বাইরের জনতা অভদ্র ভাবে চেঁচিয়ে উঠল—মাণিকজোড় দেগেছিস—মাইরি!

শুভা ঘাড় ফিরিয়ে বললে, তুমি আবার কেন এলে প্রশান্ত?

রায় সায়েবকে দেখতে। মৃদু হেসে সে উত্তর দিলে।

ভাল করলে না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে শুভা হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল।

১৬

বৈঠকখানা দেখে মনে হয়—রায় সায়েব দু'হাতে উপার্জ্জন করেছেন। যে লাইনে চাকরি করতেন,—সে লাইনের সততাকে সাধারণে ভুলেও সত্য বলে মনে করে না, অথচ সাধারণের চাটুবাদে তাঁর বৈঠকখানা দিনরাত যে মুখরিত থাকে—ক্ষমতার শিখর থেকে নেমে এলেও আজ সে প্রমাণের অভাব হবে না। খেতাব আর চাকরি—দুইই পার্থিব নিরাপত্তার মস্ত বড় সহায়, এ কথাটা সাধারণে বোঝে। তারা আরও বোঝে—মরা হাতি লাখ টাকা এ প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা রায় সায়েবের পদমর্য্যাদায় নিহিত। ওঁর একটি কথা—গুরুত্বে বহুদূরপ্রসারী।

খাটো চৌকির ওপর ঢালা ফরাস পাতা আসর। কয়েকটা তাকিয়া এদিকে ওদিকে গড়াচ্ছে—নক্সা-কাটা হুঁকোদানে একটা হুঁকো—আর একটা হুঁকো ফিরছে লোকের হাতে হাতে। গড়গড়ার নলটা কখনও রায় সায়েবের হাতে, কখনও বা তাকিয়ার ওপর—পানের ডাবরে এক ডাবর সাজা পান আর বড় অ্যাশ-ট্রেটা ফরাসের মাঝখানে চুরুটের ছাইয়ে প্রায় ভর্ত্তি হয়ে গেছে। কাপ ডিস জমতে পায় না ফরাসের ওপর। সময় মত বেয়ারা ট্রেতে করে কাপ সাজিয়ে নিয়ে আসে—আর চা খাওয়া হয়ে গেলে কাপ ডিস গুছিয়ে নিয়ে যায়।

সবচেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে ঘরের দেওয়াল। কিন্তু নানান সাইজের ছবির বাহুল্যে, দেওয়ালটা যেন অলঙ্কারভারগ্রস্তা সেকেলে গৃহিণীর মত। রায় সায়েবের কর্ম্মজীবনের গৌরব আর ইতিহাস বহন করছে ছবিগুলি। এগুলি দেখলে মনে হবে—মহাবোধি হলের জাতক-কাহিনী। আজ মেদভারবহুল, ভিটামিন-ক্যালসিয়ম পুষ্ট যে

দেহখানি তাকিয়া আশ্রয় করে মজলিসের মধ্যমণি-স্বরূপ ঘরের শোভাবর্দ্ধন করছে—ছবিগুলি তার পূর্ব্ব জন্মের কাহিনীর মতই লাগে। রাজা-রাণীর ছবির নীচেয় লেখা 'গড সেভ দি কিং'। আর সম্প্রতি পশ্চিমের দেওয়ালে একখানি ছবি যুক্ত হয়েছে—ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-ত্রাণ-কারী চার্চ্চিলের। শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের চাপে টোরীগোষ্ঠীসহ তিনি নেপথ্যে অবস্থিত হলেও—রায় সায়েব আশা করেন, সঙ্কট মুহূর্ত্তে আবার তাঁকে মঞ্চাবতরণ করতেই হবে। সব দেশেই এমন একজন জবরদস্ত লোক সঙ্কট মুহূর্ত্তের পরিত্রাতা হয়ে দেখা দেয়—বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ আর কি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ক্ষমতা হারিয়েও ইনি এখনও বেঁচে আছেন।

বৈঠকখানায় আগেই বহু লোক জমা হয়েছিল। শুভা আসতে—পিছনেও রীতিমত ভিড় জমল।

শুভা স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, আপনিই হরিপদ মিত্র—? নমস্কার।

নমস্কার নয়—মনে হ'ল যুক্ত কর বিচ্ছিন্ন হয়ে সজোরে রায় সায়েবের দুটি গালে পড়ল। ঘরের মধ্যে অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

শুভার কণ্ঠস্বর দেওয়াল থেকে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হ'ল। সে বললে, শুনি আপনি লোকের অন্যায়কে শাসন করেন, পাপীকে শাস্তি দেন। জানতে পারি কি—কোন সাহসে পাড়ার লোকে—কোন ক্ষতি বা অপরাধ না করা সত্ত্বেও—আমাদের ওপর অত্যাচার করেন? একলা মেয়েছেলের ওপর জুলুম করতে তাঁদের বাধে না—কি লজ্জা হয় না?

দেওয়াল-ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে শব্দ করতে লাগল শুধু—রায় সায়েব পর্য্যন্ত বাক্যহীন বিস্ময়ে শুভার পানে চেয়ে রইলেন।

শুভা একজন যুবকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললে, ঐ লোকটি কাল আমায় অভদ্র ইসারা করেছে—আমার বাড়ির সামনে যখন-তখন

শিস্ দেওয়া কি সিনেমার গান গাওয়া এটাও বোধ হয় ভয়ানক ভদ্রতার অঙ্গ!

রায় সায়েব এতক্ষণে জ্বলে উঠলেন। তাঁর মনে হ'ল মেয়েটি ধৃষ্ট—অসহ্য রকমের প্রগল্‌ভা। কথাগুলি তাঁকেই উদ্দেশ করে বলছে—আর তাঁরই ভদ্রতা নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করছে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, যারা নির্দ্দোষী কেউ তাদের কোন কথা বলতে সাহস করে না। পাড়ার এত লোক রয়েছে—ভাড়াটে, স্থায়ী বাসিন্দা—কেউ ত তোমার মত তেড়ে এসে নালিশ করে নি আমার কাছে?

তাঁদের বাড়িতে পুরুষ অভিভাবক আছেন তাই তাঁদের আসবার দরকার হয় নি।

না—তা নয়। পুরুষ অভিভাবক তোমারও কম নেই—কিন্তু সম্ভ্রম-মর্য্যাদা বোধ তাঁদের আছে।

কি বললেন? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুভা প্রশ্ন করলে।

যা বলেছি—সবাই শুনেছেন। গম্ভীর স্বরে বললেন রায় সায়েব। কথা হচ্ছে কি জান—তোমরা কম্যুনিষ্ট নয়?

শুভা গ্রীবা উন্নত করে বললে, তাতে কি?

রায় সায়েব বললেন, কম্যুনিষ্টরা সমাজ মানে না, ধর্ম্ম মানে না, ঈশ্বর মানে না—

শুভা বললে, যে ঈশ্বর মানুষের অর্থ সঞ্চয়ের নেশাকে বাড়ান—যে ধর্ম্ম একজন মানুষকে দশজন মানুষের মাথায় তোলে—সে সমাজ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু আমাদের মাথাব্যথা আছে। এই সমাজের মধ্যে বসে তুমি যা খুসি তাই করতে পার না। রায় সায়েব বিচার নিষ্পত্তির ভঙ্গিতে গড়গড়ার নলটি হাতে তুলে নিলেন।

কিন্তু আমাদের সাধারণ নাগরিকত্বে বাধা দেবার কোন অধিকার আপনার নেই।

তাই নাকি! ব্যঙ্গভরে রায় সায়েব একটু হাসলেন। সৎ নাগরিক হও—নিজের মর্য্যাদা নিজে রাখতে শেখ—সে তো ভালই। কিন্তু যেখানে পাঁচজন সৎ নাগরিক বাস করেন—সেখানে ব্রথেল রাখবার আইন নেই···

শুভা চীৎকার করে কি বলতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে প্রশান্ত এল এগিয়ে। বললে, কথা কাটাকাটি শক্তি পরীক্ষার পথ নয়। এখানে আর দাঁড়িও না।

রায় সায়েব বললেন, তুমি কে হে? ওর আত্মীয়?

মেজদা বললে ভিড়ের ভেতর থেকে, হাঁ—পরমাত্মীয়। যাকে বলে—হরিহর আত্মা!

একটা হাসির ঢেউ ঘরের মধ্য থেকে বাইরে গড়িয়ে এল।

রায় সায়েব বললেন, সামাজিক অনাচার বাদ দিলেও রাজনৈতিক অপরাধ তোমাদের গুরুতর। বাড়ি সার্চ্চ হলেই বোঝা যাবে।

আমাদের অপমান করা···

তোমাদের আবার অপমান! পথের ঘেয়ো কুকুরকে লাঠি পেটা না করলে নিজের বিপদ—জান ত!

আবার একটা হাসির ঢেউ সজোরে আছড়ে পড়ল।

•

সত্যিই বাড়িটা সার্চ্চ হ'ল। আপত্তিকর পুস্তিকা দুই একখানা পাওয়া গেল—প্রশান্তর পকেট থেকে বেরুল একটু আগে লেখা কাগজখানা। সেটা মারাত্মক প্রমাণ না হলেও প্রমাণ ত বটে। তা ছাড়া সম্পূর্ণ অনাত্মীয় যুবক অভিভাবকহীন মেয়েদের সঙ্গে বাস করলে সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্নামের ভাগী হতে হবেই।

রায় সায়েবের পাশের বাড়িতে থাকেন সুনীতি কর—কংগ্রেসের মাথাধরা লোক। যদিও তাঁর সঙ্গে রায় সায়েবের আদা-কাঁচকলাজাতীয় সম্বন্ধ—তবু সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য তাঁকেও আহ্বান করা হল।

আহূত হয়ে তিনি জানালেন, কংগ্রেসের সঙ্গে ও পার্টির বহুদিন সম্বন্ধচ্ছেদ হয়েছে। উনিশ-শো বিয়াল্লিশে গণ-যুদ্ধের নামে সরকারকে সাহায্য করেছিল ওরা। আগষ্ট বিপ্লবকে পর্য্যন্ত ওরা ফ্যাসি-ষড়যন্ত্র বলতে দ্বিধা বোধ করে নি। কংগ্রেসকে ধ্বংস করবার জন্য সরকারের হাতে হাত মিলিয়েছিল যারা—তারা কি কারণে সুয়োরাণীর পদ থেকে সরে এল তিনি বলতে পারেন না। কংগ্রেসের কোন গুপ্তনীতি নেই বলেই রাজনীতির চাতুরী বুঝতে তিনি অক্ষম।

শুভা উত্তর দিলে, তা হলে রাজনীতি না করাই ওঁর পক্ষে মঙ্গলজনক।

রায় সায়েব বললেন, দেশে এত যে ধর্ম্মঘটের প্রসার—এর মূলে এরা।

শুভা বললে, হাঁ—দুভিক্ষে যেমন লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে কুকুর শেয়ালের মত পথে পথে মরে পড়ে ছিল অথচ আঙুলটি তোলে নি, আজও তাই হলে ভাল হয়। যুদ্ধের আগেকার বাজার ফিরিয়ে আনুন না রায় সায়েব?

ফিরিয়ে আনবার মালিক যেন আমরাই!

তবে কম খেয়ে একটু কম চর্ব্বি জমান দেহে—তাতেও গুটি কয়েক লোক বাঁচবে। একটি ছোকরা ভিড়ের মধ্য থেকে মন্তব্য করলে। হাসির উচ্চরব উঠল।

কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠল রায় সায়েবের। পুলিস অফিসারের পানে চেয়ে বললেন, আপনার কাজ করুন—এদের—

পুলিস অফিসার রায় সায়েবকে একান্তে ডেকে চুপি চুপি বললেন,

এত অল্প প্রমাণে ওদের অ্যারেষ্ট করা যাবে না। তা ছাড়া—আরও—ফিস ফিস করে তিনি কি সব বললেন।

রায় সায়েব বিষণ্ণ স্বরে বললেন, যা খুসি করুন। তবে—ভদ্রলোকের পাড়া এটা—সবাই যাতে মান-সম্মান নিয়ে বাস করতে পারে···

অবশ্য—অবশ্য, এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে'।

ওদের সতর্ক করে—শাসিয়ে ছেড়ে দিলেন তিনি।

এই ঘটনায় আর কিছু না হোক—এদের চারিদিকে বাইরের পৃথিবীটার স্বরূপ বুঝতে পারা গেল। প্রশান্ত নিজ চিত্তের দৃঢ়তার সন্ধান পেলে। কোথা থেকে ও শক্তি পেলে অপরিমিত—লাঞ্ছনা অপমান অগ্রাহ্য করে শুভার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে? দ্বিধা-সন্দেহে দুলছিল মন—অকস্মাৎ উৎপীড়নের আগুনে খাদ নিষ্কাশিত হয়ে খাঁটি সোনার জ্যোতি প্রকাশিত হ'ল। দুর্ব্বলের পক্ষ নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যৌবনের ধর্ম্ম বলেই প্রশান্ত নবীন উৎসাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল বুঝি?

ভিড় পাতলা হয়ে গেলে প্রশান্ত দেখলে শুভার থেকে সে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। শুভার কয়েকজন বন্ধু এসেছিল, তাদের বৃন্তলীন হয়ে ও তর্ক করতে করতে এগিয়ে চলেছে। বাড়ির দিকে না গিয়ে ওরা ভিন্ন পথ ধরলে। প্রশান্ত ওদের অনুসরণ করবে কি?

একটি ছোকরা তার কাছে এসে বললে, সুনীতি বাবু—আপনাকে ডাকছেন—ঐ যে—।

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুনীতি কর। ওদিকে চাইতেই তিনি হাত উঠিয়ে ডাকলেন তাকে। প্রশান্ত সেই দিকে গেল।

প্রশান্তকে দেখে তিনি বললেন, আমার সঙ্গে একটু আসবেন? মানে আমার বাড়িতে।

প্রশান্তর ইতস্ততঃভাব দেখে তিনি হেসে বললেন, ভয় নেই আপনার —আমরা রায়সায়েব-জাতীয় জীব নই—পুলিসের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কও রাখি না।

প্রশান্ত বললে, পুলিসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই বা ভয় করব—এ আপনি ভাবছেন কেন?

না—তাও ভাবি না। আপনাকে ওদের মাঝখানে কেমন মিস্‌ফিটেড মনে হতেই ডাকলাম।

প্রশান্ত অল্প একটু হেসে বললে, চলুন, কোথায় যাবেন।

বাইরের ঘরে প্রশান্তকে বসিয়ে স্থনীতি কর আর সকলকে বাইরে যেতে বললেন। সকলে বাইরে গেলে বললেন, চা খাবেন?

প্রশান্ত বললে, না—থাক এখন। ঘরের চারিদিকে সে কৌতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। তিন-রঙা পতাকা—মহাত্মা গান্ধী, জহরলালের ছবি—বন্দে মাতরম্ গানের চার লাইন তুলোর অক্ষরে কাঁচের ফ্রেমে আটকানো—একটা চরকা—একরাশ তূলো—খানিকটা কাটা স্থতো জড়ানো রয়েছে লাটাইয়ে—আর তকলি গোটা কতক পড়ে রয়েছে এলো-মেলো ভাবে। মোট কথা ঘরটাই এলোমেলো—বিশৃঙ্খল।

স্থনীতি কর বললেন, আপনি কত দিন হ'ল যোগ দিয়েছেন ওদের পার্টিতে? মাপ করবেন।

প্রশান্ত বললে, এ অত্যন্ত সোজা কথা—জবাবও এর সোজা। খুব অল্পদিন হ'ল—

তার কথা শেষ না হতেই স্থনীতি কর সোৎসাহে মাথা নেড়ে বললেন, আমি তা অন্থমান করেছি।

প্রশান্ত বললে, পার্টিতে যোগ দিয়েছি বললে ভুল বলা হবে—ওঁদের কাজ আমার ভাল লাগে—

সুনীতি কর বললেন, আপনাদের মত দেশভক্ত যুবকদের দেশের কাজ ভাল ত লাগবেই। কিন্তু কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে—

প্রশান্ত হেসে বললে, তাতে আর ক্ষতি কি—ওঁরাও ত ক্যাপিটালিজ্‌মের শত্রু।

সুনীতি কর হাসলেন। জানালার ধারে উঠে গিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে চেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে কংগ্রেসই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার শক্তিকে শাসকরা স্বীকার করেন।

প্রশান্ত বললে, তাই বা কেমন করে বলি! মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে তা হলে ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট গঠিত হ'ত।

সুনীতি কর বললেন, কিন্তু এ কথাও ত এ্যাটিলি ঘোষণা করেছেন—মেজরিটির অগ্রগতি মাইনরিটি বন্ধ করতে পারবে না।

প্রশান্ত বললে, তা হলে—কংগ্রেস যখন ১৫ই মে'র ভাষ্য মেনে নিলে—তখন লীগকে এর মধ্যে পুরে দেবার চেষ্টা হল কেন?

সুনীতি কর বললেন, এই চেষ্টার মধ্যে আমরা দেখছি ব্রিটিশ ডিপ্লম্যাসি। গান্ধীজী বলেন—ওদের আন্তরিক ইচ্ছাকে বিকৃত করে ধরা সত্যাগ্রহীর নীতিতে বাধে।

আপনি কি মনে করেন?

সুনীতি কর বললেন, ব্যক্তিগত মনে করা-করির কোন মূল্য নেই—আমাদের চেষ্টা যাতে সফল হয়—সমবেতভাবে সেই চেষ্টা করাই হ'ল ঠিক পথ। একটু থেমে বললেন, তুমি বুদ্ধিমান্—একথা নিশ্চয় বুঝেছ—গান্ধীজী আশাবাদী। রাজনীতির ক্ষেত্রে আশাবাদ হ'ল সব চেয়ে দামী কথা।

সুবিধাবাদ বলতে পারেন। প্রশান্ত হাসল।

যাই হোক—এখন কথা হচ্ছে ক্ষমতা যা হাতে পাচ্ছি তা আদায়

করে নিয়ে আরও ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করা উচিত। নয় কি? আর তা করতে হলে—একটি শক্তিশালী দল গড়া উচিত—সব শক্তিকে এক জায়গায় এনে—অর্থাৎ সহযোগিতার দ্বারা ক্ষমতা লাভ···

প্রশান্ত বললে, তা হলে কোন দলকে বাদ দিলে চলবে না। মাইনরিটি বলে কাউকে অগ্রাহ্য করে সর্ব্বভারতীয় শাসন-পরিষদ গড়া যাবে না।

কংগ্রেস ত আপোষের জন্য বহুদূর এগিয়েছে।

বাজারদর কষাকষিকে এগুলো বলা ঠিক নয়।

সুনীতি কর বিচলিত কণ্ঠে বললেন, তা হলে—পাকিস্তান কায়েম করে লোক ভারতবর্ষে এটিই চাইব আমরা? দ্বিতীয় অলষ্টার কি প্যালেষ্টাইন গড়ে ওদের সুযোগ দেব অছিগিরির?

প্রশান্ত বললে, মিশরও কত দিন আগে এই শাসন-সংস্কার মেনে নিয়েছিল—কিন্তু বৃটিশ সৈন্য অপসারণের কথা উঠলে জাতির নাবালকত্ব নিয়ে আজও তর্কবিতর্ক হয়। মাপ করবেন কর-মশায়—যাঁরা আমাদের সৎ ছেলে দেখে ভাল চরিত্রের সার্টিফিকেট দেবেন—কিংবা সাবালক বলে ঘোষণা করবেন—তাঁরা যে জীবন-মরণের স্বার্থে জড়িয়ে আছেন এর মধ্যে। আমরা সুবোধ হলেও—তাঁদের নির্ব্বুদ্ধিতা কোনদিন প্রকাশ পাবে না।

সুনীতি কর বললেন, তা হলে বলছ নানান দলে নানান মতে ভাগ হয়ে থাকব আমরা? আমরা যুদ্ধ করব কিন্তু একতার নীতি মানব না? বলব স্বাধীনতা চাই—অথচ রকম রকম শাসনতন্ত্র রচনা করব? হঠাৎ তিনি বললেন, কংগ্রেসকে শক্তিমান্ বলে স্বীকার কর কিনা?

করি।

তা যদি কর—হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রশান্তর সামনে এসে ওর

একখানা হাত চেপে ধরলেন, তা হলে কংগ্রেসে যোগ দিতে তোমার আপত্তি কি ?

প্রশান্ত কোন কথা বললে না। খানিক নীরবে ওঁর মুখের পানে চেয়ে হাতখানি তার মুক্ত করে নিলে। বললে, আমাকে মেম্বার করে নেবার জন্য আপনার এই চেষ্টাকে স্নেহ বলেই মানছি—কিন্তু…

এর মধ্যে কিন্তু নেই। তুমি মাত্র অল্পদিন হ'ল এ পাড়ায় যাতায়াত করছ—দুর্নামকে ভয় করতে বলছি না—কিন্তু অসত্যকে ঘৃণা করবে না কেন ? সব বাঁধন কাটা মানেই স্বৈরাচার নয় এ যেমন স্বীকার কর, তেমনি বাঁধন না কেটেও কলুষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যায় এটাও মান তো ?

প্রশান্ত কিছুই না বুঝে ওঁর পানে চেয়ে রইল। এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি ?

সুনীতি কর বললেন, ওই মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। রায় সায়েবের মত নীতিবাগীশ আমি নই—তবু ওদের সমর্থন করতে পারি নি।

মানুষের রটনা সব সময়ে সত্য হয় না।

সুনীতি কর বললেন, প্রমাণ দেওয়াটা আমার পক্ষে শক্ত নয়, তবে সম্মানজনক নয় বলেই তা দেব না। ওদের বাড়ির দুখানা বাড়ি পরে—শৈলেশ্বর বোস থাকেন—তাঁর ছেলে মন্টু—নিজের কথায় অসঙ্গতি বুঝতে পেরে তিনি সহসা চুপ করলেন।

প্রশান্ত উৎসুক হ'ল যথেষ্ট। শুভা সম্বন্ধে—নিজেই সে নিঃসংশয় পীড়া অনুভব করে কেন ? একান্ত করে পাওয়ার মধ্যেই কি ঈর্ষ্যাবাদ লুকানো থাকে ? পুরুষের সম্পত্তি নারী—এই পৌরুষবোধের উগ্রতায় তার যুক্তি হয়েছে আবিল। নারীচিত্ত জয়ের সাধনা আর কিছুই নয়—ধন সঞ্চয়ের নেশার মতই এক আদিম প্রবৃত্তি।

চেয়ার ছেড়ে উঠতেই তিনি বললেন, কিছু মনে করলে না তো ভাই?

প্রশান্ত মুগ্ধ চোখে তাঁর পানে চেয়ে মাথা নাড়লে। এই মিষ্ট সম্বোধনের পর মনে করা চলে না কিছু। ইচ্ছে হ'ল পা ছুঁয়ে একটি প্রণাম জানিয়ে আসে। লজ্জায় সঙ্কোচে তাও পারলে না।

১৭

অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিল প্রশান্ত। মনের মধ্যে বিচার চলছে—কোন্‌টা শ্রেয়? উনিশ-শো বিয়াল্লিশের আগষ্টে বোম্বাইয়ে 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব পাশ হবার পরমুহূর্তে জেলের ফটক খুলে গিয়েছিল—আন্দোলন চালাবার মত বাইরে ছিলেন না কেউ। গেল বার এমনি সময়ে জার্ম্মেনী ভেঙ্গে পড়েছিল—জাপানের বুক লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ তুলেছিল শক্তিশেল। তার পর আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষা হ'ল হিরোসিমার অর্দ্ধেক ধ্বংস করে—আর কয়েক লক্ষ প্রাণ আহুতি নিয়ে। তার পর নাগাসাকিতে হানা দিল মৃত্যুদূত; জাপান নতজানু হ'ল। জগৎ থেকে ফ্যাসিবাদ নিঃশেষিত হ'ল। জার্ম্মেনী হ'ল চার টুকরো—জাপান গেল আমেরিকার উদরে। বিশ্বশক্তি-পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হ'ল মার্কিন। কংগ্রেস তখন কারা-প্রাচীরের বাইরে। দেশের মধ্যে তার শক্তি ও প্রভাব বেড়েই চলেছে দিন দিন। নির্ব্বাচন-যুদ্ধে কংগ্রেস হ'ল জয়ী। তার পর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ম্মি (আই, এন, এ) দিল্লীর লাল কেল্লায় বিচার হ'ল যার নায়কদের। লোকচক্ষুর সামনে থেকে উঠে গেল রহস্যের যবনিকা—দীপ্ত তেজে প্রকাশিত হলেন দেশ-বন্দিত নেতা সুভাষ বসু। দু'শো বছরের ভুলে-যাওয়া-সুর ফিরে

এল কণ্ঠে—অবরুদ্ধ কণ্ঠ ফিরে পেল ভাষা—ধ্যানের দেবতা মূর্তিতে উঠলেন জেগে।

কংগ্রেস ঘোষণা করলে: আমরা স্বাধীনতার দ্বারদেশে। সাম্রাজ্যবাদ এখনও তৈরি হচ্ছে শেষ আঘাত দেবার জন্য। শেষ আঘাতই সেটা, কারণ এর নাভিশ্বাস হয়েছে। সকলে এক হয়ে ঠেকাও সে আঘাত, ধ্বংস হোক দানবটা।

দানবের মায়া, সে বড় ভয়ঙ্কর। রাজনীতিতে সততাব স্থান কতটুকু সে বিচার ইতিহাস করেছে বার বার। নৈরাশ্যবাদ রাজনীতির অঙ্গ নয়। আজকের ত্যাগ, আগামী কালের পাওয়ার সঙ্গে, লাভ-ক্ষতির জের টানছে। সে হিসাব-নিকাশের জের, এক পাতা থেকে আর এক পাতায়, এক যুগ থেকে আর এক যুগে, টেনে চলেছে সবাই। তার সাক্ষ্য-প্রমাণও আছে ইতিহাসে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, পথ বেছে নিতে ভুল করলে সে অতলে যাবে তলিয়ে। বিশ্ব-বিপ্লবের ভূমিকায় আজ যাঁরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ ক'রে নতুন বিশ্ব রচনার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের সামান্যতম ভুলও ক্ষমা করবে না মহাকাল। এক হাতে খর্পর আর এক হাতে বরাভয় শান্তির আশ্বাস জানাচ্ছে। কিন্তু এ বরাভয় বিশ্ব-পালিনীর মাতৃপাণি-প্রসূত নয়, এ বজ্র নিক্ষেপের ভয় দেখিয়ে শান্তি রক্ষার প্রয়াসমাত্র। চতুর রাজনীতিবিদ্ এই শুভ মুহূর্তেই যথাসম্ভব ক্ষমতা বাড়িয়ে নিচ্ছেন: নিরাপত্তার নামে সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলে গেঁথে ফেলছেন—স্বামীহীন ভূমি-ও সমুদ্র-স্বত্ব।

ভাবতে ভাবতে চলেছিল প্রশান্ত। মাথার উপর কখন ঘনিয়ে এসেছে মেঘ, ও টের পায় নি। বর্ষাকালের আকাশ, বিনা সতর্কতায় বর্ষণ ওর রীতি। হঠাৎ বৃষ্টি চেপে এল। পথের ধারে বড় মত একটা

গাড়ী-বারান্দার নীচেয় ছুটতে ছুটতে আশ্রয় নিলে—মানুষ আর পশু। বায়ুবেগে বৃষ্টির ছাট যতই অগ্রসর হচ্ছে, মানুষ আর পশুতে ততই জমাট বাঁধছে।

কি দাদা, রেলোয়ে ষ্ট্রাইকটা আর হ'ল না ?

না—সাড়ে চার টাকা ইণ্টারিম রিলিফ দেবে, এ্যাডজুডিকেশনে কতক বিষয় যাবে। পয়লা জানুয়ারী থেকে মাইনে বাড়বে।

তবে আর কি, সাড়ে চার টাকায় সব দুঃখ হরিপাল যাবে !

আমাদের ষ্ট্রাইকের ঠেলাটা বুঝবে। এ আর রেলোয়ে ইউনিয়ন নয়, রীতিমত হাংরি ব্যাচ পরিয়ে ষ্ট্রাইক নোটিশ দেয়া হয়েছে।

ট্রাম কোম্পানী কি বলে ?

সে দিন য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে আমাদের মীটিং হবে—কলেজ স্কোয়ারে দু'দলে দেখা। খুব ইনকিলাব জিন্দাবাদ করা গেল। ওরা বললে, দাবি ছেড় না ভাই, হুমকি চালাও। লাখ লাখ টাকা কামিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে কোম্পানী, ইয়ারকি আর কি !

হবে কি, রক্তারক্তি কাণ্ড।

এমনিতেই না খেতে পেয়ে মরচি, না হয়—

শুনেছ দাদা, মুসলিম লীগ মন্ত্রী-মিশনের খসড়া বাতিল করে দিলে ?

কাগজে বেরিয়েছে ?

দেখো আমার কথা যদি সত্যি না হয়—

দূস্—তোরা সব ক্ষুদে সত্যপীর কিনা! বাতিল করাই উচিত। এ, বি, সি গ্রুপ করে ভারতবর্ষকে টুকরো করে ফেলতে পারলেই তো—আরও দুশো বছর রে দাদা।

একটা পাওয়ারফুল সেণ্টার—

দূস্—পাওয়ারফুল ! পলিটিক্স্এ আমরা তো নাবালক রে দাদা।

ওদের ভাষা বুঝতে পারবি? বলে এক একটা আইনের ভাষ্য বুঝতেই বড় বড় মাথা সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে। দশ-বারো দিন ধরে মীটিং করে তবে রেজলুশ্যন পাশ করছে। আমাদের মত গোলা লোকেরা কি করবে শুনি?

বাইরে যাবার উপায় নেই—খোলা গাড়ী বারান্দার নীচেয় সাধারণের রাজনীতির বিতর্ক জমে উঠল। বেশিক্ষণ চলল না রাজনীতি। মাছ, আনাজপাতি, সরষের তেল, আপিসের মাইনে, এইসব স্তরে নেমে এল বাদানুবাদ। প্রশান্ত স্বীকার করলে, এই স্তরেই আলোচনা বাস্তব রূপ পেয়েছে। স্বাধীনতার অর্থ সাধারণে বোঝে এই মাপকাঠির সাহায্যে। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশগুলিতে প্রাণ ধারণের সমস্যা এমন তীব্র হয়ে উঠেছে কি? হাজার হাজার লোককে বেকার বানাবার আয়োজন চলেছে। তারা বলছে, এ কি সর্ব্বনাশ! এ জগতে আমাদের টিঁকে থাকবার অধিকার দাও। তোমাদের জন্য আমরা সর্ব্বস্ব দিয়েছি—আর তোমরা—

বিক্ষোভ এই কারণেই প্রবল হয়েছে।

জীবন বাঁচাবার কোন্ পথ? পেটে না খেয়ে বিপ্লব আনা সম্ভব কি? মানি—বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিলাম, লাঠি চার্জ্জকে উপেক্ষা করলাম—উত্তেজিত মুহূর্ত্তে শ্লোগান আউড়ে গলা ভেঙ্গে ফেলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে বুক একবারও কাঁপল না। কিন্তু এই মৃত্যু—! অন্ন-বঞ্চনার অভিনয়, বস্ত্র-বঞ্চনার নীতি—অন্তরালে চলছে সমৃদ্ধ জীবন-প্রবাহ, কোটিকে মেরে গুটির অতিকায় হবার সাধনা—এর প্রতিকার কোথায়? শুধু মীটিং করে ঈর্ষ্যাত্মক শ্লোগান আউড়ে তাল ঠুকে অত্যন্ত অসহায়ের মত পথ দিয়ে শোভাযাত্রা করে গেলেই কি ধনিকতাবাদ বিপন্ন হবে?

একদিন শুভার সঙ্গে এই নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। ও

বলেছিল, ছলে বলে অথবা কৌশলে—এই নীতি নিতে হবে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য উপার্জ্জন করতে হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছিলে তোমরা।

নিয়েছি তো। পুঁজিবাদ ধ্বংস করবার সঙ্কল্প আমাদের—শক্তি সঞ্চয়ের দরকার নেই ?

কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ—

আমাদের নীতি হ'ল বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখা। ক্ষমতা লাভ হ'ল আসল বস্তু। ভাল কথারও দাম থাকে না—জীবনের সঙ্গে যদি তার তাল না মেলে।

যথা ?

পরদ্রব্য অপহরণ করিও না—সর্ব্বোত্তম নীতিকথা। কিন্তু অনাহার-গ্রস্তের কাছে এ নীতির কোন দাম নেই।

তা বটে—আমাদের কোন নেতা সেদিন বলেছেন, ক্ষুধার্ত্ত মানুষকে ভগবানের নাম দিয়ে ভোলান মিছে। কিন্তু এই ভাবে চেঁচিয়ে ওদের শাসন করতে পারবে ?

শুভা হেসেছিল, ভুল বুঝো না প্রশান্ত—শ্লোগান আর কিছুই নয়, সকলকে এক করার মন্ত্র। শোভাযাত্রার অর্থও হ'ল তাই। ধনী তার সব ক্ষমতা দিয়েও এ শক্তিকে ঠেকাতে পারবে না।

আমাদের দেশে—ধনীরা এতে কৌতুক বোধ করে না কি ?

হাঁ, তাদের আশ্রয়দাতা হ'ল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। গুলিগোলা রাইফেল মেসিনগান বোমারু নিয়ে ওদের দম্ভ। সংশয় এই নিয়ে তো ?

শুধু প্রাণ দিয়ে লাভ কতটুকু···

শক্তি—শক্তি প্রশান্ত।

ওর হাসিতে প্রশান্ত কৌতুক বোধ করেছিল। কিন্তু সে দিন আর

এই দিনে তফাৎ অনেকখানি। ময়লা ছেঁড়া ধুতি কামিজ পরে খালি পায়ে এক মাথা রুক্ষ চুল উড়িয়ে—শিরা-আকীর্ণ শীর্ণ হাতে নিশান দোলাতে দোলাতে প্রাণ ধারণের দাবি জানিয়ে চীৎকার করতে করতে রাজপথ দিয়ে যায় যে সব ছন্নছাড়া দুর্গতের দল তারা আজ স্রোতের মুখে শ্যাওলা কিংবা ঝড়ের মুখে তুলো নয়। তারা জন্মান্তরের পাপকে অস্বীকার করে আর অদৃষ্ট মানে না। নিজের কর্ম্মের ফল পুরোপুরি ভোগ করতে চায়। হ্যাংলা কুকুরের মত দু-টুকরো মাংস বা হাড়ের লোভে ল্যাজ নেড়ে ছুটে আসে না আমাদের খিড়কীর দুয়োরে। হাঁ, শক্তি ওরা লাভ করছে ক্রমশঃ। ওদের চীৎকারে কেঁপে উঠছে প্রাসাদ-ভিত্তি—মর্ম্মর হর্ম্ম্যের সুখশয্যাশ্রিত লক্ষ্মীর দুলালরা। ইতিহাসের পাতার সোনার অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে এল। দিন আগত ঐ।

সামনে দিয়ে একটা ছোট মত শোভাযাত্রা গেল। কোন্ ময়দাকলের না পটারির শ্রমিকরা অভিযোগ জানাচ্ছে। কুড়ি টাকা মাইনেতে এরা দুদিন আগেও মালিকের সেবা করেছে, মাগ্‌গি ভাতা স্বরূপ চেয়েছিল আর পাঁচটি টাকা। মালিক সাফ জবাব দিয়েছে। যুদ্ধের বাজারে তার এক লাখ দশ লাখে দাঁড়িয়েছে—সুতরাং মাস-খানেক কারখানা বন্ধ রেখে এদের দাবিকে নরম করবার আশা সে করবে না কেন! শ্রমের মূল্য শ্রমিকদের জীবন ধারণ করবার জন্য দেওয়ার রীতি নেই। ওরা বেশি চীৎকার করলে—কারখানার একাংশে একটা ঘরে ডাক্তারখানার ব্যবস্থা হয়—একটা ইস্কুল বস্তির মাঝখানে খুলে দেওয়া হয়—আর সামান্য মাত্র কন্‌সেশনে রেশন দেওয়ার প্রথা চালু করা হয়।

ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্যে—আকাশ-জোড়া দারিদ্র্য নিবারিত হয় না।

শ্রমিক দেখায় ধর্ম্মঘটের হুমকি—ধনিক কাগজে বার করে তার

দাক্ষিণ্যের সুবিস্তৃত বিবরণ। জনসাধারণ নামক এক তৃতীয় পক্ষের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্য এই প্রচেষ্টা। জনসাধারণকে ভয় করবার হেতু—ওদের কাছ থেকে তিল কুড়িয়ে এরা তালে পরিণত হয় পাছে। মুনাফার নেশা যার লেগেছে—তার মৌতাতটুকু সে ছাড়বে কেন। শক্ত মুঠো খুলবার জন্য হাতুড়ির ঘা পড়বে দমাদ্দম—। এ যুদ্ধে কেহ নহে উন।

—দুনিয়ার মজদুর এক হও—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

পথে দেখা হয়ে গেল পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে। জলে ছপ ছপ করতে করতে কোথায় চলেছ হে? বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে।

কোথায় জানে না সে। কলকাতার নতুন রূপ দু'চোখ ভরে দেখতে দেখতে সে চলেছে। সিনেমার গেটে তেমন ভিড় নেই, দোকানের পণ্যে নেই বৈচিত্র্য—ক্রেতার চোখে নেই ক্রয়ের কৌতূহল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি—স্বস্তিবচন উচ্চারণ করলেই আসে না।

বন্ধু ওর পথ রোধ করলে। চল—চা খেয়ে আসি। চলতে চলতে বললে, কোন আপিসে কাজ করিস? রিট্রেঞ্চমেণ্টের কাঁচির পাশ ঘেঁসে আছিস তো?

না—ওসব বালাই নেই।

সাবাস—! ধর্ম্মঘটের পাকে পড়বিনে তা হলে।

ধর্ম্মঘট খারাপ কিসে? ও জিজ্ঞাসা করলে।

খারাপ বলছি!—বন্ধু শব্দ করে হাসলে। ধর্ম্মঘট কারও কারও কাছে শাপে বর। হাসি থামিয়ে বললে, ধর্ম্মঘটের আগে পাচ্ছিলাম আশী—পরে দু'শো যোগ হয়েছে। অথচ ধর্ম্মঘটীদের সঙ্গে পথে পথে হল্লা করে বেড়াই নি—ওদের ইউনিয়নে এক পয়সা ঠেকাই নি—

প্রশান্ত বললে, ব্ল্যাক শিপ।

না—তাও নয়। শুধু প্রমাণ করে দিয়েছি—আশী টাকাতেও আমার দিব্যি চলে—, ফলে দু'শো টাকা মাইনে বেড়ে গেল। এটা সত্যি কথা বলার পুরস্কার···আরে ওদিকে কোথায় ?

এই দিকেই যাব।

চা খাবিনে ?

প্রশান্ত ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

হাঁ, এরাও আছে। বেশি মাত্রায় হয়ত আছে। এরা সর্ব্বদাই সুযোগ খুঁজছে—নিজেকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ। এদেরও নেশা জমেছে। ক্ষমতা-মদের কিংবা ধন-মনের নেশা।

আর একজন বন্ধুকে মনে পড়ল। গেল বার কি যেন এক প্রতিবাদ-সভায় যেতে লাল ঝাণ্ডা ধরে অপরিমিত চীৎকার করতে করতে শহর প্রদক্ষিণ করেছিল সে। তার পর সে হ'ল এক ইউনিয়নের নেতা। তার পরে নিলে রেল আপিসে চাকরি। সেখানকার ইউনিয়নে দাঁড়াল পাণ্ডা হয়ে। এক সপ্তাহ আগে দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। পায়ে চকচকে জুতো, পোষাক-পরিচ্ছদ কণ্ট্রোলে কেনা নয়, রীতিমত সুট-পরা নেকটাই আঁটা, হ্যাট বগলে, মুখে প্রকাণ্ড বর্ম্মা, হাতে ইংরেজি কাগজ একখানা। নড করে বলেছিল, একটা শুভ সংবাদ দিচ্ছি···ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিসট্যান্ট সুপারিনটেনডেণ্ট। অবশ্য—অফিসিয়েট করছি। চ'—চা খাবি।

চা খাবার প্রবৃত্তি হয় নি প্রশান্তর। বন্ধু এতকাল যা করেছে—তা নদীপারের আয়োজন মাত্র। শ্রমিকরা যা চায়, ও চেয়েছিল তাই। ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, পোযাক-পরিচ্ছদে সাচ্ছল্য, জীবনের চারিপাশে প্রাচুর্য্য। কিন্তু প্রবৃত্তির সীমা টানছে কে ? সে অন্ততঃ টানতে পারে নি। সাধারণকে ডিঙিয়ে ও তাই অসাধারণ হতে পেরেছে।

হাঁ, এরাও আছে। যাত্রাপথের অনেক বাধা—লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিলম্বিত পদক্ষেপ। চলতে চলতে হাতছানি দিয়ে ডাকে প্রাসাদ, মোটর তার সুখাসনের গর্ভে ফুটিয়ে তোলে যাত্রা-বিরতির স্বপ্ন। এরা ভিন্ন স্রোতে ভিন্ন দিকে ভেসে গেলে কোন ক্ষতি ছিল না—তবে সাধারণ শ্রমিককেন্দ্রে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে অবিশ্বাস আর সন্দেহকে খাড়া করে যাত্রাপথ বিঘ্নিত করে—এই তো ভয়ের কথা।

অবশেষে পুরাতন মেসে ফিরে এল সে। বন্ধুরা অবাক হয়ে বললে, এ ক'দিন ছিলে কোথায় হে?

প্রশান্ত বললে, রান্না না হয়ে থাকে তো ঠাকুরকে বল—খাব এ বেলা। শোবার জায়গা পাব তো?

সুশীল বললে, সেজন্য ভাবতে হবে না—আমার সীটেই কুলিয়ে যাবে'খন। একখানা চিঠি এসেছে—ক'দিন আগে।

চিঠিখানা পড়ে প্রশান্ত হাসলে।

সুশীল জিজ্ঞাসা করলে, খবর কি?

চাকরি। বাবা মাসখানেক আগে তাঁর এক বন্ধুকে অনুরোধ করেছিলেন···তার জবাব। ইনি একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার, আর এনামেলের কারখানা খুলেছেন বছর চারেক হ'ল।

লেগে যাবে। না—পুঁজিবাদীর সঙ্গে···

মাইনেটা বোধ হচ্ছে ভালই দেবে। একবার ইণ্টারভিউ দিয়ে আসি।

এখনই?

শুভস্য শীঘ্রম।

যুদ্ধে কমলা যাঁদের কৃপা করেছেন, ইনি তাঁদের অন্যতম। প্রকাণ্ড প্রাসাদ, গেটে রাইফেলধারী গুর্খা প্রহরী, বাইরের একতলা ঘরগুলোতে

আপিস বসেছে, টাইপ মেসিনের খটাখট শব্দ। উর্দ্দিপরা চাপরাসীরা ফাইল বগলে, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ছুটোছুটি করছে।

পদোচিত মহিমায় অফিসারের খাসকামরা বিরাজ করছে একধারে। সুইং ডোরের পাশে সুদৃশ্য ভেলভেট-পর্দ্দাটা গুটোনো রয়েছে। চকচকে পালিশ করা কাঠের পার্টিশন, পার্টিশনের মাথায় ফিকে নীল রঙের ধোঁয়া আলস্যভরে নানা আকৃতিতে ভাসছে—মন্থর বায়ু মিষ্ট একটি গন্ধে নাসিকাকে করছে উতলা! টুলে বসে ঢুলছিল একটা উর্দ্দিপরা সুশ্রী বয়, সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চাই? কার্ড দিন।

কার্ড তো নেই, স্লিপে নাম আর পিতৃপরিচয় লিখে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক হ'ল।

একে অভ্যর্থনা বলাই সঙ্গত। বাপের বয়সী ষাটোত্তীর্ণ বৃদ্ধ, চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওর হাত ধরে বিলাতী কায়দায় ঝাঁকুনি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। ওকে চেয়ারে বসিয়ে নিজে বসলেন পাশের চেয়ারে। চাপরাসীকে হুকুম করলেন, চা আনতে অর্থাৎ টিফিন। প্রশান্ত অভিভূত হয়ে পড়ল।

তোমার মত উৎসাহী যুবক আমি চাই। বিশ্বস্ত স্নেহভাজন। একটি চিরুণীর কারখানা খুলবার ইচ্ছে আছে, অনিলকে পাঠিয়েছি আমেরিকাতে। হাতে-কলমে কিছু শিখে আসছে, আর প্ল্যান্টস্ আপ-টু-ডেট মডেলের,-ছুটো কারখানার জন্যই চাই। তার পর ভাবছি কাপড়ের কল—

অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। চা এল, কয়েকখানা কেক, স্যাণ্ডউইচ, অমলেট, টোষ্ট, মাখন এল। ভেলভেটের পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে চাপরাসীটা বেরিয়ে গেল। খেতে খেতে তিনি ভবিষ্যৎ কল্পনার কথা বলে যেতে লাগলেন সোৎসাহে।

ষাটোত্তীর্ণ বৃদ্ধ, জরার থাবা কোন প্রত্যঙ্গে স্পষ্ট নয়। হয়ত আঁটসাঁট স্যুট, হয়ত কর্ম্মোৎসাহ, ধনোপার্জ্জন এ সবে জরাকে ঠেকিয়ে রাখা চলে! কিন্তু চোখে খেলছে যে বিদ্যুৎ তা অনেক যুবকের দৃষ্টিতে বিরল।

দুর্গামোহন অভাবগ্রস্ত নন। সংসার ভারী নয়, পেনসনের আয় সংসার চালিয়ে উদ্বৃত্ত হয়; খাওয়া-পরায় স্বাস্থ্য যাতে বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য তাঁর তীক্ষ্ণ। তবু ষাট তাঁকে স্তিমিত করে আনছে। মেদবহুল দেহের মাংস শিথিল, চলাফেরার বেগ মন্দীভূত, চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্তি। অর্থ উপার্জ্জনের উৎসাহই কি মনের পরম রসায়ন?

কেমন তোমাকে পাব তো? আপাতত এনামেল ফ্যাক্টরীর চার্জ্জটা বুঝে নাও। হাঁ—কলকাতার বাইরে, মাইল দশেক দূরে। ওখানেই কোয়ার্টার, মোটর থাকবে একখানা। যখন খুসি কলকাতায় আসবে, বেড়িয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি প্যাড থেকে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে ফাউণ্টেন পেন দিয়ে খস্ খস্ করে কয়েকটি অঙ্কপাত করলেন তাতে। তার পর প্যাডসমেত সেখানা প্রশান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপাতত এই তোমার মাইনে, প্লাস এ্যালাউন্স থার্টি পারসেণ্ট। কেমন, অসুবিধা হবে?

প্রশান্ত সত্য সত্যই অভিভূত হ'ল। তিনশো টাকা বেতন আর নব্বুই টাকা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স। তা ছাড়া কোয়ার্টার, মোটর এবং একটা গোটা ফ্যাক্টরীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ব্যাপারটা আবুহোসেনীয়। আলনাস্কারের দিবাস্বপ্ন নয় তো? ডান পায়ের জুতোর ডগা দিয়ে বাঁ পায়ের গোড়ালীতে আঘাত করলে ঈষৎ জোরে। পেরেকওঠা জুতোর ঘা খেয়ে পা'টা বুঝি কেটে গেল! জ্বালা করছে।

সম্মতি জানিয়ে সে বাইরে এল। রূপালী জ্যোৎস্নায় পীচের রাস্তা চক্ চক্ করছে, গ্যাসের আলোর নীচেয় তারও নিজস্ব একটি রূপ আছে, অভাবিত মুহূর্ত্তে সে সৌন্দর্য্য সুরার মতই চিত্তে উত্তেজনা সঞ্চার করে! সে যেন তারই জগতে ফিরে এল। স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যে ঝলমল জগতে, প্রাচুর্য্য আর নির্ভাবনার মধ্যে! টুং টুং ঘণ্টা বাজিয়ে বাঁ ফুটপাত ঘেঁসে একখানা রিক্সা যাচ্ছিল মন্থর গতিতে। প্রশান্ত হাত উঠিয়ে চীৎকার করলে, এই রিক্সা, রিক্সা···

চালক রিক্সা ঘুরিয়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কাঁহা পর যানে হোগা বাবু?

মেটিয়া কালিজ কা পাশ। বলে দরদস্তর না করেই ও রিক্সায় চেপে বসলে।

রিক্সাওয়ালা বললে, এক রূপয়া।

মিলে গা। রিক্সার গুটানো হুডের আশ্রয়ে মাথা রেখে, আধ-বোজা চোখে ও নিস্পৃহকণ্ঠে বললে।

১৮

বাড়িটাকে দেখলে মনে হবে—একটা বন্দী-নিবাস। টানা ব্যারাকের মত লম্বা চলে গেছে—গলিটাকে পাকে পাকে জড়িয়ে। আগে ছিল দোতলা—সম্প্রতি উপরে আর একটি তলা উঠেছে—আয়ও বেড়েছে দু'গুণ। ঠিক ফ্ল্যাট সিষ্টেমে তৈরি হলে—কল, জল, আরও অনেক বিষয় নিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের অহোরাত্র বিবাদ বাধত না। তা ছাড়া উনুনের ধোঁয়া—কচি ছেলের কান্না—তার চেয়ে বড় ছেলেদের ঝগড়া মারামারি দৌরাত্ম্য—তা নিয়ে মায়েদের কলহ—তার ওপর রেডিওর

বিচিত্র অনুষ্ঠানে বহু কণ্ঠের বহু ঢঙের আবৃত্তি, গান, যন্ত্রসঙ্গীত, সংবাদ পরিবেশন—কি না আছে এখানে! উঠোন নেই, ছাদ নেই। কাপড় শুকোতে দেবার বারান্দা আছে—কিন্তু কাপড় মেলে দিয়ে ঠায় তার দিকে চেয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমনি একখানি বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে মলয়।

ভাল আশ্রয় অন্যত্র মিলত—কিন্তু সুচিত্রা আত্মীয় বাড়িতে যেতে চায় নি।

বাড়ি থেকে বেরিয়েছি—আরাম আশা করে নয়। এই তো ভাল।

এ হাটের মাঝে ঘর পাততে পারবে? আমার ধর বাইরের কাজ আছে—পা মেলে বেড়াবার অফুরন্ত পথ আর ফাঁকা জায়গা আছে—

আমাকেও তোমার কাজে টেনে নেবে। পারবে না?

তুমি যাবে?

অবশ্য—যদি তোমার মর্য্যাদায় না বাধে! দুষ্টামিভরা হাসি সুচিত্রার ওষ্ঠপ্রান্তে মিলিয়ে গেল।

মলয় বললে, মর্য্যাদা? কিসের মর্য্যাদা?

কেন—বাঙালীর অন্তঃপুরের একটি শুচিতা আছে তো।

মলয় উচ্চরবে হেসে বললে, পরীক্ষা করছ? অন্তঃপুর কোথায় যে তার শুচিতা বজায় রাখবার জন্য—

বাঃ রে, যেখানে অন্তঃপুরিকা—সেইখানেই কি অন্তঃপুর নয়? সুচিত্রা কলকণ্ঠে হেসে উঠল।

মলয় বললে, রহস্য রাখ—সত্যিই কি তুমি আমার সঙ্গে কাজে নামতে চাও?

না হলে তোমার সঙ্গে এসেছি কেন?

কিন্তু এরও পরীক্ষা আছে।

বেশ, কর পরীক্ষা।

প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা। দুঃখ কষ্ট—এসব সহ্য করার দৃষ্টান্ত দেব না—কারণ তাতে তোমরা অপরাজেয়। তবে সম্ভ্রম শুচিতা—এ সব খুঁৎখুঁতুনি মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। মোট কথা পর্দ্দার মধ্যে গজায় যে সব সংস্কার—হয়ত ভাল—হয়ত মঙ্গলজনক—তাও ত্যাগ করতে হবে।

সুচিত্রা বললে, মঙ্গলজনক যে সংস্কার তা ত্যাগ করবার প্রয়োজন হবে না। মেয়েদের হাতে দিব্য অস্ত্র আছে—তার সন্ধান তোমরা রাখ না বলেই এত সতর্কতা—উপদেশ বর্ষণ।

সে দিব্য অস্ত্রটি কি?

দিব্য অস্ত্রের সন্ধান অপর পক্ষকে দেওয়া নিষিদ্ধ।

সে তো শত্রুপক্ষকে।

তা হলে যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে ফ্যাসি-শত্রু ধ্বংস করলে—তারা দিব্যাস্ত্রের সন্ধান অপর মিত্র পক্ষকে জানাচ্ছে না কেন?

সন্দেহবশতঃ। ভাবছে—নীতিতে যারা ভিন্ন পথের পথিক—

তারা মিত্র হলেও মিত্র নয়—এই তো? এ একটা কারণ বটে—কিন্তু নিজেকে গুরুত্বে গুরুতর করে রাখা মানুষের অন্যতম অভ্যাস।

সে অভ্যাস রাখা চলবে না। বদ অভ্যাস।

দু'জনেই কৌতুকে হেসে উঠল।

স্বল্পপরিসর ঘরে মানিয়ে নিলে সুচিত্রা।

প্রয়োজনের বাইরে এতটুকু বিলাসকে কোন দিক দিয়েও প্রশ্রয় দিলে না। আর ছোট্ট ঘরে রান্না খাওয়ায় অল্প সময়ই তো ব্যয় হয়। কোন কোন বাসিন্দার মত—কর্ত্তারা কার্য্যক্ষেত্রে চলে গেলে—একখানা নভেল হাতে করে—বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়া—কিংবা ঘুম—তাস খেলা বা গল্প এ

সবে সময় কাটানো দুষ্করই ঠেকবে। একখানি ঘরে—রোজকার রোজ—একঘেয়ে কাজ—বন্দী জীবনের অনুবৃত্তি ছাড়া কি? যেখানে মাঠ নেই—আকাশ নেই—নিস্তব্ধতা নেই—গাছপালা নেই—যেখানে দিনদিন খাওয়া-শোওয়া-গল্প-কলহ চলেছে তো চলেছেই—বাইরের জগৎ কচিৎ দেখা দেয়—কালীঘাটে পূজো দিতে গিয়ে—দক্ষিণেশ্বরে বা বেলুড় মঠে বেড়াতে গিয়ে কিংবা পর্ব্বোপলক্ষে গঙ্গাস্নানে—পথে ও গঙ্গার ধারে। আর আছে প্রমোদ-বিলাসের জন্য মাসে দুটি কি তিনটি দিন—সিনেমা দর্শন।

কোনটিই বন্দীর এক সেল থেকে আর এক সেল-এ যাবার পথ ছাড়া কি? সেই ভিড়—সেই কোলাহল—কলহ—ঠেলাঠেলি—মারামারি। পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়েছে বন্দী-নিবাসে অথবা জনসংখ্যা বেড়েছে—যাতে সঙ্কীর্ণ হয়েছে তার ভূমি! একটা কথা শোনা গিয়েছিল—যুদ্ধের পুরো যৌবনকালে। বোমারুর উৎপাতে—অভিজ্ঞজনেরা ফতোয়া দিয়েছিলেন (কোন কোন ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ সে উপায় গ্রহণও করেছিলেন।) যে, শিল্প-কেন্দ্রগুলিকে ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের অভ্যন্তরে। অতি স্ফীত দেহের অংশে নিশানা করা সোজা—তার ফলও অল্প আয়াসে মেলে। এখন যুদ্ধের বিভীষিকা মিলিয়ে গেছে—তৃতীয় মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্ন দেখলেও—আর তা নিয়ে সাবধান বাণী প্রয়োগ করলেও—অতি সাবধানীর চিত্ত-উৎক্ষেপ বলে তা কানে তুলছে না কেউ।

মলয়ের পাশটিতে এসে দাঁড়াল সুচিত্রা। বাইরের জগৎ বিস্তীর্ণ এবং বিচিত্রও বটে। এ জগতে দুঃখ যেমন আসে অভাবিত—দুঃখ তেমনি ভেসে যায় নানা কর্ম্মের প্রবাহে। আজ—কাল—পরশু প্রতিটি দিন—সময়ের দাগে দাগ মিলিয়ে আসে আর চলে যায় না। একক জীবনের প্রবাহে—কখনো শ্যাওলা—কখনো শতদল—কখনো তরঙ্গ—কখনো তুফান

—এই বৈচিত্র্য-বৈভবে ভেসে আসে ঘটনা। ভেসে চলে যায় দূরে—কখনো শোভা—কখনো বা সৌরভের স্পর্শ দিয়ে। দাগে দাগ মেলে না—কিছুই থাকে না চিরস্থায়িত্বের প্রলোভন দেখিয়ে। আর তাতেই বুঝি মন ওঠে ভরে। সঞ্চয়কে একটি জায়গায় স্তূপীভূত করলেই না মমতা!...স্রোতের জলকে খালের মধ্যে এনে জমা করা। লক্ষ্মী কৃপাদৃষ্টিতে চান—অস্বাস্থ্যও ভালবেসে এগিয়ে আসে। সংসারে ঠাঁই বাঁধলে—জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। ঘর ছাড়বার পর এই অনুভূতি প্রবল হয়েছে সুচিত্রার মনে—সম্পূর্ণকে পাওয়ার সাধনা সর্ব্বস্বকে বিলিয়ে দিয়েই করতে হয়।

মলয়কে সে এক দিন বললে, তোমরা কংগ্রেসের সব নীতি মাননা তো?

মানি—কিন্তু সমর্থন করি না। মন্ত্রী-মিশনের সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনায় দেশের স্বাধীনতা আসবে না—এটা আমরা বিশ্বাস করি।

সুচিত্রা বললে, তবে আলাপ না চালিয়ে দেশকে বিদ্রোহের পথে টেনে আনলেই কি তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?

মলয় বললে, টেনে আনার কথা নয়—কিন্তু এটা সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার—আমরা আগুন চাইছি—পাচ্ছি আলেয়া। আর তাতেই ভুলে সব পেয়েছি বলে যদি নিরুদ্যম হই তো কোথায় পিছিয়ে পড়ব ভাব কি?

কংগ্রেসের নেতারা কি এ কথা বোঝেন না?

নিশ্চয় বোঝেন। কিন্তু তাঁরা আশাবাদী। তাঁরা হয়ত এ-ও বোঝেন যে যুদ্ধের ধাক্কায় আমাদের সঙ্কল্প স্বভাবতঃই শিথিল হয়েছে কিছুটা। তা ছাড়া বিপ্লব বাধাবার উপযুক্ত সময়ও এটা নয়।

সে কথা কি তোমারও মনে হয় না?

হয়। তবে—এ কথা কি আরও সত্য নয় যে—যুদ্ধের ইচ্ছাটা—

যুদ্ধের কারণ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জাগিয়ে রাখা কর্ত্তব্য ? কারও সৎ প্রতিজ্ঞায় অবিশ্বাস করি না আমরা—

একটু থেমে হেসে বললে, কি জান—কালস্য কুটিলা গতি। এখন পরিবেশ সৃষ্টি করে—রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে চলছে পটক্ষেপণ আর পটোত্তোলন···এ তো সাধারণের মত অনুসারে ঘটে না।

সুচিত্রা বললে, লিখিত সর্ত্ত অবস্থার চাপে এক মুহূর্ত্তে বাতিল হয়ে যায়।

মলয় বললে, বিপ্লব খড়ের আগুন নয়—ওপরের একটু দাহ্য পদার্থের সংযোগে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মানুষকে রাষ্ট্রসচেতন করতে হলে সমাজ-সংস্কার প্রথমে দরকার।

মোট কথা তোমরা বাম-পন্থী।

রক্ত গাঢ় হলেই মানুষ যে পন্থা নেয়—তা দক্ষিণ পন্থা নয়—ওটা আপোষ-নিষ্পত্তি—বিচার-বিবেচনা মানিয়ে চলার একটি দিক।

মানিয়ে চলাটাই—অর্থাৎ সহযোগিতাই সব চেয়ে বড় কথা নয় কি ?

তারও আগে কতকগুলি ধাপ আছে—যা উত্তীর্ণ হওয়া দরকার। তুমি তেতলা থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেই আমি একতলা থেকে কিছু সে হাত ধরতে পারি না।

তারই ব্যবস্থা তো হচ্ছে। সিঁড়ি—ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট হ'ল সেই সিঁড়ি যা দিয়ে একতলার মানুষ পৌছতে পারে ওপর তলায় কিংবা তেতলার মানুষ নামতে পারে একতলায়।

মলয় বললে, সিঁড়িটা তাই মজবুত হওয়া দরকার। ও সিঁড়ি যদি পলকা হয় কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না।

তাই বুঝি এত কথা কাটাকাটি—এক একটি ধারার ভাব আর ভাষ্য নিয়ে মাথা ঘামানো চলছে ?

ওসব সিঁড়ি তৈরির প্ল্যান—ওটাও দরকার, তার চেয়ে দরকার ভাল মশলার, ভাল কারিগরের। মশলা হ'ল ভারতের সব জাতির একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা—কারিগর হলেন যাঁরা কাজ করবেন, দায়িত্ব নেবেন—একসঙ্গে আর একমত হয়ে।

তা কি করে হবে? লীগ আপত্তি তুলছে।

কংগ্রেসও তুলেছিল। তবু কিছু ছেড়ে মানিয়ে না নিলে আসল কাজটাই পণ্ড হয়ে যাবে।

তা হলে মানিয়ে চলায় তোমাদের আপত্তি কেন?

আমাদের আপত্তি হ'ল ভারতের খণ্ড সত্তায়। আমাদের আপত্তি নকল পাথরকে হীরে বলে আদর করায়। স্বাধীনতা পেয়ে গেলেই যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লম্বা একটা ঘুম দেওয়া যাবে—এ ধারণা জন্মানোর পক্ষপাতী নই আমরা।

তবে কি করবে?

কত যুগের জঞ্জাল আমাদের চারদিকে গজিয়ে উঠেছে, তার উচ্ছেদ চাই। স্বাধীনতার প্রথম যুগে আত্ম-উৎসর্গের আয়োজন চাই। আমাদের যুগটা কাটবে—উদ্যোগ—শ্রম—বিপ্লব আর গঠনের দায়িত্বে। পরিবর্ত্তনের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করে যারা—তাদের ঘুম মানায় না।

কংগ্রেস যদি নরম পন্থায় আপোষ করে?

আমরা তা করতে দেব কেন?

কংগ্রেস যদি তোমাদের কথা না শোনে?

সত্যিই হাসালে চিত্রা! কংগ্রেস কি? নানা জাতির মিলন-প্রতিষ্ঠান মাত্র। জাতি যা চাইবে কংগ্রেস তা অস্বীকার করবে কেন? তাই ত আমরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে সৃষ্টি করব না নতুন দল—

তবু তোমরা নতুন দলই—বামপন্থী। বলে সুচিত্রা হেসে তর্কের পরিসমাপ্তি করলে।

এক দিন মণীশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মীটিঙে যাবার মুখে।

সুচিত্রা মণীশকে লক্ষ্য করেনি। মণীশই প্রণাম করে বললে, মাপ করবেন বউদি—প্রথমটা আপনাকে চিনতেই পারি নি।

অপরাধ মণীশের নয়—এ ধরণের পটভূমিকায় সুচিত্রাকে ও আশা করে নি।

সুচিত্রা নত নেত্রে বললে, অপরাধ আমারই—

মণীশ বললে, না বউদি—

মলয় বললে, থাক অপরাধতত্ত্ব—কিন্তু কোথায় তুমি গা ঢাকা দিলে—এত দিন কোন পাত্তা লাগাতে পারি নি!

গিনি হাউসে আমাদের আস্তানা—যদি খোঁজ করতে অন্ততঃ—

মলয় বললে, অনিমা কোথায়?

ঐ যে ডায়াসের একধারে যেখানে মেয়েরা বসে। এস, তোমাদের পেলে ও ভারি খুসি হবে।

মীটিং ভাঙলে—ওরা পার্কের একধারে বৃত্তাকারে বসল। তারপর চলল আলোচনা। মন্ত্রীমিশন আর কংগ্রেস—ভারতের যুগবিপ্লবী পরিবর্ত্তনের কথা।

মণীশ বললে, আলোচনা আর ব্যাখ্যা এ সবে স্বাধীনতা আসবে বিশ্বাস হয়?

আলোচনা যদি আন্তরিক হয়—

বাধা দিয়ে মণীশ বললে, বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ শুনতে সোনার পাথর-বাটির মত। তা হয় না—আমাদের তৈরি হতেই হবে।

বাড়ি এসে সুচিত্রা বললে, ওঁরা তোমাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তোমরা বিশ্বাস কর না আলাপ-আলোচনায় স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে—ওঁরাও মনে করেন স্বাধীনতা হাটের জিনিস নয়।

তা হলে আমরা তো একই হলাম।

না—ওঁরা জানেন, হাতে-কলমে দেখিয়েও দিয়েছেন, সে বস্তু কোন্ উপায়ে হস্তগত করা যায়—তোমরা দেখছ বিপ্লবের স্বপ্ন। সেদিন সুমিত্রাদির সঙ্গে কথা হচ্ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন নিয়ে। সুমিত্রাদি বললেন, নাই যদি আসে ওরা, আমরাই গণ-পরিষদে আইন তৈরি করব স্বাধীন রাষ্ট্রের। বললাম, সে কি করে হবে? দেশের সিকি ভাগকে বাদ দিয়ে—। উনি এ্যাটলির উদ্ধৃতি দিলেন—সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাধা জন্মাতে পারবে না সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাজে।

সে ভাষ্যও তো বদলেছেন এ্যাটলি। সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে নিয়ম খাটত, জাতি সম্বন্ধে তা খাটবে না।

ও—বুঝেছি তোমার কথা। তুমি বলছ বাদ দেওয়া যখন চলবে না কোন জাতিকেই, তখন—'যে আসে আসুক' এ নীতি চলবে না। আই, এন, এ, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একীকরণের যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে দেশের সামনে—তাই বা স্বার্থান্ধ মানুষ নিতে পারছে না কেন? এটি অগ্রগতি মানি, কিন্তু ফল হচ্ছে কই?

মলয় বললে, তুমি কি বলতে চাও সুচিত্রা স্পষ্ট করে বল ত?

সুচিত্রা বললে, স্পষ্ট করে কি বলব—মন্ত্রীমিশন যা বলছেন তারও মানে যেমন নানা রকম—তোমাদের নানা দলে যে মন্তব্য করছ তাও বিচিত্র ধরণের। এই সব দলের মন্তব্য থেকে আমার মনে হয়—অবশ্য সেটি আমারই মত—যে কংগ্রেস রফা-নিষ্পত্তির মনোভাব নিয়ে সদিচ্ছার সঙ্গে এগিয়েছেন—ওদের মনোভাব বদলে দেবেন এই আশায়—

তোমাদের বামপন্থী দলগুলি তা বিশ্বাস করছে না। অথচ তোমরা এক ধরণের বিশ্বাস নিয়েও দল আলাদা আলাদা! এটা আশ্চর্য্য বোধ হয় না ?

মলয় বললে, সোস্যালিষ্ট আর কম্যুনিষ্ট পার্টি যেমন খানিকটা এক হয়েও সবটা এক নয়—আমাদের এই বিভিন্ন দলগুলি—

সুচিত্রা বললে, আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় তোমরা এক হয়ে একটি সাধারণ কর্ম্মপন্থা বেছে নাও না কেন! দল যত বড় হয় তার ক্ষমতাও তত বেশি হয়—এ তো জান।

মলয় উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসলে। বললে, কিছু খাওয়াবে ? খিদে পেয়েছে।

আমার কথা এড়িয়ে যেতে চাইছ কিন্তু।

তা চাইছি। কারণ সব দলগুলিকে এক করার বিরাট্ ব্যক্তিত্ব আমাদের কারও নেই—আমরা তা পারি না।

সুচিত্রা বললে, তা হলে তোমরা স্বপ্নই দেখবে চিরকাল ?

না চিত্রা। শহরে আন্দোলন করে ছাত্র আর শ্রমিক খেপানো ছাড়া বিশেষ কিছু ফল হয় না, অস্বীকার করি না—ওটাও গণজাগরণের একটি অংশ। তবে প্রকৃত কাজ আরম্ভ করতে হবে গ্রামে—কৃষক আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে। এর জন্য চাই সংগঠন—সমাজকে সুস্থ ও সক্ষম করে গড়ে তোলার কাজ। সে কাজও আরম্ভ করেছি আমরা।

সুচিত্রা বললে, খাবার খেয়ে কিন্তু খুলে বলতে হবে কি ধরণের কাজ আরম্ভ করেছ তোমরা।

শহরে বিক্ষোভ লেগেই রয়েছে। ডাক ও তার ধর্ম্মঘট চলছে—প্রেস-ধর্ম্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয়ে গেছে। বাটা মজদুর ইউনিয়ন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বেলুড় লোহা-ঢালাইয়ের কারখানায় অর্দ্ধভুক্ত শ্রমিকরা করছে ঘন ঘন মীটিং। পৃথিবীর চার দিক থেকে খবর আসছে ধর্ম্মঘটের। যুদ্ধের জোয়ার সরে গেছে, দেশপ্রেমের মোহ—জীবন ধারণের সমস্যা-সংঘাতে রূপ বদল করছে। যুদ্ধোত্তম মানুষের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করে আছে, প্রকৃত যুদ্ধ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজনেই আরম্ভ হ'ল বুঝি!

ইতিমধ্যে কলকাতা বেশি রকম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কংগ্রেস মন্ত্রীমিশনের দীর্ঘমেয়াদী সর্ত্ত মেনে নেওয়াতে—লীগ স্বল্প-ও দীর্ঘ-মেয়াদী দুই সর্ত্তই বাতিল করে দিয়েছে। শুধু বাতিল করেই ক্ষান্ত হয় নি—অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। ঐ সংগ্রাম প্রথম সুরু হবে ষোলই আগষ্ট।...নেতারা কেউ কেউ বলেছেন—অহিংস সংগ্রাম আমাদের নীতি নয়। সংগ্রামের আগের দিন ঘোষণা করা হ'ল—ঐ দিন পূর্ণ হরতাল পালন করা হবে। যারা যোগ দিতে চায়—তারা যোগ দেবে—যারা যোগ দেবে না—তাদের ওপর জুলুম করা হবে না। যথাসম্ভব নিরুপদ্রবে প্রতিবাদ-দিবস পালিত হবে। তবে যদিই কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে এইজন্য ঐ দিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ছুটি ঘোষণার বিরুদ্ধে যথেষ্ট বাদ-প্রতিবাদ হ'ল। সিন্ধুর গভর্ণর ছুটির ঘোষণা বাতিল করে দিলেন—বাংলার লাট তূষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন। এমনি করে ষোলই আগষ্ট এল। ষোলই আগষ্ট এল অকল্পিত

রূপে। সভ্যতার পাদপীঠ থেকে গড়িয়ে পড়ল মানুষ। গড়াতে গড়াতে চলে গেল তারা আদিম যুগের আশ্রয়ে। পশু-জগতেও হনন-রীতির একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে—জন্মস্বত্বে পাওয়া পশু-বিবেক বলা যায় তাকে। ষোলই আগষ্ট আরণ্য-রীতিকেও অতিক্রম করল অনায়াসে।

শহরের রাজপথ শবে আচ্ছন্ন হ'ল—আকাশে উড়ল চিল আর শকুনেরা। আকাশে উঠল—নিরীহ যে-কোন-নীতি-অনভিজ্ঞ দল-নিরপেক্ষ হিন্দু-মুসলমানের মরণ আর্ত্তনাদ, উঠল প্রাসাদ ও বস্তি লেহন-কারী আগুনের লকলকে শিখা। বাতাসে বারুদের গন্ধ—রক্তের গন্ধ—শবের গন্ধ। গুণ্ডাদলের উন্মত্ত চীৎকারে মথিত হ'ল বায়ুমণ্ডল। মানুষ নয়—গোটা শহরটাকে হত্যা করা হ'ল। নাদির-তৈমুরের কীর্ত্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আর একবার বৃটিশ-শাসিত শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ষোলই আগষ্ট ঐ তারিখটিতেই নিঃশেষিত হ'ল না—পর পর তারিখ-গুলি তার জের টেনে চলল। 'জয় হিন্দ' আর 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি বায়ুস্তর বিদীর্ণ করে এক প্রান্তের অরাজকতাকে অন্য প্রান্তে বিস্তীর্ণ করে দিলে। মন্ত্রীমিশন তখন বিলাতের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় দুশ্চিন্তামুক্ত চিত্তে সুনিদ্রার আয়োজন করছে।

শহর দুঃস্বপ্নপীড়িত, পথে ঘাটে লোক চলাচল নেই বললেই হয়। এক সম্প্রদায়ের এলাকা দিয়ে অন্য সম্প্রদায় চলাফেরা তো করছেই না—সঙ্গীন উঁচানো প্রহরীর সামনে পাশাপাশি দুই সম্প্রদায় দোকান খুলতে ভরসা পায় নি। দুধ সব্জীর অভাবে গৃহস্থের নাকালের অন্ত নেই—প্রচণ্ড আঘাতে শহর মূর্চ্ছাহত। এমন সময়ে মণীশের সঙ্গে মলয়ের দেখা।

রেড ক্রসের গাড়িতে ওরা আর্ত্ত-উদ্ধারে নিযুক্ত ছিল—এক পোড়া-বস্তির গলিপথে দুখানা মোটর এসে দাঁড়াল।

খবর কি মলয়? তোমাদের পাড়াটা—

হাঁ—স্বরাজ্যে সুস্থ শরীরেই আছি। তুমি?

বাসা বদল করা দরকার।

আসবে আমার বাসায়?

আপত্তি নেই।

বাসায় ওরা কতটুকুই বা থাকে! সুচিত্রা কি অনিমা ওরাও অহোরাত্র খাটছে। কাজের সীমা-সংখ্যা নেই। এত রকমের দুঃখ ও দুর্ভাগ্য আছে—যা কল্পনাতেও মানুষ আনতে পারে নি। সাম্প্রদায়িকতার বিষ-নিঃশ্বাসে শহর ঢুলে পড়েছে। কাগজে কাগজে যে কাহিনী পরিবেশিত হচ্ছে—তা সত্য কিংবা সত্য-মিথ্যা জড়িত, অথবা কাল্পনিক এ নিয়ে বিচার নেই মানুষের মনে। মন বিভীষিকায় আচ্ছন্ন, অবিশ্বাসে ও বেদনায় অনুভূতি উগ্র, দৃষ্টিতে ধরেছে তারই রং, বাক্যে প্রকাশ পাচ্ছে উত্তেজনা। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে কৃতজ্ঞতার বন্ধন—প্রতিবেশীসুলভ সৌভ্রাত্রবোধ—দুঃখে সমবেদনা ও ঐশ্বর্য্যে প্রীতি প্রকাশ মানব-কর্ত্তব্যের অঙ্গ ছিল তা বিলুপ্তপ্রায়। প্রতিবেশী দোষ না করেও পাড়া ছেড়ে পালাচ্ছে—প্রতিবেশী দোষী না হয়েও তাকে ভরসা দেবার সংসাহস দেখাতে পারছে না। পরস্পরের দীর্ঘ দিনের আলাপ—আত্মীয়তার মাটি থেকে এতকাল রস শোষণ করেছে—এই ক'টি দিনের হাঙ্গামায় সে মাটি শুকিয়ে গেছে; তারা হারিয়ে ফেলেছে সে দৃষ্টি—সে মন। সৈনিক প্রহরায় পাড়া ছেড়ে পালাচ্ছে সেই প্রতিবেশী—জানালা খুলে দেখবার সাহসটুকু নেই প্রতিবেশীর। দু'পক্ষের মাঝখানে অমানবীয় আচরণ সমুদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। সভ্যতার অগ্রগামী স্রোত—আদিম কালের গুহায় ফিরে চলেছে। এই লজ্জাকে জয় করা সহজসাধ্য নয়।

এই নিদারুণ লজ্জার মধ্যেই আর এক পরম লজ্জাকর ব্যাপার ঘটল।

ব্যাপারটি হ'ল হিসাব-নিকাশ। প্রথম উত্তেজনা কেটে গেলে সুরু হ'ল বাগবাজার আর টেরিটবাজারের হিসাব-নিকাশ। মৌলালী-মাণিকতলা এরা বড়বাজার আর শ্যামবাজারকে ছাপিয়ে যেতে পেরেছে কি? ভবানীপুরের সঙ্গে মেটিয়াবুরুজের পাল্লা দেওয়া চলল। লুণ্ঠিত সম্পত্তির মূল্য-হিসাব আর নিশ্চিহ্ন-প্রতিবেশীর সংখ্যা গণনা—কাগজে আর লোকের মুখে—পথে, বস্তিতে, ক্লাবে, বাড়িতে, আপিসে আর দোকানে প্রতিনিয়ত চলল। শহর গুজবের আবর্ত্তে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল—স্বাভাবিক অবস্থা ফিরতে হ'ল দেরি।

ইতিমধ্যে দুর্গাপূজা এল—ঈদ সমাধা হল। গুপ্ত ছোরা মারার সংবাদ—সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে—কিন্তু ব্যাপক হাঙ্গামা বাধল না। তবে বড় রকমের একটা বিক্ষোভ পাক খেতে লাগল—হিসাব-নিকাশের অন্তরালে। তারপর এল দশই অক্টোবর। শহর থেকে বিক্ষুব্ধ ঢেউ সবেগে আছড়ে পড়লো নোয়াখালিতে। কলঙ্ক-কাহিনীর আর এক পৃষ্ঠা ইতিহাসে সংযোজিত হ'ল। আবার কাগজে কাগজে আর্ত্তনাদ, হিসাব-নিকাশ। বাংলা থেকে বিহারে আছড়ে পড়ল ঢেউ। বিহার থেকে তার গতিবেগ প্রবল হয়ে হাজারায় আঘাত করলে—তারপর প্রসারিত হ'ল সৈয়দপুরে। গৃহযুদ্ধের পটভূমিকা সুসম্পূর্ণ হ'ল।

দোসরা সেপ্টেম্বর কংগ্রেস যোগ দিয়েছে মধ্যবর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে। দিল্লীর বড় দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। একটি চুরুট মধ্যবর্ত্তী সরকারের—মহামান্য সদস্যের মোটরে মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, অগ্নিকাণ্ড ঘটে নি। কিন্তু সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে—রাজধানীর বাইরে। তারপর লীগের সদস্যেরা যোগ দিয়েছেন সরকারে, তবু আগুন নেভে নি। একটা গোল বাধল ষোলই মে-র ভাষ্য নিয়ে। গণপরিষদে যোগ দেবার প্রতিশ্রুতিতে লীগ নাকি মধ্যবর্ত্তী সরকারে প্রবেশ করেছিল

—অথচ লীগ বর্জ্জন করলে গণপরিষদ। বড়লাটের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটল না—তিনি এ পক্ষের দু'জন আর ও পক্ষের দু'জনকে টেনে নিয়ে গেলেন বিলাতে মোকাবিলা করতে। গণ্ডগোলটা গ্রুপিং সম্বন্ধে। অনিচ্ছুক আসাম বাংলার সঙ্গে হাত মেলাবে না—পঞ্জাবে আর সীমান্ত প্রদেশেও সেই সমস্যা। আর একটা বড় প্রশ্ন উঠল—লীগ যদি গণ-পরিষদ বর্জ্জন করেই আর তার অনুপস্থিতিতে সেখানকার অধিবেশন চলে ও আইনকানুন বিধিবদ্ধ হয়,—সে আইন লীগ মানতে বাধ্য কি না?

৬ই ডিসেম্বরে এ্যাটিলি রায় দিলেন: অনিচ্ছুক কোন অংশের ওপর জোর করে শাসনবিধি চলবে না। গণপরিষদের অধিবেশন যথাসময়েই বসবে ও যথানিয়মেই চলবে—তবে তার বিধিবিধান গ্রহণ বা বর্জ্জন করার স্বাধীনতা যে কোন দলেরই থাকবে।

১৬ই মে-র দ্ব্যর্থবাচক ঘোষণায় একটি গ্রন্থি পড়ল।

২০

শহরতলির এ জায়গাটায় আগে ঘন দুর্ভেদ্য বাঁশবন ছিল; পড়ো জমি—আগাছা—লতাগুল্ম আর ছোট ছোট ডোবায় ছিল ভর্ত্তি। এখান থেকে এনোফিলিসরা ম্যালেরিয়া-বীজ বহন করে আশেপাশের গ্রামে দিত হানা—ম্যালেরিয়ার ডিপো বলে অর্দ্ধমৃত গ্রামগুলি বসতি-বিরল হয়ে আসছিল ক্রমশঃ। শুভক্ষণে একাধিক কোম্পানীর নজর পড়ল এদিকে। প্রথমে বড় একটা কাপড়ের মিলের জন্য কয়েক শ বিঘা জমি লীজ নিয়ে জঙ্গল সাফ সুরু হ'ল। তার দেখাদেখি—আরও কয়েকজন ব্যবসায়ী ঝুঁকে পড়লেন এদিকে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে—দুটো কাপড়ের মিল—একটি এনামেল ও একটি গ্লাস ফ্যাক্টরী চালু

হয়েছে—আর একটা মিলের জন্য জমি দখল করা আছে—কাগজে কাগজে শেয়ার বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন বার হচ্ছে। ফলে হাজার হাজার বিঘার জঙ্গল—বাঁশবন পচা ডোবা মশককুল সমেত নিশ্চিহ্ন হয়েছে—আশ-পাশের গ্রামে নবজীবনের স্রোত বইছে।

মিল বা ফ্যাক্টরীর অধিকৃত জমিতে শ্রমিক-ব্যারাক ও ম্যানেজার ইন্‌স্‌পেক্টার প্রভৃতির কোয়ার্টার্সও তৈরি হয়েছে। কোয়ার্টারে বৈদ্যুতিক আলো—সংরক্ষিত ট্যাঙ্ক থেকে পাইপবাহী পানীয় জলের ব্যবস্থা এ তো আছেই, যুদ্ধের শেষভাগে রেশন-ব্যবস্থা চালু হওয়াতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দোকানও খুলেছে কোম্পানী। দুটি বাজার প্রত্যহ বসে। আর যে সব দোকান গ্রামের অভ্যন্তরে আছে—সেগুলোরও শ্রী ফিরেছে। বিশেষ করে দেশী মদের দোকানের আয় বেড়ে গেছে অসম্ভবরূপে। শহর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে গ্রামের দিকে।

কলকাতার প্রতিক্রিয়া এখানেও হয়ত সুরু হ'ত—মিল কর্ত্তৃপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির চেষ্টায় তা হয় নি। অত্যাচারের তালিকা ও নিহতের সংখ্যা নিয়ে তর্কবিতর্ক ও মনোমালিন্য যে ঘটে নি তা নয়—তবে সেটা দেশী মদের দোকানের এলাকাতেই নিবদ্ধ ছিল।

দোতলার দক্ষিণ-খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে দেহ এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে প্রশান্ত। সন্ধ্যার মুখে এক পেয়ালা চা ও টোষ্ট মাখম ডিম জলযোগ করে বিশ্রামের মুহূর্ত্তে কাগজ পড়া তার নেশা। বিশেষ করে আজকালকার অন্তর্বিপ্লবোন্মুখ ভারতবর্ষ যথেষ্ট কৌতূহল সঞ্চার করে মনে। নেতারা বলেন—দুটি বছর অন্ততঃ অশান্তি হানাহানি কাটাকাটির মধ্য দিয়ে চললে তবে পরীক্ষার প্রথম ক্ষেত্রটি পার হওয়া যাবে। স্বাধীনতা অমনি আসবে না—মূল্য দিতেই হবে।

প্রশান্ত কাগজ পড়ছিল। শহরে—শহরের চারপাশে এ প্রভিন্সে ও

প্রভিন্সে ধর্ম্মঘট লেগেই আছে। যারা কলম পিষে দশটা-পাঁচটা বজায় করে—তারাও ধর্ম্মঘট করছে। সাপ্লাই আপিসের চল্লিশ হাজার কেরাণী ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক দিন কলম চালনা বন্ধ করেছিল—ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক এই তো সেদিন ধর্ম্মঘট সেরে কাজে যোগ দিয়েছে—ডাক আর তার বিভাগ—ওরাও কম দিন কাজ বন্ধ করে বুঝিয়ে দিলে না—যুদ্ধোত্তর যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে সক্ষম। রেঙ্গুন ডক ধর্ম্মঘট, তারপর সিঙ্গাপুর—জগৎটা শ্রমিক আন্দোলনে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। না—একঘেয়ে এই সব খবর ভাল লাগে না।

টিপয়ের ওপর কাগজখানা রেখে টিনের কৌটো থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে ধরালে। শীতকালের আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভাসছে। আবহাওয়ার রিপোর্ট বলে—পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে সামান্য বারিপাত হবে। উড়িষ্যার উপকূলভাগে মেঘগুলি অভিযান সুরু করেছে। বাতাসের কাঁধে চড়ে ভারতবর্ষের কোন্‌দিকে কতদূর ছড়িয়ে পড়বে তার মোটামুটি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

চেয়ারে পা তুলে দিয়ে অলসভাবে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়েই চলেছে সে। সোনালী মেঘে সন্ধ্যা নামবে এখনই—ব্রিজের আড্ডা বসবে নীচের হলঘরে। খেলার সঙ্গে চা—পান—সিগারেট আর গল্প—সন্ধ্যাটা রঙীন আলোভরা ফানুসের মত গভীর রাত্রির দিকে উড়ে যাবে। এই জীবনের তৃষ্ণাই কি তবে সাম্যবাদের অভ্যন্তরে লুকিয়ে ছিল? হাঁ—সার্থক-হতে না-পারার ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল একটি মতবাদ—অক্ষম ঈর্ষ্যার আক্ষেপ কিছুটা—আসলে প্রাসাদের শোভায় আর মোটরের পালিসে জড়িয়ে ছিল বাসনা। শৈশবে মা-ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনে রূপকথাপায়ী শিশু যেমন উত্তর জীবনের সমৃদ্ধ ছবি কল্পনায় এঁকে বাসনাকে কথঞ্চিৎ পূরণ করে—বহু কল্পনা সার্থক হলে আনন্দে দিশেহারা

হয়—তেমনি একটা ভাব—সার্থক হওয়ার ভাব—সিগারেটের প্রতিটি টানে —শিরায় শোণিতে সঞ্চরণ করে ফেরে আজকাল। শুভাকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ওর সেই চন্দ্র-সূর্য্য-বঞ্চিত বাড়ি—অথর্ব্ব দিদিমা আর রুগ্ন মা আর ছোট ভাইটি—ওদের নিয়েই কাটিয়ে দেবে সারাটি জীবন! বেচারী শুভা! পার্টির মীটিঙে ওর শাণিত যুক্তির সামনে প্রতিপক্ষ দাঁড়াতে পারে না—অথচ রায় সায়েবের সামনে ওর মত অসহায় ছুটি নেই! ওদের অত্যাচার উপেক্ষা করবার মনোবল ওর আছে…প্রচুর মনোবলই আছে।

প্রায়ই ইচ্ছা হয় শুভার ওখানে গিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দারিদ্র্যের অন্ধকূপ থেকে ওকে টেনে নিয়ে আসে এই আলোর পৃথিবীতে। বুদ্ধিমানেরা যদি জগতের সম্পদ সৃষ্টি না করলে তো পৃথিবীর গৌরব কি! বুদ্ধিমানেরা যদি স্বাস্থ্যে জ্ঞানে চারুকলায় সংস্কৃতির শিখাকে উজ্জ্বল করে না তুললে তো সভ্যতার উন্মেষ হ'ল কেন? সুখী হবার অধিকার সকলেরই আছে, শুভারও আছে। শুভাকে সে স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করবে।

দক্ষিণের বারান্দায় চেয়ারে পা তুলে আধ-বোজা চোখে চুরুটের দীর্ঘ-শিথিল টানের সঙ্গে চিন্তাগুলি কল্পনার মধ্যে রঙ লাগায়—বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালে সেই ঘর আর সেই পরিজন শুভার সেই দারিদ্র্যবহনের অটল সঙ্কল্প এতটুকু প্রশ্রয় দেয় না অলস কল্পনায়। ওর বাঁকা ঠোঁটের কোণে শাণিত এক টুকরা হাসি—বিদ্রূপে ঝলমল করে সর্ব্বদা। যুক্তির চেয়ে বড়—অনুনয়কে টুকরো টুকরো করে দেয় অনমনীয় সেই পাতলা হাসি, তার মত মারাত্মক অস্ত্র শুভার ভাণ্ডারে বুঝি দ্বিতীয় নেই। প্রশান্ত মনে মনে হার স্বীকার করে।

তবু প্রত্যহ মনে হয়—শুভা একবার আসবে না এখানে? প্রশান্তও পৃথিবীকে সৌন্দর্য্যশালিনী করতে পারে—প্রশান্তরও সৃষ্টিক্ষমতা কম নয়। ক'টি মাসই বা এই ফ্যাক্টরীর ভার নিয়েছে সে! চারিদিকের আগুনের

ছোঁয়াচ থেকে সে যে এটিকে রক্ষা করতে পেরেছে—এ কৃতিত্ব তারই তো। দু' দুবার ঢেউ উঠেছিল। পূজোর বোনাস আর মাগ্‌গি ভাতা বাড়ানোর দাবি। মালিক হাল ছেড়ে বললেন, যা ভাল বোঝ কর—কিছু টাকা মঞ্জুর করে দিচ্ছি।

অর্দ্ধেক মাইনে বোনাস—আর দু' টাকা মাগ্‌গি ভাতা বৃদ্ধি—ধর্ম্ম-ঘটের প্রগাঢ় ছায়া—ফ্যাক্টরীর পাশ কাটিয়ে গেল।

রতন কটন মিলের ম্যানেজার সর্ব্বেশ্বর বাবু বললেন,—কাজটা ভাল করলেন না প্রশান্ত বাবু। ঘি দিলেই আগুন জ্বলবে—বারো মাস ঘি ঢালবার ব্যবস্থা করতে পারবেন তো?

প্রশান্ত বললে, অসন্তুষ্ট লোক নিয়ে কাজের পড়তা হবে কেন সর্ব্বেশ্বর বাবু? গো-স্লো ট্যাকৃটিক্‌স্‌এ ব্যবসা চলে না কখনো?

কিন্তু লাভের মার্জ্জিন কমে এলে—আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে—

তাও কি ভাবি নি সর্ব্বেশ্বর বাবু? টাকায় টাকা লাভ—এ তো যুদ্ধের বাজারেই সম্ভব হয়েছে, টাকায় সিকি লাভ এ নিয়েও তো না বাঁচবার কথা নয়।

সর্ব্বেশ্বর বাবু রাগ করে কথা বলেছিলেন কিছু, প্রশান্ত রাগ করে নি। লাভের অংশ কমে গেলেই এদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। এরা দু' চোখের সীমানায় যতটুকু পড়ে তারই মাপজোক নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু দৃষ্টির দোষ, অহঙ্কারে আঘাত লাগলেই কেটে যায়, নতুন করে রফা-নিষ্পত্তি করে বেশি লোকসানই দিয়ে বসে এরা। সর্ব্বেশ্বর বাবু শ্রমিকদের দাবি পুরিয়ে এক দিন দুঃখ করেছিলেন, মিল তুলে দেব, এত কম লাভে ভূতের খাটুনি খেটে পোষায় না।

মিল তুলে দেন নি তিনি। ভূতের কাঁধে চেপে আছেন বলেই ভূতেদের নাচের ধকল তাঁকে সইতেই হয়।

নীচের হলঘরে আলো জ্বলে উঠল, কোলাহল সুরু হ'ল। চাকর এসে খবর দিলে বাবুরা এসেছেন।

সিগারেটের টিন আর চা নীচের ঘরে পাঠানোর হুকুম দিয়ে প্রশান্ত নেমে গেল।

সর্ব্বেশ্বর বাবু বললেন, এই শুনুন এঁদের মুখে, ব্যাটারা কি বলে?

লক্ষ্মী গ্লাস ওয়ার্কস্-এর ম্যানেজার কমল মিত্র বললেন, টোয়েনটি-পারসেণ্ট পে ইনক্রীজ প্লাস টোয়েনটি পারসেণ্ট এ্যালাউন্স। নিন ঠেলা, কি দিয়ে সামলাবেন সামলান!

আচ্ছা, বসুন স্থির হয়ে। একটা পরামর্শ করা যাক্।

পরামর্শ আর ছাই! সব ক'টি মিল, ফ্যাক্‌টরী এক জোট হয়েছে, ইউনিয়নের থ্রু দিয়ে নোটিশ দেবে পনেরো দিনের। একেবারে মোক্ষম কাছিমের কামড়। হতাশ সর্ব্বেশ্বর টিন থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে চেয়ারের হাতলে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন।

বেঙ্গল কটন মিলের ম্যানেজার অনন্ত দোবে বললেন, পুরা মাহিনায় ছুটি, ক্যাজুয়েল লিভ পনের রোজ, আউর মেডিকেল ট্রিটমেণ্ট ভি ডিমাণ্ড করছে।

প্রশান্ত বললে, ছুটি তো এ্যাডজুডিকেশনে যাবে, সেদিন মিল ওনার্স এসোসিয়েশনে ঠিক হ'ল না? আর মেডিক্যাল ট্রিটমেণ্ট? কেন ডাক্তার নেই আপনার মিলে?

আরে ডকৃটর আছে, দাওয়াই ভি আছে, লেকিন উ আদমী আচ্ছা দাওয়াই মাংতা হয়।

বেশ ত, তাও কিছু রাখবেন। লাভের একটা সামান্য অংশ দিলেই তো ভাল ডাক্তারখানা ও ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থা হতে পারে।

সর্ব্বেশ্বর বাবু মুখ ভার করে বললেন, পারে তো সবই মশায়, কিন্তু লাভের মার্জ্জিন কমে গেলে—ভূতের ব্যাগার খেটে লাভ!

প্রশান্ত হেসে বললে, ভূতদের যখন ছাড়াই যাবে না, আর আদায় করতে হবে ভাল কাজ, তখন ওদের ভাল থাকা আর ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি!

সর্ব্বেশ্বর রাগ করে বললেন, আপনার তো ফ্যাক্টরী নয়, কাজেই ও কথা বলবেন বৈকি।

প্রশান্ত বললে, মালিকের মনের ইচ্ছে না জানলে কি এ কথা বলবার সাহস আমার হয়! ভাল খাওয়া পরা আর ভাল থাকার দাবি আমার আপনার যেমন আছে, ওদেরও তেমনি আছে।

কমল মিত্র বললেন, আচ্ছা সে না হয় যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করা গেল, কিন্তু পে আর এলাউন্সের দাবি মেনে নিলে, এই সর্ব্বেশ্বর বাবু যা বললেন, ভূতের ব্যাগার দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না।

প্রশান্ত সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, কাল কি পরশু দুপুর বেলায়—একটা মীটিং কল করা যাক। তার আগে মিলের আয়ব্যয়ের হিসেবটা ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার।

অনন্ত দোবে বললেন, আমেরিকা মাল ছাড়লে তো মার্কেট তেজ থাকবে না—বিলকুল ডাউন হয়ে যাবে।

হাঁ—সে হিসেবও মোটামুটি কষতে হবে। তবে যাই বলুন—এ বাজার নামতে এখনও দু' বছর তো যাবেই।

সর্ব্বেশ্বর বললেন, তা হলেও তো বাঁচি। বাজার নামলে ব্যবসা তো গুটোতেই হবে। ভাববেন না একবার দাবি বাড়িয়ে আবার তা কমানো যাবে!

প্রশান্ত বললে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং যেমন তেমনি আয়ব্যয় চলবে।

একটা কম—আর একটা বেশি এ টপ্‌সিটারভি কণ্ডিশনে পৃথিবী চলতে পারে না।

ব্রিজের আসর বসল—অন্য দিনের মত জমল না। সকাল সকাল খেলা ভেঙে সবাই উঠলেন।

কমল মিত্র বললেন, হিসেব-নিকেশ করতে দু'চার দিন সময় নেবে—মীটিংটা আসচে সপ্তাহেই হোক।

সর্ব্বেশ্বর বললেন, তাই হোক—ওরা তো এখনও নোটিশ দেয় নি।

সবাই চলে গেলে প্রশান্ত আপন মনে খানিকটা হাসলে। মুঠো শক্ত করে রাখবার চেষ্টা কোথায় নেই? চার্চ্চিল, জেনেরাল স্মাটস্—থেকে চুনোপুঁটি সর্ব্বেশ্বরবাবু পর্য্যন্ত। সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদে আঁতাত চিরকালের। সাম্রাজ্যবাদ না টিকলে পুঁজিবাদ বাঁচে কি করে! একের সম্পদ-সৃষ্টির মূলে বহুর দুর্দ্দশা ও দাসত্ব—এ কলঙ্ক অপসারিত না হলে পৃথিবী সুস্থ হবে না। লোভের ত সীমা নেই—সে চায় আরও। অঙ্গুষ্ঠ থেকে পর্ব্বতপ্রমাণ। টলষ্টয়ের সেই গল্পটা মনে পড়ল—একটা লোকের কতটা জমি আবশ্যক। লোভের বশে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যে সব জমির উপর দিয়ে লোকটা ছুটে ছুটে চলল—মনে করলে সবই তার অধিকারে—তার দুরাশা তাকে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। সূর্য্যাস্তের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যেখানে সে থামল—চিরদিনের মত—সেই সাড়ে তিন হাত জমিটুকু তার দেহকে দিলে যথার্থ আশ্রয়। প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরে হাত বাড়ানোই ত অনধিকার। অথচ পুঁজিবাদ তা স্বীকার করবে না—সাম্রাজ্যবাদ ত যুদ্ধং দেহি বলে দাঁড়িয়েছে।

সুখী হবার অধিকার সকলের আছে—এ কথা স্বীকার করে প্রশান্ত—কিন্তু কারো সুখ কেড়ে নিয়ে সুখী হওয়া নয়। কারও দাসত্বে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করার বাসনাও তার নেই। এগুলি হ'ল দুর্ব্বল—

দাম্ভিক—ক্ষমতালোভীর বর্ব্বর বাসনা। লাভটাকে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া দরকার—হাতের পাঁচটি আঙ্গুল সমান না হতে পারে—একটা রুগ্ন আর একটা অত্যন্ত স্ফীত হবে কেন?

রোজই মোটর নিয়ে সে কলকাতায় যায়। মালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে। তিনি ওর কাজে অত্যন্ত খুসি। বলেন, আমরা বাণপ্রস্থের যাত্রী—কিছু শুনিও না। কারখানা আর শ্রমিক দুটি পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এটি সর্ব্বদা মনে রাখবে।

আপনার প্রফিট কমলে—

ন্যায্য প্রফিট পেলেই যথেষ্ট। আরে, যুদ্ধের কথা বাদ দাও—অবশ্য ইন্‌ফ্লেশনের ব্যাপারটা চট করে নষ্ট হবে না—তবে তোমার হাতে জিনিস নষ্ট হবে না—

কিন্তু আমি ত নতুন।

নতুন বটে—আনাড়ী নও। আয়ব্যয় আর চলতি বাজার ষ্টাডি করে নিয়েছ—কোন দিন তোমায় ঠকতে হবে না।

একে অগাধ বিশ্বাস বলা যায়। প্রশান্ত নিজের মতামত খাটাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। অর্থের সুপরিচালনায় মানুষের কল্যাণ। খেয়ে পরে সুস্থদেহে সে যদি কাজ করে যায়—সে কাজের ত্রুটি কোন দিক দিয়ে কোন মুহূর্ত্তেই প্রকাশ পাবে না। অভাববোধ হতে বিক্ষোভের যে সম্ভাবনা—সে উঠতে দেবেই বা কেন?

হেড আপিসটা ঘুরে প্রশান্ত এল শুভাদের বাড়ির সামনে। ঠিক সামনে নয়—কেননা সে গলি পায়ে-হাঁটার গলি—মোটর সেখানে অচল। বাঁধানো গলি চারবার পাক খেয়ে যেখানে শেষ হয়েছে—তারই একপ্রান্তে শুভাদের বাড়িখানা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল প্রশান্ত।

ভেতরে অনেক কণ্ঠের মিশ্রস্বর—যেমন উদ্দাম আলোচনা চলে

প্রত্যহ—তেমনি চলছে। শহরের আবর্জ্জনারূপী ওই বাড়িখানিতে বসে—ভারতবর্ষের অসংখ্য শ্রমিক ও দরিদ্রদের মুক্তি চিন্তা করছে যারা—এ তাদের বিলাস, না ক্ষেপামি! কয়েকটি মীটিঙে বক্তৃতা করলেই সাম্যনীতি চালু হবে না—কিংবা সিনেমার রূপালী পর্দ্দায় লাখ দেড় লাখ টাকার চুক্তি-নামার স্বাক্ষরকারিণী নায়িকার মুখনিঃসৃত মন-তাতানো বক্তৃতাও কোন ফল প্রসব করবে না। সে বক্তৃতা করতালির সমর্থনে প্রেক্ষাগৃহ কাঁপিয়ে তুলবে শুধু। সস্তা ভাব-বিলাসিতার অভিব্যক্তিতে কৌতুকলোভী পুঁজিবাদীর দল বক্সের টিকিট কিনে মুচকি মুচকি হাসবেন। স্বৈর-শাসনের আওতায় বসে আরও বহুকাল মঞ্চে বা ময়দানে এ ধরণের বক্তৃতা শুনে তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। এই সোজা কথাটা শুভারা বুঝতে চায় না। রাজনীতি মানেই তো যে কোন সুযোগ-সুবিধার সাহায্য নেওয়া একথা কত দিন বলেছে শুভা, অথচ কার্য্যক্ষেত্রে সে পিছিয়ে পড়ছে না কি?

কড়া নাড়বে কিনা ভাবছে—ওপর থেকে হাসির হল্লা গলির বুকে আছড়ে পড়ল। দীর্ঘ বিলম্বিত হাসি। হয় তর্কে কেউ হেরে গেল নতুবা পুঁজিবাদের ওপর কটাক্ষ করে কোন শাণিত মন্তব্য বর্ষিত হ'ল।

কে—কাকে চান?

ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে একটি ছেলে। হাতে তার বইয়ের গোছা—জামা কাপড়ে তার সত্যকার পরিচয় লেখা। বইগুলি কলেজের পাঠ্য হতে পারে, কমিউনিষ্ট লিটারেচারও হতে পারে।

প্রশান্ত উত্তর দেবার আগেই সে বললে, বিশেষ সুবিধা হবে না—এটা বুর্জ্জোয়াদের ক্লাবঘর নয়। সরে পড়ুন।

প্রশান্তর বেশবাস দেখেই ছোকরা আঘাত দেবার লোভ সামলাতে

পারলে না। ওর অপরাধ কি—বুদ্ধির অপরিপক্ক অবস্থায় সাম্য-দর্শন স্বভাবতঃই অসহিষ্ণু ও উগ্র হয়ে থাকে।

ছোকরা চলে গেলে প্রশান্তও ফিরে এল। ধনের অহমিকায় আর দারিদ্র্যের অহমিকায় তফাৎ কিছু নেই; দুইই দুর্ভেদ্য। আঘাত দেওয়াই হ'ল তার প্রকাশ ধর্ম্ম। মাঝখানের সেতুবন্ধন কেউই স্বীকার করে না। ভালবাসার প্রশ্ন তুললে—পুঁজিবাদী ভাববে এটা সহজাত সেবার প্রবৃত্তি—নিঃস্ব ভাববে ওটা বুর্জ্জোয়া বনবার একটি পরিচিত ভঙ্গি। কিছু দিন আগে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তারীতি ওই ধরণেরই তো ছিল।

মোটরের কাছে ফিরে এল প্রশান্ত।

একটি সুবেশ যুবক গ্যাসপোষ্টের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল—হয়ত প্রতীক্ষা করছিল প্রশান্তর। প্রশান্তকে দেখে সে এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললে, আপনাকে আমি চিনি—বত্রিশ নম্বর বাড়িটাতে দিন কয়েক আপনাকে দেখেছি। আর একদিন দেখেছিলাম মেয়েটির পক্ষ সমর্থন করে যেদিন রায় সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করলেন।

ঝগড়া?

যুবকটি হেসে বললে, রায় সায়েব তো আপনাদের সঙ্গে ভদ্রতা রেখে কথা বলেন নি। যাই হোক—ওই মেয়েটির সম্বন্ধে—

প্রশান্ত বিরক্ত হ'ল। তৃতীয় ব্যক্তির মুখে শুভাকে নিয়ে আলোচনা করতে সে রাজী নয়। মোটরের দুয়োরটা খুলে নিঃশব্দে সে তার ভেতরে আশ্রয় নিলে।

যুবক এগিয়ে এসে বললে, আপনি রাগ করবেন জানি—তবু ও যে সাংঘাতিক মেয়ে সে কি আপনি বুঝতে পারেন নি?

না—বুঝতে চাইনে। তীব্র ভৎর্সনায় প্রশান্ত প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। ড্রাইভার ষ্টার্ট দাও।

যুবক সিগারেট ফেলে দিয়ে হেসে উঠল হো হো করে। সে দিন তো পায়ে হেঁটে এসেছিলেন—আজ একখানা মোটর হয়েছে—তবুও বলছি সাবধান। শৈলেশ্বর বোসের তিনখানা মোটর আছে—

শৈলেশ্বর বোস! কথাটি চাবুকের মত সপাং করে প্রশান্তর পিঠে পড়ল। স্মৃতিশক্তি তার দুর্ব্বল নয়।

ড্রাইভারের পিঠের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, রাস্তার ওপিঠে গাড়ী থামিও তো। এক জনের সঙ্গে দেখা করে আসি।

২১

সুনীতি করের বাড়ির কাছে মোটর থামিয়ে প্রশান্ত গাড়ীর দুয়ার খুলতে না-খুলতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল বাড়ির ভিতর থেকে। মেয়েটির চলার ভঙ্গি পরিচিত—অথচ পিছন ফিরে পথ চলাতে ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। প্রশান্ত না নেমে ড্রাইভারকে বললে, ওই মেয়েটির পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে চালাও গাড়ী। হর্ন দেবার দরকার নেই।

গাড়ী পাশে আসতেই মেয়েটি একটু সরে চাইলে সে দিকে। সন্দেহ ভঞ্জন হ'ল।

শুভা।

শুভা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসলে, কমরেড প্রশান্ত! ব্যাপার কি?

বলছি। আসবে গাড়ীতে?

শুভা বললে, নিশ্চয়। কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা—! বলতে বলতে গাড়ীর দরজা খুলে প্রশান্তর পাশে বসে পড়ে হাসলে, আঃ— তো মার গাড়ীখানা ছোট বটে—বসার ব্যবস্থা চমৎকার।

প্রশান্ত বললে, আমার খবর বোধ হচ্ছে কিছু কিছু জান ?

কিছু না—সময় আমার এতই কম যে বন্ধুরা কে কোথায় কেমন আছেন জানবার বা জানাবার ফুরসৎ পাই নে।

প্রশান্ত বললে, একটু সময় মানুষের হাতে থাকা ভাল নয় কি ?

কি জানি! শুভা তার পানে চেয়ে রইল কয়েক মূহূর্ত্ত। পরে বললে, তুমি তো দেখছি ভালই আছ। আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খানিকটা সময় বাড়তি না থাকলে মানুষ ভালই থাকতে পারে না!

প্রশান্ত ওর কটাক্ষপাতকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে বললে, ভাল থাকা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার।

নিশ্চয়। শুভা কণ্ঠে জোর দিলে।

অথচ তোমাকে দেখলে তা মনে হয় না, শুভা।

জন্মগত অধিকার কিংবা জন্মান্তরগত সুকৃতি অর্থাৎ ভাগ্য সকলের তো সমান নয় কমরেড!

প্রশান্ত স্বরে জোর দিয়ে বললে, তুমি পরিহাস করলেও অস্বীকার করবে না যে চেষ্টার দ্বারা—বুদ্ধির দ্বারা মানুষ অবস্থার উন্নতি করতে পারে।

তা কেন করব—বাঃ রে! দৃষ্টান্ত দেখেও না বোঝে যারা—

যাই বল শুভা—ধন থাকাটা মানুষের অপরাধ নয়, কাউকে বঞ্চিত বা লাঞ্ছিত না করে যে উপার্জ্জন—

শুভা বললে, তোমার মোটরে বসে তোমার যুক্তি খণ্ডন করব এতটা নিরেট নই আমি।

প্রশান্ত বললে, এ ভাবে উপার্জ্জনকে অন্যায় বলবে তবু?

শুভা বললে, ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের বাদানুবাদ চলবে না কমরেড। তোমার ধন আছে ব্যাঙ্কে—দয়া আছে মনে—

সবাইকে সুখী করে সুখী হতে চাও—বেশ তো। ব্যক্তিটা তুমি ভাল—তবু কতটুকু তুমি! তুমি পুঁজিবাদকে ভাল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গলাতে পারবে না—

তোমরাও চেষ্টা কর না কেন এই ভাবে?

কমরেড—তুমি বুদ্ধিমান্ হয়ে এমন প্রস্তাব করবে ভাবি নি! 'আপনি আচরি ধর্ম্ম লোকেরে শিখায়',—সব কাজের এই হ'ল মূল নীতি। বড় খাঁটি কথা।

প্রশান্ত বললে, তা বলে—

শুভা বললে, তর্ক করব না—কমরেড। যে গুরুমশাই হুঁকো টানতে টানতে ছাত্রদের তামাক সেবনের অপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, তাঁর বক্তৃতাকে কি বলবে তুমি?

কিছুই বলব না। তাঁর আচরণটা অভ্যাসগত কিন্তু অভিপ্রায়টি নিঃসন্দেহে মহৎ।

শুভা বললে, ছাত্ররা অল্প বুদ্ধি—আর অনুকরণপটু, আমাদের মত ঝুনো আর ঝানু হলে অবশ্য—

প্রশান্ত বললে, চল, একটা ভাল রেষ্টুরেণ্টে বসা যাক। এভাবে কথা কাটাকাটি করে তোমাকে বোঝাতে পারব না।

চল। কিন্তু পেটে কিছু পড়লেই মাথার গোলযোগ থামবে—আশা করো না।

অভিজাত-শ্রেণীর একটা রেষ্টুরেণ্টে পর্দ্দানশীন হয়ে বসলে দু'জনে। চা এল—আনুষঙ্গিক এল এবং সেগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য কাউকে অনুরোধ করতে হ'ল না। খাওয়া চলল অত্যন্ত সহজ ভাবে—আর সেই কারণেই আলাপের স্রোত আটকে গেল। মোটরের গতির তালে—পাশাপাশি বসে যে কথা সহজে বলা যেত—নিশ্চল চেয়ারে

মুখোমুখি বসে তার সূত্র কিছুতেই টানা গেল না। মনে হ'ল—কথা শেষ হয়ে গেছে। দুই বিপরীত স্রোত এক জায়গায় মিলেছে—একটুখানির জন্য—আবার তারা বিপরীত গতি নেবে। তাদের মিলনে যে শব্দ উঠছে তা প্রীতিসম্ভাষণ নয়—পথের কথাও নয়—ওটা সংঘাতই। অনৈক্যজাত সংঘাত—শব্দটাকে প্রতিবাদ বলাই শোভন বা সঙ্গত।

খাওয়া শেষ হলে—অকস্মাৎ প্রশান্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। সিগারেট বার করে বললে, তোমার অসুবিধা হবে না তো?

শুভা বললে, আগে তো হয় নি—

প্রশান্তর রক্ত এই প্রত্যুত্তরে দ্রুত প্রবাহিত হ'ল। সিগারেট রেখে ও শুভার একখানি হাত চেপে ধরে কোমল কণ্ঠে বললে, আগের কথা সব তোমার মনে আছে?

শুভা বললে, আছে কিছু কিছু।

আমি কি ভালবাসি—না বাসি—

কমরেড, বড্ড আপসেট হয়ে গেছ! আগের কথা মনে থাকলেই ভাবাবেগে ভেসে যাওয়া চলবে না। হাত ছাড়াবার চেষ্টা মাত্রও করলে না।

ঘরের আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। হাতের উত্তাপে ভাষা সঞ্চার করবার চেষ্টা করলে না প্রশান্ত। ধরা না-দেবার লীলায় তার প্রকাশ সহজ হয়—সুন্দর হয়। বিনা বাধায় তাই বোধ হচ্ছে নিরুত্তাপ—বিস্বাদ। একটি নিঃশ্বাস মোচন করে ও শুভার হাতখানা ছেড়ে দিলে।

শুভা সহজ ভাবেই বললে, আরও কিছু অর্ডার দেবে—না বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়বে?

কি খাবে বল? নিরুৎসুক স্বরে প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

একটু হাওয়া—ফ্যানের নয়, প্রকৃতির। বলে শুভা হাসলে।

বিল মিটিয়ে বাইরে এল প্রশান্ত। বললে, তোমায় পৌঁছে দেব ঠিকানায় ?

ধন্যবাদ। ট্রাম বাস যা হয় একটা পেয়ে যাব।

ও পিছন ফিরতেই প্রশান্ত নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগল। শুভা তাকে কি ভাবলে ? নিবিড় সঙ্গ পাবার জন্য ওর এই আকুল কামনাকে কি চাটুবাদ বলে উপেক্ষা করলে শুভা ? আর পাঁচ জনের মত সে-ও কি শুভার কাছে সাধারণ আলাপিত একজন ? তাদের অন্তরঙ্গতায় কোন দিন কি অনুরাগ-সিক্ত কৌতূহল ভেসে ওঠে নি ? নিকটে টানবার আয়োজনের মধ্যে ছিল দেহগত আকর্ষণ—স্থূল মাংস-কামনার আবেগ ?

না—সোজা উত্তর চায় সে। দলগত নীতি—বা সমাজগত বাধা কিংবা ভালমন্দ-মনে-করা-করির সঙ্কোচ এসব একপাশে ঠেলে একটি মাত্র সহজ সোজা প্রশ্ন করবে ওকে—হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বা আবেগ-উচ্ছ্বাস যাই বলুক—একটি মাত্র প্রশ্ন করবে—ভালবাস আমাকে ?

মোটরের জানালা দিয়ে পিছন দিকে চাইলে প্রশান্ত। শহরের রাজপথে মানুষের আর যানবাহনের ঢেউ ঘন হয়ে উঠছে—চেনা মানুষের কূলে দৃষ্টিকে ভেড়ানো দুঃসাধ্য বটে।

১

কয়েকখানা জরুরি চিঠির মধ্যে—একখানি এসেছে বাড়ি থেকে। উপার্জ্জনের ভেলায় চড়ে আবার সে স্নেহ-নদীর উপকূলে এসে পৌঁছেছে। বাবা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে থাকলেও কেমন একটি দৃষ্টিতে স্বস্তির ভাব—মা তো আনন্দে চোখের জল ফেলে ভগবানকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ছেলেকে সংসারের জোয়ালে পাকাপাকিভাবে জুড়ে দেবার পরামর্শ ওঁরা

বহুদিন থেকেই আঁটছেন—তবে লাখ কথায় নিধি মেলানোর যোগাযোগ সহজে তো আসে না। আজকের চিঠিটায় বিয়ের কথা নেই—আছে বিপত্তির কথা। কলকাতা-নোয়াখালি-বিহারের প্রতিক্রিয়া ওদের গ্রামেতেও সুরু হয়েছে। ভয়াবহ রকম কিছু ঘটে নি—তবে যে কোন মুহূর্তে কিছু ঘটাও বিচিত্র নয়। প্রতিবেশীরা পরস্পর সন্দেহাকুল হয়ে বিনিদ্র রাত্রিযাপন করতে আরম্ভ করেছে। দুই পাড়ার সীমানা থেকে যথাসম্ভব লোকজন ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে। গরু ছাগল বাসন-কোসন—সঞ্চিত চাল ডাল আর মেয়েছেলে সরে যাচ্ছে পাড়ার ভিতরে। কোলাহল-মুখরিত বাড়িগুলি দিনে রাত্রিতে খাঁ-খাঁ করে। চুরি হবার ভয়ে রাত্রিতে যে-কেউ একজন বাড়ির লোক শূন্য বাড়িতে শুয়ে থাকে। দিনের বেলায় দেখা হলে এ ওকে শুধোয়, আচ্ছা ভাই—কারা এসব করছে বলতে পারিস ?

ভাই মাথা চুলকে বলে, নইলে কলিকাল আর বলেছে কেন !

কালের দোহাই দিয়ে আসল সমস্যা এড়ানো যায় না—রাত জেগে দু'পক্ষই বহুতর গুজব সংগ্রহ করে আর দিনে দিনে তা মনের অন্ধকারে লূতাতন্তু বিস্তার করে চলে। নানাবিধ মারাত্মক অস্ত্র—হাতবোমা বর্শা এসিড রামদাও লাঠি তীরধনুক কিনা সংগ্রহ করছে এরা। অগ্নিগর্ভ অরণি কাষ্ঠে সামান্য ঘর্ষণ মাত্রই দাবানল জ্বলে উঠবে।

বাড়িটা ওদের প্রান্তদেশে—তাই এত কথা পত্রে জানিয়েছেন মা। প্রশান্ত যেন শীঘ্র এসে তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

সেইদিন সন্ধ্যাকালেই প্রশান্ত বাড়ি রওনা হ'ল।

২২

বাহ্যতঃ গ্রামখানি আগেকার মতই আছে—মানুষের মুখে ভাসছে উদ্বেগ। বর্গীর হাঙ্গামার কথা কেউ বইয়ে পড়েছে—কেউবা গল্প শুনেছে—কেউ কেউ শোনেই নি—অথচ মনে হচ্ছে তেমনতর দুর্দ্দিনই বুঝি সমাগত! তারা এসেছিল বাইরে থেকে—দিনের কার্য্যতালিকায় আর রাত্রির নিদ্রায় সর্ব্বক্ষণব্যাপী ব্যাঘাত দিতে পারে নি। এ হ'ল কি? সসর্প গৃহবাসের মত লাগছে গ্রামখানিকে।

পথের দু'জায়গায় দেখলে গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই হচ্ছে। ছেলেতে বুড়োতে টানাটানি করে ট্রাঙ্ক থলে-বোঝাই বাসন আরও কি সব জিনিস গলিপথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভিন্ন পাড়ায়—নিরাপদ স্থানে। এইভাবে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে সব?

প্রশান্ত গাড়ী থেকে নামতে না-নামতেই পাড়ার যুবাছেলেরা ছুটে এল। বললে, আপনি এলেন—তবু সাহস হ'ল আমাদের।

বৈঠকখানায় এসে বললে, এ পাড়ার চাঁদা বিশেষ কিছুই ওঠে নি—মালপত্তরও যোগাড় নেই। আপনি এসেছেন—ব্যবস্থা করে যান।

প্রশান্ত বললে, রিলিফ ফাণ্ড খুলছ নাকি?

রিলিফ ফাণ্ডই বটে! বলে কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে ফিস্ ফিস্ করে কি বললে।

প্রশান্ত বললে, এই ভাবে বাঁচবে? ছি!

কি করব—ম্যাজিষ্ট্রেট বন্দুক জমা দেবার হুকুম দিয়েছেন, কেউ বাড়ি চড়াও হলে আত্মরক্ষা করব কি দিয়ে?

যাতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হয় তেমন ব্যবস্থা কর নি কেন? দু'পক্ষ মিলে—

আজ্ঞে পিস-কমিটি একটি আছে—তবে তাতে বিশ্বাস কারও নেই। লোক-দেখানো কখনো বারোয়ারি তলায়, কখনো দরগা তলায় তার মীটিং বসে—বক্তৃতা হয়, কিন্তু ঐ পর্যন্ত !

এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে দুম করে একটা পট্‌কা ফাটার শব্দ হ'ল। দক্ষিণ দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে দুম্ দুম্ করে গোটা দুই শব্দ উঠল।

যুবকটি বললে, শুনছেন তো? বোমার আওয়াজ। রাত ভোরই শুনবেন আওয়াজ।

সুতরাং এখানে শান্তির কথা বলা নিরর্থক। দু'পক্ষের এত আয়োজন—শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে না পৌঁছে কি নিরস্ত হবে! তাই মুখে হুম্‌কি আর বিনয়—প্যাচ কষাকষির কৌশল ছাড়া কিছু নয়। গত মহাযুদ্ধের আগে এগুলি পোষাক বদল করে রাজনীতির ক্ষেত্র কর্ষণ করে নি কি?

প্রশান্ত বললে, ওবেলা কথা বলব তোমার সঙ্গে।

মায়ের পায়ে প্রণাম সেরে বাবাকে দেখতে গেল। তিনি বেশির ভাগ সময় শুয়েই কাটান। শরীরে মেদ বেড়েছে—মনটাও কেমন যেন বিক্ষিপ্ত। কোন কথার যোগসূত্র টেনে রাখতে পারেন না।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন?

দুর্গামোহন ললাটে তর্জ্জনী ঠেকিয়ে হাসলেন। বললেন, গাঁয়ের কথা শুনেছ সব?

শুনেছি। আপনি কি কলকাতায় যেতে চান?

কলকাতায়? কেন? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন। না-না, তোমার গর্ভধারিণীকে আর বোনটিকে নিয়ে যাও—আমি কোথাও যেতে পারব না।

আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?

কেন—ভগবান নেই ? তিনি করবেন সব।

বলতে বলতে শব্দ করে হেসে উঠলেন, তোমরা বিশ্বাস কর না কিছুই—কিন্তু তিনিই সব করান—আমরা নিমিত্তমাত্র।

প্রশান্তর ইচ্ছা নয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বিভীষিকা বাড়ায়। সে আর কোন কথা বললে না এ সম্বন্ধে।

বিরাজমোহিনী বললেন, ওর ভয় বাড়ি ছাড়লেই এখানকার ইঁট কাঠ কিছুই থাকবে না। কিন্তু বাবা—আপনি বাঁচলে তো বিষয়সম্পত্তি! মথুরার মাও তো যাব যাব করছে। উত্তুর পাড়ায় জিনিসপত্তর সব পাঠিয়ে দিয়েছে—চেষ্টা করছে একখানা বাড়ি ভাড়া নেবার। ওরা চলে গেলে পাড়ায় রইলই বা কে! কার ভরসায় থাকব বল ?

মাকে আশ্বস্ত করে প্রশান্ত বললে, সব ঠিক হয়ে যাবে—ভেব না মা। ভয় করলেই ভয়।

মা বললেন, তুই এসেছিস—যা ভাল ব্যবস্থা হয়—কর্।

জলযোগ করে ও বেরিয়ে পড়ল পাড়ায়। বহুক্ষণ ধরে এ পাড়া ও পাড়া ঘুরল—হিন্দু মুসলমান বহু লোকের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলাপ করলে। দুই দলই ভীত-সন্ত্রস্ত। রাজনীতির জটিল বিষয় এরা বুঝতে চায় না—দলগত প্রীতিবিদ্বেষেও বিচলিত নয়। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ—ব্যবসায়গত লাভক্ষতি বা সমাজগত দুর্নীতিঅপবাদ এইটুকুতেই ওরা কাঁদে—আনন্দ করে—উত্তেজিত হয়। বহুকাল পাশাপাশি বাস করে—কখনও গালাগালি—কখনও মাথা ফাটাফাটি হয়ে গেছে—আবার একদিল হয়ে গলাগলি করার সুযোগও এসেছে অচিরাৎ। ঝগড়াবিবাদের মধ্য দিয়ে যে ব্যবধান গড়ে ওঠে—তার তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন নয়—কিন্তু এই আকস্মিক বিভেদ—এর মাথামুণ্ড খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। প্রায় সবাই বলছে, এমনটা হ'ল কেন বাবু ?

প্রশান্ত মাতব্বর লোকদের কাছে গেল। এঁদের কেউ কেউ শান্তি-কমিটিতে আছেন।

বললে, আপনারা এক কাজ করুন। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছেড়ে দিন।

সবাই অবাক হয়ে বললেন, সে কি—গান্ধীজী পর্য্যন্ত বলেছেন—

প্রশান্ত হাসলে। বললে, আপদ বাড়িয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তিনি দেন নি। অস্ত্রশস্ত্র বাড়িয়ে যদি শান্তিরক্ষা চলতো তো এত বড় যুদ্ধটা হ'ত না।

মিছেই যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা। তার কথায় সায় দিলেন কেউ কেউ—কেউ বা বললেন, তুমি ছেলেমানুষ—কতটুকু জান জগতের? স্বয়ং ভগবান জীবজন্তুদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন—আর মানুষকে বলেছেন—কিছু করো না—পড়ে পড়ে মার খাও।

অন্য পক্ষেরও ঐ কথা। বললে, ওরা কলকাতা থেকে গুণ্ডা আনিয়েছে—সে দিন বাজারে দেখলাম ইয়া গালপাট্টা—মুখখানা ঢাকা—এদেশে কোন দিন দেখি নি ওদের।

দু'দলকে এক করে আলোচনা চালাবার চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল। যারা রটনা করছেন রঙ ফলিয়ে—তাঁরা দূরেই রইলেন—যারা এক জায়গায় মিললেন—তাঁরা বললেন, ঠিক কথাই তো—এ ভাবে মানুষ বাস করতে পারে পাশাপাশি? মিটমাট করে ফেলাই উচিত।

কিন্তু মিটমাট করবে কে? কোন পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে কেউ এগিয়ে এলেন না। বললেন, ওরে বাবা, একলার কি সাধ্যি আমার।

বুড়োরা বললে, ছেলেরা মানে না আমাদের।

ছেলেরা বললে, বুড়োদের মত উস্‌কানি দিতে দ্বিতীয় কেউ নেই—ওদের সরান আগে পিস-কমিটি থেকে।

সুতরাং ক'দিন চেষ্টা করেও গ্রামের অবস্থা উন্নত করা গেল না।

পুলিসের পাহারা বসেছে—একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী হয়েছে—তবু ভয় আর সন্দেহ ঘুচছে না মন থেকে।

নন্তু ঠাকুরদার চণ্ডীমণ্ডপে আজকাল ভিড় বেশি। বুড়ো-বুড়ীরা দু'বেলা এসে সাধছে—চলুন রায় মশায়—দুর্গা শ্রীহরি বলে বেরিয়ে পড়া যাক। যা খরচপত্তর লাগে আমরা দেব। যে ক'টি দিন আছি, অশান্তি সহ্য হয় না—তবু মনের শান্তিতে ঠাকুরদেবতা দেখে বেড়ানো যাবে।

ঠাকুরদা হেসে বলেছেন, এমনি করেই পরীক্ষা করেন ভগবান। ভয় দেখিয়ে বলেন—ওরে আমি আছি, আছি। সম্পদে কে আর তাকে ডাকে বল!

প্রশান্তকে দেখে বললেন, কি দাদু শান্তির দূতিয়ালী নিয়ে নাকি?

না দাদু—এ যুগের দূতিয়ালী ভোল বদলেছে, সে কালের মন-গলানো কথা মনের বাইরেই পড়ে থাকে।

দাদু বললেন, যা বলেছিস নাতি—লাখ কথার এক কথা! আমরা কেষ্টযাত্রা দেখে কেঁদে বুক ভাসিয়েছি—তোরা এক কথায় তা ডিস্‌মিস্ করে বায় দিস্ রাবিশ। আমাদের কালে মন ছিল বুকে—তোদের মন উঠেছে মগজে। তোদের নিস্তার নেই।

প্রশান্ত বললে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি দাদু। কিন্তু ফ্যাসাদ এই- এ কালে তোমরাও রয়েছ—আমরাও রয়েছি—মাঝখানে কোন বাঁধন নেই।

দাদু বললেন, বাঁধন দেবার চেষ্টা কর—

না দাদু, চেষ্টা করে ফল হবে না। জগতে বার বার যত অশান্তি দেখা দিয়েছে—তার কোনটিই তো চেষ্টার দ্বারা শেষ হ'ল না। যুদ্ধের কারণ বা কুফল সবাই বোঝে—অথচ যথানিয়মে যুদ্ধে যোগও দিচ্ছে সকলে। কেন এমন হয়?

দাদু বললেন,—তোদের রাজনীতিটিতি বুঝি না ভাই—তবে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য বার বার যে যুদ্ধ হ'ল—ত্রেতায়—দ্বাপরে—তার মূল কথা হ'ল দুষ্কৃতের বিনাশ। এক দুষ্কৃত বিনাশ হলে অন্য দুষ্কৃত যে জমবে না এমন কথা নয়—তাই সম্ভবামি যুগে যুগে। এই হচ্ছে জগতের সৃষ্টিলীলা।

তোমার সৃষ্টিলীলাকে প্রণাম করি দাদু—।

দাদু হাসলেন, তোমাদের কল্যাণ-বুদ্ধি দিয়েও এ অমঙ্গলকে ঠেকাতে পারছ না তো ভাই—

আমাদের চেষ্টাকে শেষ চেষ্টা মনে করো না দাদু—

দূর বোকা—তা মনে করলে তাঁর সৃষ্টির রইল কি? সৃষ্টিতত্ত্ব যত সোজা মনে করিস তা নয়।

প্রশান্ত বললে, সৃষ্টিতত্ত্ব আর একদিন শুনব দাদু—আজ সময় কম।

দাদু হো হো করে হেসে উঠলেন, আচ্ছা, আচ্ছা। তবে ও তত্ত্ব শুনে বোঝা যায় না ভাই—আর বুঝলেও শোনানো কঠিন।

মলয়ের মা ওর হাত দুটি ধরে কাঁদলেন, হাঁ বাবা, তোমার সঙ্গে দেখা হয় না তার? বলবে তাকে—মাকে এত কষ্ট দিলে ভাল হয় কোন ছেলের? বুড়ো বয়সে জাত খোয়াতে পারি নি—এই হ'ল গিয়ে আমার দোষ।

ওঁকে আশ্বস্ত করে বাড়ি ফিরে এসে মাকে বললে, কোন ভয় নেই মা, বাড়িতেই থাক। কলকাতা ত বেশি দূর নয়—খবর পেলেই আসব আমি।

গ্রাম আর সে গ্রাম নেই। পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা মুছে যাচ্ছে—নূতন কিছু আশ্রয়ের মত অন্ততঃ গড়ে ওঠেনি। ট্রান্‌জিশন পিরিয়ড। কি

ভীষণ এই অন্তর্ব্বর্ত্তী কাল! - সমাজ-অনুগত মানুষগুলিকে জোর করে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে টেনে আনা হচ্ছে। কে টানছে? সুবিধাবাদীরা? মহাকাল? যুগধর্ম? যে-ই টানুক—এর গতি রোধ করা যাবে না। দুটি প্রধান শক্তি- শক্তিসংঘের নেশায় পৃথিবীর দেশ-মহাদেশের নাড়ীতে দিচ্ছে টান। অভয়—হুঙ্কার—স্বস্তিবাণী আর পরমাণুশক্তি—এই নিয়ে চলেছে খেলা। ইউরোপ— ভূমধ্যসাগর - মধ্যপ্রাচ্য—ভারতবর্ষ—দ্বীপময় ভারত, আরব- চীন—জাপান—দুটি শক্তির অক্ষক্রীড়ার ছকে ছড়িয়ে আছে। খেলা চলেছে পুরোদমে। কিন্তু এই খেলাই যে শান্তির চূড়ান্ত ফলাফল প্রসব করবে—সে ভবিষ্যদ্বাণী করবে কে? নতুন করে ভাঙ্গাগড়ার মুখে পুরাতন পৃথিবী পাক খাচ্ছে—বিদীর্ণ হচ্ছে-- ছিঁড়ে গুঁড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে মহাব্যোমে। সূর্য্য টানছে পৃথিবীকে—পৃথিবী টানছে চন্দ্রকে-- উপগ্রহে বেষ্টিত হয়ে গ্রহগুলি চাইছে শক্তিমান্ হতে। অবিভাজ্য অণুর অহঙ্কার চূর্ণ করেছে মানুষ- মানুষ আজ ধ্বংসের দেবতা। তবু সে শিব হতে পারে নি; সৃষ্টি সংহারের ভাবকেন্দ্রে জগৎকে স্থিত করে রাখবার চেষ্টাই হচ্ছে নূতন পৃথিবী তৈরির ইতিহাস—দাদুর ভাষায় সৃষ্টিলীলা।

আজকার মানুষ সেই লীলার রস আস্বাদ করতে পারছে কি?

২৩

এক দিন সুচিত্রা বললে, কই, বললে না ত কি ধরণের কাজ আরম্ভ করেছ তোমরা?

মলয় বললে, বলার চেয়ে প্রত্যক্ষ দেখতে চাও কি?

চাইব না কেন?

সংসার ভেঙে দিতে হবে—ষ্টাইক দি টেণ্ট সুচিত্রা।

সুচিত্রা বললে, ভাল করে না বললে বুঝব কি করে?

মলয় বললে, কাগজ তো পড আজকাল রোজই। পৃথিবীর নানা দেশে নানা রকমের গোলমাল—তবু এমন কোন মহৎ চেষ্টার খবর পাও না কি—যাতে করে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে?

সুচিত্রার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, পাই সে খবর। কিন্তু সে কি সার্থক হবে?

সন্দেহ রাখলে বিশ্বাস আনা কঠিন। এক জনের চেষ্টা- পাঁচ জনের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হলেই কাজ সহজ হয়ে আসে। তুমি ত দেখি কাগজ হাতে পেলেই মহাত্মাজীর প্রার্থনার অর্থগুলি মন দিয়ে পড।

সুচিত্রা বললে, পড়ি এই কারণে – ওগুলিতে স্পষ্ট সত্যকে খুঁজে পাই।

মলয় হেসে বললে, স্পষ্ট সত্য খুব কঠিন মনে হয় বুঝি? আর খুব তিক্ত?

সুচিত্রা বললে, মন আমাদের তৈরি নয় বলেই কঠিন ঠেকে।

তারপর নোয়াখালিতে গিয়ে কাজ আরম্ভ করার দায়িত্ব ও বিপদ আছে—এও জান ত?

সুচিত্রা বললে, জীবনে কোন পরীক্ষাই তো দিলাম না; বইয়ে আর কাগজে লোকের দৃষ্টান্ত পড়ে—ভাল ভাল করলাম শুধু।

মলয় বললে, সংসারের মায়া কাটিয়েছ বুঝি—তাই ইচ্ছে হয়েছে মানুষের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে?

দূর, সংসার ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায়। মহাত্মাজী তো সংসার ছাড়তে বলছেন না কোথাও। সত্য আর ভালবাসা এই মূলধন নিয়েই তো দাঁড়িয়েছেন পরীক্ষা দিতে।

তবু তোমাদের সন্দেহ হয়—এ পরীক্ষা কি সফল হবে?

তা হয়।

কেন হবে সন্দেহ? সত্য যদি জয়ী না হয় তার শক্তি কমে গেল এ ভাববেই বা কেন? কাজকে যথার্থ ভাবে পেতে হলে কাজকেই নিতে হবে বেছে। আর কাজের আনন্দ শক্তি—সে-ও তো কাজের মধ্যেই রইল। যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল বলে—তাঁর মহৎ বাণীকেও যে হত্যা করা হয়েছিল এ ধারণা ভুল।

সুচিত্রা বললে, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফলাফলে লক্ষ্য রেখে কাজ করে। খ্রীষ্টের মহৎ বাণী পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে, আশ্রয় পাচ্ছে না—এও তো দেখছি আমরা।

মলয় বললে, তা হ'লে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভার কথাগুলি তোমার ভাল লাগে কেন?

সুচিত্রা বললে, হয়তো একটা দেহের মধ্যে দুটো মানুষ বাস করে এইজন্যে। একটা মানুষ চায় সংসারের লাভ-ক্ষতির চুলচেরা বিচার করে তাতে জড়িয়ে থাকতে—আর একটা মানুষ সত্যের কষ্টিপাথরে ফেলে সেগুলিকে যাচাই করতে চায়।

সংসারের লাভক্ষতির দিকটা কি সত্যের দিক নয়?

সুচিত্রা হেসে বললে, আমি পণ্ডিতলোক নই—পাঁতি দিতে পারব না। বাস্তব দিককে অস্বীকার করে মঙ্গল চেষ্টা বেশি দূর এগোয় না—এই তো দেখি। ধর্ম্ম নিয়ে যারা পাগলের মত হানাহানি কাটাকাটি করে—তাদের কাছে প্রকৃত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করাই হ'ল বাস্তবকে ঘোলা চোখে দেখা।

প্রকৃত ধর্ম্মের ব্যাখ্যাটি কি?

মলয়ের কথায় সুচিত্রা কৃত্রিম ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে বললে, যাও—জানি না।

মলয় হো হো করে হেসে উঠল। বললে, এই ত, এত অল্পে রাগ করলে মানুষের সেবা করবে কি করে!

সুচিত্রা বললে, মানুষের সেবা করব—এত বড় অহঙ্কার আমার নেই।

ইস্—ক্রমশঃ বিনয়ে নুইয়ে পড়লে যে! সুচিত্রা রাগ করে পালাচ্ছে দেখে মলয় খপ করে ওর হাত ধরে বললে, ধরে নিলাম মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাই হ'ল মানুষের ধর্ম্ম—আপাততঃ সে ধর্ম্ম পালনে তুমি অবহেলা করছ।

সুচিত্রা ভ্রূকুটি হেনে বললে, কিসে?

মানুষ যাতে শান্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে—যাতে শান্তিতে বাস করতে পারে—যথাসময়ে স্নান আহার উপাসনা স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে পারে—এসব দেখা প্রত্যেক সৎ প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য নয় কি?

তাতে কি!

তাতেই তো সব—সকালের রোদ চড়েছে কতখানি এ দেখেও যে প্রতিবেশী স্বাস্থ্য পালনের নিয়ম না মেনে মনুষ্য-ধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ছে—তাকে সচেতন করে দেওয়া যায় যদি—

সুচিত্রা বললে, থাম—আর ব্যাখ্যানায় কাজ নেই! সামান্য ক্ষিদে সহ্য করতে পারে না যারা তারা আবার সেবা করতে যায় কোন্ সাহসে?

নিতান্তই দুঃসাহসে।

হাসতে হাসতে সুচিত্রা ষ্টোভ জ্বেলে ফেললে। খানিকটা হালুয়া আর চা করে মলয়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, চা খেয়ে চল বেড়িয়ে আসি।

আপত্তি নেই।

ব্লকটার বাইরে আসতেই প্রশান্তর সঙ্গে দেখা। প্রশান্ত হাত তুলে ওদের ডাক দিয়েছে।

বললে, তোমাদের খুঁজছিলাম—চল বাসায়।

সুচিত্রা বললে, আর কোটরে নয় ভাই—পার্কে বসা যাক।

কাছাকাছি একটা ছোটমত পার্ক ছিল—তিন জনে তারই মধ্যে প্রবেশ করলে। যুদ্ধ-পূর্ব্বযুগের শ্রী পার্কের কোথাও চোখে পড়ে না—এ'কেই তো শ্রী বলতে কলকাতার পার্কের কোনটিতে নেই। অবিচ্ছিন্ন শব্দ ও ধূলিধূমের মধ্যে প্রকৃতির নির্জ্জনতা বা শ্রী খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। যুদ্ধোত্তর যুগে এগুলিকে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা হিসাবে ধরে নিয়ে খানিকক্ষণ বক্তৃতা দেওয়া চলে। শ্লিট ট্রেঞ্চের প্রয়োজন মিটে যেতেই সেগুলিকে কবর দেওয়া হয়েছে—তবে মাটিটাকে সমান করে দেবার বা সে মাটিতে ঘাস বুনবার কি মরসুমি ফুল ফোটাবার চেষ্টা কেউ করেন নি। বেঞ্চি-গুলিও পায়া ভাঙা ও পিঠ ভাঙা অবস্থায় কোন রকমে খাড়া হয়ে আছে। তারই একটিতে তিন জন এসে বসলে।

প্রশান্ত বললে, তোমার বাড়ি যাওয়া উচিত মলু। জ্যেঠিমার অবস্থা দেখলাম খুব খারাপ—তাঁকে দেখবার লোকেরও দরকার।

কেন, মেজ বউদি ?

তিনি তো বাড়িতে নেই—মেজদা বাসা করে তাঁদের কলকাতায় এনেছেন। তা ছাড়া দেশের অবস্থাও ভাল নয়।

সুচিত্রা বললে, মা আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুরপো ? কি বললেন ?

দেশের অবস্থা সংক্ষেপে জানিয়ে প্রশান্ত বললে, তোমার মা তাঁর আত্মীয়বাড়ি উঠবেন ঠিক করেছেন—কেবল বড় বউদির ব্যবস্থা—

সুচিত্রা বললে, আমরা যাব।

প্রশান্ত চলে গেলে মলয় বললে, যেজন্য আমরা বাড়ি ছাড়লাম চিত্রা—

সুচিত্রা বললে, এক একটি মুহূর্ত্ত এত বড় হয়ে আসে যখন অন্য মুহূর্ত্তের ঘটনাগুলি মুছে যায়। কেন আমরা বাড়ি ছেড়েছি সে কথা এখন থাক। একটি নোয়াখালিতে আমরা সবাই ভিড় করে নাই-বা গেলাম!

ঠিক বলেছ—আমার গ্রামেও তো যথেষ্ট কাজ রয়েছে। বলে সুচিত্রার হাত ধরে ও টানতে আরম্ভ করলে।

সুচিত্রা বললে, আঃ আস্তে—তোমাদের সঙ্গে আমরা দৌড়ে পারব কেন?

মলয় বললে, আমরা হাউই—তোমরা হচ্ছ তার বারুদ। ঠেলে দিয়েছ যখন তখন তাল রাখবে নাই-বা কেন?

আঃ, তবু টানে! এটা পথ না?

মলয় হেসে বললে, আমরাও তো যাত্রী।

২৪

ব্যারাকে ফিরতেই দেখে—মেজদা তালা-লাগানো দোর-গোড়ায় পায়চারি করছেন। মেজদাকে দেখেই মলয়ের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। প্রশান্ত এই মাত্র বলে গেল, দেশের অবস্থা ভাল নয়—মেজদা কোন মন্দ খবর নিয়ে আসে নি তো?

মেজদা।

মেজদা ফিরে চাইলেন—মুখের ভাব তাঁর একটুও কোমল বোধ হচ্ছে না। কোন কথা না বলে প্রখর সন্ধানী-দৃষ্টি দিয়ে ওদের দু'জনকে বিঁধতে লাগলেন।

সুচিত্রা অস্বস্তি কাটিয়ে প্রথম এগিয়ে এল তাঁর দিকে—হেঁট হয়ে

প্রণাম করলে তাঁকে। তারপর আঁচল থেকে চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে তালা খুলে ফেললে।

মলয় বললে, বস মেজদা।

মেজদা ঘরের চারদিকে সেই প্রখর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এইটুকু ঘরে—আচ্ছা ঘরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—এই নানান জাতের মধ্যে থাকিস কি করে?

মলয় সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, বসবে না?

মেজদা বললেন, কাজটা জরুরী বলেই এলাম, নইলে—একটু থেমে বললেন, তোমার বউদিকে কলকাতায় নিয়ে এসেছি—দেশের অবস্থা শুনেছ বোধ হয়?

মলয় বললে, চা খাবে তো?

নাঃ—থাক। তাচ্ছিল্যভরে অনুরোধ ঠেলে পাতা বিছানার উপর বসলেন। বসে বললেন, মাকে এত সাধলাম, এলেন না। ভিটে কামড়ে পড়ে থেকে কি যে পরমার্থ লাভ করবেন তা উনিই জানেন! এখন বায়না ধরেছেন—বৃন্দাবন পাঠিয়ে দাও। যত হুজুগের দল নাকি বলেছে—দাদার মত দেখতে এক জন সন্ন্যাসীকে ওই কাশী মথুরার দিকে দেখা গেছে। ব্যস—আর যায় কোথায়!

তা মা যদি যেতে চানই—

যেতে চাইলেই তো পাঠানো সম্ভব নয়—রেস্তর জোগাড় না হলে ধর্ম্মকর্ম্মই বল—আর বাপের শ্রাদ্ধ মেয়ের বিয়েই বল কোনটিই হবার জো নেই। রুধির—রুধির, সব আগে চাই রুধির।

মলয় কথা কইলে না। সংসারে এতকাল ব্যবস্থা যা করবার উনিই করেছেন—কোথা থেকে কি করলে ভাল হয় সে উনিই জানেন ভাল। এ বিষয়ে তার মতামতের কোন মূল্য নেই।

মেজদা বললেন, দাদা বিবাগী—তুমি উপার্জ্জন কর না—সংসারের যত দায় আমার! একলা মানুষ নিজের ছেলেপিলে পরিবার দেখব—না জমিজমা দেখব, না—মা বউদিকে দেখব বল? অথচ মার একটা ব্যবস্থা করা দরকার—খুবই দরকার। তাই ঠিক করলাম—পূব মাঠের পাঁচ বিঘে জমি বিক্রী করে—মার ব্যবস্থা করে ফেলা যাক। তুমিও তো অংশীদার, তোমার মত চাই—বিক্রী কোবালায় সই চাই—তাই—

মলয় বললে, এ বিষয়ে তুমি যা ভাল বোঝ কর, সই সাবুদ যা দরকার করে দেব।

সুচিত্রা দু' কাপ চা ও কিছু খাবার নামিয়ে দিলে দু'জনের সামনে। মেজদার মুখের গাম্ভীর্য্য মিলিয়ে গেছে—প্রসন্নমুখে উনি হাত বাড়িয়ে একটি পেয়ালা টেনে নিলেন—খাবারের প্লেট থেকেও কিছু খাবার নিলেন। চা খাওয়া শেষ করে বললেন, কাগজ পড় নিশ্চয়? খবর রাখ—তেভাগা ব্যবস্থায় আমাদের দফা রফা! জমির খাজনা টানতে হবে ষোল আনা—ঘরে আসবে না একটি আধলা। কিন্তু ফাঁকি দেব বললেই তো ফাঁকিতে ইচ্ছে করে পড়ে না কেউ। আইন ঠেকাবার ব্যবস্থা আমরাও জানি।

তারপর গলার স্বর নামিয়ে তিনি বললেন, সবাইকে জমি ছাড়িয়ে দিয়েছি—ওরা ষ্ট্যাম্প কাগজে যদি লিখে দেয় যে হাল বলদ জমির সার ইত্যাদি যাবতীয় খরচ মালিকের কাছ থেকে পেয়ে চাষ করছি, তবেই ভাগে দেব জমি।

মলয় বললে, সবাই কি হাল বলদ লাঙল দিতে পারবে?

এই বুদ্ধি নিয়ে বাস করলেই জমি তোমার থাকবে! হাল বলদ দেবে না ঢেঁকি! ওরা লিখে দেয় ভাল—না দেয় পথ দেখুক গে। আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়ে তিনি হেসে উঠলেন।

মলয় হঠাৎ উঠে ভিতরের দিকে গেল। সুচিত্রা ইতিমধ্যে তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছে—কয়লার ধোঁযায় ছোট ঘরটা গেছে ভরে। দাঁড়িয়ে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

সুচিত্রা বললে, মেজ বটঠাকুরকে খেযে যেতে বল না?

না—দাদা বাসায় গিয়েই খাবেন।

তা যাও—ওঁর সঙ্গে গল্প করগে—এখানে বড্ড ধোঁয়া।

তা হোক। একখানি পিঁড়ি পেতে মলয় বসে পড়ল সেইখানে। বললে, বাড়ি কালই যেতে চাও?

মানে—নিয়ে যাবার মালিক কি-

হাঁ—কালই চল। স্বরে জোর দিযে মলয় উঠে দাঁড়াল।

সুচিত্রা অবাক হয়ে ওর পানে চাইলে। বুঝলে ও মনে মনে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে—অস্বস্তি ভোগ করছে।

মলয় এ ঘরে আসতেই মেজদা বললেন, কি বলিস—কাল কাগজগুলো এনে সই-সাবুদের ল্যাটা চুকিয়ে ফেলি—কেমন?

মলয় বললে, মার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা—

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন তিনি। তবেই হয়েছে ব্যবস্থা! উনি কি মানুষ আছেন—না বুদ্ধিসুদ্ধি···আর বলবেনই বা কি! টাকার দরকার তো বটেই—আর জমি না বেচলে—

মলয় তাড়াতাড়ি বললে, বেশ তুমি যা ভাল বোঝ—

মেজদা খুসীমনে মাথা নাড়লেন। বললেন, এই এতটুকু বেলা থেকে মাথা দিয়েছি সংসারে। কিসে ভাল কিসে মন্দ সে হিসেব আমার যথেষ্ট আছে। একবার হয়েছিল কি জানিস—দশমীর দিন—

মলয় আর একবার উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করলে। মেজদা ইঙ্গিতটা বুঝে গল্পের জের আর টানলেন না। মলয়কে তিনি ভাল

মতেই জানেন। দেখতে ও পরম বিনয়ী—উঁচু গলায় কাউকে চড়া কথা বলে না কখনো—কিন্তু ওর অন্তরের কাঠিন্য—তার মত অনমনীয় বস্তু আর দ্বিতীয় নাই। কোথা থেকে আঘাত লেগে ওরা মুহূর্ত্তে অমন বদলে যায়—ওদের নীতির মাপকাঠিই বা কি—অন্যায় অপমান-বোধ কোন্ তুচ্ছ কারণে উগ্র হয়ে ওঠে—এসব রহস্য আজও তিনি বুঝতে পারেন না। কব্জি উল্টে ঘড়িটা দেখে হঠাৎ তিনি সচকিত হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করলেন, ইস্—রাত হয়ে গেল দেখ! দাঙ্গা-হাঙ্গামা না থাকলেও বিশ্বাস নেই এখানকার আবহাওয়াকে। উঠি।

তিনি চলে যেতেই মলয় নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলে সে [illegible] সর্ত্তে রাজী হয়ে গেল! একি তার দুর্ব্বলতা নয়? মনে স্বীকার করে যে নীতিকে মঙ্গলপ্রসূ বলে—মুখে তাকেই করলে অস্বীকার! যে জমির ওপর জীবন ধারণ করে মানুষ—তার স্বত্বে কেন সে স্বত্ববান হবে না? যাদের উপার্জ্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে—তাদের লোলুপ দৃষ্টি জমির উপস্বত্বে নাই বা রইল! জমি কি তারই যে খেয়ালখুসিমত হস্তান্তর করে দেওয়া চলবে!

এই বাড়ির ঘরে শুয়ে আকাশ দেখা যায় না—আকাশের নক্ষত্র তো দুর্লভ বস্তু। একটু ফাঁকা—একটু হওয়া—রাতের পৃথিবীর সুপ্তিমগ্ন সামান্য দেহাংশ—এ না দেখতে পেলে আজ তার ঘুম আসবে না।

সুচিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, শরীর খারাপ লাগছে কি? হাওয়া করব?

না।—স্বর গম্ভীর—ভাঙ্গা-ভাঙ্গা।

তবে অমন করছ কেন? অন্ধকারে সরে এসে সুচিত্রা ওর কপালের ওপর একখানি হাত রাখলে।

মলয়ের মনে হ'ল এর চেয়ে চমৎকার সান্ত্বনা পৃথিবীতে নেই।

নিস্তব্ধ পৃথিবীর নিঃসঙ্গ অন্ধকারে লক্ষচ্যুত হয়েও পরিভ্রমণ করছে। সৌধের অন্তরালে যে আকাশ হীরকদ্যুতিতে অপরূপ হয়ে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে—তার সুরভি-নিঃশ্বাস ওর উত্তপ্ত কপালে এসে লাগছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে—ঘুম আসবে এই মুহূর্তে।

২৫

ঘুমের মতই আবেশ—শিথিল-বৃত্তির বৃন্তটিকে দোলা দিচ্ছে। বিপরীতমুখী বাতাস—রক্তের উষ্ণতাকে শীতল করে আনছে, তবু মাথার যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। একে উপেক্ষা বলবে—না অনুরাগহীন অভিনয় বলবে? যে প্রশ্ন ইঙ্গিতে আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠল—তাকে অবসর-মুহূর্তের বিলাস বলে উড়িয়ে দিলে শুভা! ভালবাসা হ'ল বিলাস! দুঃখভোগের মুহূর্তে দেহগত দাবিকে অস্বীকার করা—স্বভাবকে অতিক্রম করার দুশ্চেষ্টা ছাড়া আর কি! পৃথিবীতে লক্ষকোটি মানুষের মধ্যে একটি মানুষ বিশেষ করে যখন আর একটি মানুষের সঙ্গ কামনা করে, পরস্পর এক হয়ে অপার আনন্দ লাভ করে—জগতের যাবতীয় বস্তু ব্যক্তি বৃত্তি নীতি হিসাব পরিণাম সব কিছুকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেরা করে নিরুদ্দেশ যাত্রা—সে জিনিসকে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি দিয়ে কিছু-না বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে কি? হোক সে বিলাস—কি ভালবাসা কিংবা দেহগত আকর্ষণ কিংবা মহৎ অসৎ যে-কোন বৃত্তিরই প্রকাশ, বাস্তব বা কল্পনা, তাকে অস্বীকার করা মানেই নিজেকে অস্বীকার করা। একটি মানুষ বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তে একটি মানুষকেই চাইবে। বিস্তীর্ণ পৃথিবীর চিন্তা—খণ্ডিত এক গৃহকোণে আবদ্ধ হয় বলেই না—সোনালী ফসলে পৃথিবী দিনেরাতে পরিপূর্ণ

হয়ে রয়েছে ? অথচ মিলতে এসেও কত বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে! বাইরের বাধা—ভিতরের বাধা, আইনের—অন্তরের কর্ম্মের কত না বাধা। হু হু করে দুরন্ত হাওয়া চলন্ত মোটরে আছাড় খেয়ে পড়ছে—আকাশ তারা-সমেত ছুটে পালাচ্ছে দু' পাশ দিয়ে। মাঠে নেমেছে অন্ধকার—দিক হয়েছে নিশ্চিহ্ন। এই দ্রুত ধাবমান পারিপার্শ্বিকে হৃদয়গত দৌর্ব্বল্যই শুধু নিঃশেষে মুছে যাচ্ছে না। যে মুখ ফিরিয়েছে—তার দিকেই টানছে প্রবল বৃত্তি—কামনা কিংবা ভালবাসা। না—এ শুধু দুর্ব্বলতা। একটি পথ আর একটি পথকে ছুঁয়েছে কিন্তু মেশে নি তার মধ্যে। দুটি সরল রেখা পাশাপাশিই তো চলে—বহুদূর চলেও তারা মেশার সুযোগ পায় না। তাদের পাশে সবুজ ঘাস মাথা তোলে—বিচিত্র বর্ণের ফুল শোভা বিস্তার করে—পাখীর কাকলিতে উতলা হয় পথের ধূলো—তবু তারা এক হবার সুযোগ পায় না। একটি মানুষের মোহ—এমন প্রবল হবেই বা কেন? হওয়া উচিত তো নয়।

গাড়ীবারান্দার কোলে মোটর থামল। বেয়ারা ছুটে এসে সেলাম জানালে—মিত্তির সাহেব ঠারতা হ্যায়।

ড্রয়িং-রুমে আলো জ্বলছে—পাখাও চলছে মনে হ'ল। মৃদু কথার আওয়াজে বুঝলে—মিত্র একা আসেন নি।

নমস্কার বিনিময়ের পর মিত্রই পরিচয় করিয়ে দিলেন অপর ব্যক্তিটির সঙ্গে, আমার ভাইঝি মালতী মিত্র—এইবার বি-এ দিচ্ছে।

প্রশান্ত প্রীতি-সম্ভ্রমপূর্ণ হাসি ফুটিয়ে মেয়েটিকে অভ্যর্থনা করলে। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল দুই চোখে ওর শ্রীর প্রকাশ অপরূপ মনে হ'ল। বিদ্যাপ্রকাশের ব্যাকুলতা অবিনয়ের নামান্তর—এ তো বহুক্ষেত্রে তাকে পীড়া দিয়েছে। শূন্যগর্ভ কলসীতে যে ফাঁকা আওয়াজ হয় তারই

মত বাক্-আর রীতি-সর্ব্বস্ব নয় মালতী। অন্ততঃ প্রথম দর্শনে তাই মনে হ'ল।

মিত্র বললেন, এ ক'দিনে অনেক কিছু ঘটেছে। যে সর্ত্ত দিয়ে শ্রমিকদের অসন্তোষ দূর করেছিলাম—তাও ওরা মানছে না। আমি তখনই বলেছিলাম যে, 'মোর দে গেট—মোর দে ওয়াণ্ট।'

কেন এমনটা হ'ল ?

ওটাই যে স্বভাব ওদের। দেখেন নি—ষ্টেশনের কোন কুলিকে ন্যায্য পাওনার বেশি দিলেও আরো কিছু পাওয়ার দাবি সে করবেই। এও তেমনি। আজকাল নাকি ওদের ফেডারেশন না বড় ইউনিয়ন সারা ভারতের ছোট ছোট ইউনিয়নগুলিকে এক করে রেখেছে। তারা যা নির্দ্দেশ দেবে—এরা তাই মানবে। দেশটিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন বানাতে চায়!—ব্যঙ্গপূর্ণ হাসিতে কথাটা শেষ করলেন মিত্র।

মালতী নম্রকণ্ঠে বললে, আলাদা আলাদা না থেকে এক হওয়াই কি ভাল নয়? এই তো আপনারাও এক রয়েছেন।

মিত্র বললেন, এক হাওয়া ভাল নয় কে বলছে? কিন্তু যুক্তিহীন দাবি চাপিয়ে নিজেদের একতাকে প্রমাণ করার নাম শক্তি প্রকাশ নয়।

মালতী হাসলে—বললে, এক হ'লেই যে শক্তি প্রকাশ পায়—এটা প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন কাকা।

মিত্র রাগ করে বললেন, তোমার ছেলেমানুষিপনা ঘুচল না মালতী। কবে কি বলেছিলাম—তাই ধরে বসে আছ!

মালতী হাসতে হাসতে বললে, কিন্তু ওরাও তো বলতে পারে দাবি আমাদের যুক্তিহীন নয়—আপনাদের যুক্তিটাই হ'ল অন্যায় জিদ।

প্রশান্ত বললে, তা বলতে পারে না—যেহেতু অন্যান্য জায়গার তুলনায় —ওরা ভালই মাইনে পায়। দু' দু'বার ওদের দাবি মিটিয়েছি আমরা।

মালতী বললে, বেশ তো, আর এক বার মিটিয়ে দিন দাবি। জিনিসের দাম দিন দিন বাড়ছেই তো।

মিত্র ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে বললেন, তারপর আমরা ঘোড়ার ঘাস কাটব, না? তোমার মত বুদ্ধি হলেই ফ্যাক্টরী চলবে!

মালতী হাসি দমন করে প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললে, এত হাঙ্গামার মধ্যে মানুষের না যাওয়াই ভাল, নয় কি?

ওর এই ছেলেমানুষি মন্তব্যে প্রশান্ত হাসলে।

তারপর ট্রেতে করে বেয়ারা চা নিয়ে এল, সেই সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক। শ্রমিক-প্রসঙ্গ ছেড়ে ওরা হাল্‌কা আলাপে নেমে এল। কোথায় চালের দর চড়ছে, কোথায় তেলের ব্ল্যাক-মার্কেট ফেঁপে উঠছে, কোথায় প্রধান মন্ত্রীর ফতোয়া জারির ফলে প্রদেশে প্রদেশে, দেশীয় রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার আয়োজন চলছে—এসব আলোচনাও ক্রমশঃ এসে পড়ল। আজকালকার যে-কোন সভাতে—মজলিসে—উৎসব-ক্ষেত্রে পাঁচ জন এক হবার সুযোগ ঘটলেই অন্তর্বর্ত্তী সরকার—লীগ ও কংগ্রেসের নীতি—রেশন আর ব্ল্যাক-মার্কেট—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার কথা—এ সব নাকি উঠবেই।

আহারাদি সেরে তিন জনেই গাত্রোত্থান করলে। মিত্র চললেন আগে আগে—পিছনে গল্প করতে করতে চলল প্রশান্ত আর মালতী।

অন্যান্য কথার পর মালতী বললে, এই ধরণের জীবন আপনার কেমন লাগে?

প্রশান্ত প্রশ্ন-উন্মুখ চোখে ওর পানে চেয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলে, আপনার কি মনে হয়?

মালতী মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, মন্দ কি! মুখে তার মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

প্রশান্ত বললে, আপনি হাসলেন যে?

এমনি—হাসিটা আমার রোগ।

প্রশান্ত বললে, আমি জানি—এ ধরণের জীবন আপনার মনোমত নয়।

কারণ?

কারণ—একটু আগে আপনিই তো বললেন—

মালতী শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, ও হরি—আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি শ্রমিক হিতাকাঙ্ক্ষিনী, ওদের কথা নিয়ে বড্ড ভাবি? না—না—না—মোটেই তা নয়। ওদের কথা এত কম জানি বলেই তো ওদের কোন দাবিই আমার কাছে অন্যায্য বলে বোধ হয় না।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য্য! কেন? কেন?

মিত্র পিছন ফিরে বললেন, দশটা বাজে—কাল আলোচনা করো মালতী।

মালতী এগিয়ে এসে বললে, আচ্ছা কাকা—শ্রমিকদের ব্যাপার আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন?

মিত্র হেসে বললেন, তার দরকার কি—ওদের যে-কোন দাবি তুমি সমর্থন কর—এই তো তুমি ওদের সম্বন্ধে পাকা ওয়াকিফহাল!

মালতী ঘাড় ফিরিয়ে প্রশান্তর পানে চেয়ে হেসে বললে, কাল এসে তর্ক করব কিন্তু। নমস্কার।

ভাঙ্গা চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রশান্ত ভাবলে—একটা পথ আর একটা পথকে বার বার ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করে—এইটিই কি পথের চরমতম ইঙ্গিত? চলবে—অথচ মিলবে

না—মুগ্ধ হবে অথচ থামবে না—এই ইঙ্গিত দিয়ে মানুষ রচনা করেছে পথকে—না পথ নির্দ্দেশ দিচ্ছে মানুষকে ?

সকালেই মালতী এল। সবেমাত্র প্রশান্ত বিছানা ছেড়ে হাতমুখ ধুয়েছে—প্রাতঃকালীন অনেকগুলি কাজ তার বাকি। মালতী বৈঠকখানায় ঢুকেই কলিং-বেলে ঘা দিয়ে পিয়ানোর সামনে টুলটায় গিয়ে বসলে। তার পর ডালা তুলেই টুং টাং সুরু করে দিলে। বিলাতী একটা গানের সুর ওর কণ্ঠ ছাড়িয়ে অল্প ধ্বনিতরঙ্গে যন্ত্রস্বরের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করলে। বেশ প্রসন্ন প্রাতঃকাল—মালতী অকারণে খুসি হয়ে উঠল।

অগত্যা সব কাজ না সেরেই প্রশান্তকে নেমে আসতে হ'ল। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে ও হাসলে, আশা করি নি—এত সকালে—

মালতী বাম হাতের মণিবন্ধ ঈষৎ আন্দোলন করে বললে, বাংলা সময়টা সব চেয়ে আগিয়ে চলে—মানুষদের পিছিয়ে পড়লে দুর্নাম রটে। অবশ্য সময়ের আগে চলার অপবাদ ও সাধুবাদ কোনটিরই ভাগী হতে চাই না।

অপবাদ ?

নয় ? যে সময়ের আগে চলে—তাকে বুঝতে পারে খুব কম লোকে।

প্রশান্ত বললে, অবশ্য তাঁরা যদি বুঝবার সুযোগ দেন সাধারণকে—

মাথা নেড়ে হেসে উঠল মালতী। কি কথাই সে বলেন! সময়ের আগে চলেন যাঁরা—তাঁরা মোটেই সাধারণ নন তো সাধারণে বুঝবে কি করে ? এর একটা সহজ পথ আছে—সে হচ্ছে অসাধারণ হওয়া।

প্রশান্ত বললে, বিধাতা সকলের বুদ্ধিবৃত্তিকে সমান করেন নি—প্রতিভাও দুর্লভ বস্তু। একটু হেসে বললে, যাই হোক, চা চলবে ?

চলবে—কিন্তু কালকের তর্ক চলবে না।

কেন—আপনিই তো আশ্বাস দিয়ে গেলেন—

পরে ভাবলাম—তাতে লাভই বা কি? আপনার জীবনযাপন-প্রণালী আপনার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে—তা জেনে কারই বা লাভক্ষতি!

তবে কাল জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

কৌতূহল। কাকার মুখে শুনলাম এখানকার কথা। এই সব শ্রমিক—এদের দাবি—ধর্ম্মঘট—অশান্তি—আপনাদের ক্ষমতা—জিদ—

কোন্‌টা অন্যায় মনে হ'ল?

কি জানি—ঘোরপ্যাঁচ অত বুঝি না। শুধু বুঝি, আমরা যদি পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি—ওরাও তা পারবে না কেন? ওরা কেন চাপ দেয়—কেন ভয় দেখায় ধর্ম্মঘট করবার—কেন স্লোগান আউড়ে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করে—তা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন।

জানি। কিন্তু দাবির একটা সীমা আছে। যে হাঁস সোনার ডিম দেয়—তাকে মেরে ফেললেই অনেকগুলো ডিম এক সঙ্গে মেলে না—এ তো জানেন?

মালতী বললে, জানি বৈকি। তবে কথা হচ্ছে—সোনা জিনিসটাই মারাত্মক বলে—লোভের সীমা নির্দ্দেশ করে দেওয়া খুব কঠিন। আচ্ছা সোনা জিনিসটাকে খুব সস্তা করে দিয়ে পৃথিবীর সমস্যা সহজ করা যায় না?

প্রশান্ত বললে, সোনার বদলে যে জিনিসই দিন—লোভ তাতে কমবে না। বিনিময়-প্রথা এককালে ছিল—তাতেও সামাজিক সমস্যা মেটে নি।

মালতী বললে, ও সব তর্ক থাক—চলুন খানিক বেড়িয়ে আসি।

কোথায় যাবেন? এই কলোনিটা পেরুলেই তো বাঁশবাগান।

মন্দ কি—লাল আর হলদে রঙের একই টাইপের বাড়ি দেখে দেখে এত পুরনো লাগছে।—মালতী উঠে বারান্দায় এল।

নতুন তৈরী শহরের আভিজাত্য নেই—একথা মনে মনে স্বীকার করলে প্রশান্ত। সেই সঙ্গে তর্ক জমল মনে—আভিজাত্য না থাকলেই বা ক্ষতি কি! ইতিহাস বলে, পরস্বাপহরণ—সম্পদসৃষ্টির মূল সূত্রে নিহিত। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিতে সংস্কৃতির পিপাসা রয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নিজেকে সব দিক দিয়ে সুন্দর করে তোলবার মাঝে পরকে পীড়ন করার অভিযোগ আসবেই বা কেন? মানুষ তো মুদ্রা নয় যে—যে ছাপ তার দু-পিঠে ফুটে রয়েছে—তারই মূল্যে প্রত্যেকের গোত্র হবে তুল্যমূল্য। অসাধারণ বুদ্ধি—কর্ম্মক্ষমতা—প্রতিভা—এসবের গোত্র সর্ব্বসাধারণ হতে অনেকখানি উঁচুতে। বাগানের বেড়ায় ছাঁটাই করা গাছ—সে প্রকৃতির অলঙ্কার নয়—পৃথিবীর বিবর্ত্তনবাদের সাক্ষ্যও নয়। যে সবার চেয়ে প্রাণশক্তিতে সতেজ, তার মূল্যও সাধারণের চেয়ে চড়া। কিন্তু সংস্কৃতির পিছনে সম্পদসৃষ্টির তাগিদ থাকলেও—অপহরণের দুষ্কৃতি নেই। এক একটা শহরের আভিজাত্য আছে বৈকি—যেমন দিল্লী, যেমন কাশী। বিবেকানন্দ একদিন বলেছিলেন, ইউরোপের শিক্ষা রাজনীতি—এশিয়ার শিক্ষা অধ্যাত্মবাদ। পৌরাণিক যুগের কাশী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তে এই শেষের কথাটাকেই প্রমাণ করছে।

চলতে চলতে দু'জনের মধ্যে এমনি আলাপই চলল। মালতী হয়ত তর্কপটু নয়—সব কথাতেই অল্প যুক্তির ভারে ও বশ্যতা স্বীকার করে। তাই বলে ও যে কিছুই জানে না এ কথাও সত্য নয়।

নগরসৃষ্টির কথা থেকে ইতিহাসের অনেক নজির উদ্ধৃত করলে—ভাল মন্দ দুটি দিকের বিচারেই ওর দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। তবে উগ্র মতবাদ নিয়ে অপরকে আক্রমণ করার নেশা ওর নেই। প্রশান্তর ভালই লাগল। যে মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে—তাকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করা যায়—কিন্তু যে মূর্ত্তিকে সুসম্পূর্ণ করবার অবকাশ যথেষ্ট—তাকে নিজের কামনা অনুযায়ী সার্থক করে তোলা সহজ।

ফিরবার মুখে প্রশান্ত বললে, বিকেলবেলা আসবেন এদিকে ?

মালতী বললে, আপনার কাজের ক্ষতি হবে না ?

না।—ভারি আনন্দ পাব তা হলে।

বৈকালেও দু'জনে বহুক্ষণ ধরে গল্প করলে। এ শহরে দেখবার কিছু নেই—পড়বার মত ভাল বই নেই, লাইব্রেরি,—তাও নেই। একঘেয়ে কাজ—এক ধরণের কথাবার্ত্তা। তাই মালতীর সঙ্গ প্রশান্তর মনকে সুস্থ করে তুলল। আশ্চর্য্যের কথা—সারাদিনটা শুভার কথা ওর একবারও মনে হয় নি। অথচ দিন কয়েক আগে সন্ধ্যাবেলায় মোটরে করে যখন ও ফিরছিল···

মালতী বিদায় নিয়ে চলে গেলে প্রশান্ত ওর কথাগুলি আর একবার ভাবতে বসল। ভাবতে ভাবতে দেখলে কোন মতবাদের ভার চাপিয়ে মালতী ওর চিন্তাকে বহুপথগামী করে নি। একটা স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হবার সুযোগও দেয় নি সে—অথচ মালতী যে বহু-বিন্দু-প্রতিষ্ঠিত একটি নদীর মত লীলামাধুর্য্যে মন হরণ করে নিয়েছে তাও নয়। তার শিক্ষা—শ্রী, অল্প তর্কেচ্ছা এইগুলিই কি আনন্দের কারণ ? হবে। আজকের দিনটি তো আনন্দেই কাটল—আর সেজন্য ধন্যবাদ মালতীকে।

২৬

কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনন্ত দোবের বৈঠকখানায় জরুরি পরামর্শ চলছে। লক্ষ্মী গ্লাসওয়ার্ক—এনামেল ফ্যাক্টরী আর দুটো কটন মিলের শ্রমিক সবাই একসঙ্গে ধর্ম্মঘটের নোটিশ দিয়েছে। যুদ্ধোত্তর যুগে জীবন-যাপনের মান অসম্ভব রকম উঁচু হয়েছে—নিত্য প্রয়োজনীয় অর্দ্ধেক জিনিস তো পাওয়াই যাচ্ছে না। রোগে চিরকালই মানুষ মরে—আজও মরছে, তবে মৃত্যুর হারটা বেশি। কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব—আর খাদ্যে ভেজাল তো আছেই। রোগের ওপর আছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যাদের কাছে জীবনধারণই সব চেয়ে বড় ও কঠিন সমস্যা—তারা কি করে রাজনীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হ'ল—? কিন্তু রাজনীতি তাদের বহু দূরে ও গভীরে টেনে নিয়ে গেছে। ধর্ম্মের খোলসটিকে বাঁচাবার জন্য তারা জীবন বিসর্জ্জন দিচ্ছে—মানুষ হাসছে দূরে দাঁড়িয়ে। যাই হোক, রাজনীতি বা ধর্ম্ম কোনটাই তাদের জীবন বিসর্জ্জনের হেতু নয়—আসলে ঈর্ষা-ক্ষুব্ধ দুর্ব্বল মনে আদিম বৃত্তিকে জাগিয়ে দিয়ে সাবধানীর দল নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেবার জন্য এই খেলা খেলছে।

সর্ব্বেশ্বর রায় বললেন, এ-ও তাদের খেলা। আমি বাজী রেখে বলতে পারি ওই দলকে মোটা রকম কিছু দিলে ধর্ম্মঘটের নোটিশ তুলে নেবে।

কমল মিত্র বললেন, টাকার দরকার হলে—আবার নোটিশ দেবে ওরা। ওদের হাতের খেলনা হয়ে যদি ফ্যাক্টরী চালাতে হয়—তার চেয়ে ফ্যাক্টরী তুলে দেওয়া ভাল!

অনন্ত দোবে বললেন, বিজ্‌নেসম্যান কখনও বিজনেস তুলে দেবার

কথা বলে না। কি লাভ রইল না রইল, এই দেখা আমাদের ডিউটি।

সর্ব্বেশ্বর বললেন, ডিউটি তো—কিন্তু ওদের চোখ রাঙানি সইতে পারবেন কি ?

প্রশান্ত বললে, কতকগুলি সর্ত্ত আমরা ঠিক করে ফেলি—ওদের ফেডারেশন যদি সেগুলি মেনে নেয়—

সবগুলি যদি ওরা না মানে—

আমরাও বিবেচনা করে দেখব ওদের সব সর্ত্ত মেনে নেওয়া যায় কিনা। কিছু কাটছাঁট দু'পক্ষকেই করতে হবে।

আপোষ-মনোভাব ওদের নেই। দেখেন নি—কলকাতা থেকে মেয়ে পুরুষ লীডার এসে মীটিং করে তাতিয়ে দিয়ে গেল কেমন। এত অল্প আয়ে সংসার চলে না! আরে আমাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিঙের সঙ্গে তোদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং এক করলে হয় কখনও? যে রকম দাবির বহর, কোন দিন বা বলে বসবে—একখানা মোটর না হলে আমাদের ভারি কষ্ট হচ্ছে! সর্ব্বেশ্বর শ্লেষের ভঙ্গিতে কথাগুলি তীক্ষ্ণ গলায় উদ্‌গীরণ করলেন।

সবাই হাসলেন—অতঃপর কথা না বাড়িয়ে দু'পক্ষের সর্ত্ত-গুলিকে কাটছাঁট করে মোটামুটি আপোষের একটা ভিৎ খাড়া করলেন।

কমল মিত্র বললেন, এতেও মিটবে না—হাতে ছাড়বার মত ও ছাড়াবার মত দু'একটা বিষয় ঠিক করে নিন।

যথা ?

ওই ক্যাজুয়েল লিভটা উঠিয়ে—মোট কুড়ি দিন ছুটি বছরে দেওয়া যেতে পারে। মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে ধরুন এক মাস। হাফ পে'র

কোশ্চেন রাখবেন না। আর জরুরি অবস্থা না হলে মাইনের হার দশ বছরের মধ্যে বাড়ানো চলবে না।

সর্ব্বেশ্বর বললেন, বোনাসটা কি একদম বাদ দেওয়া যায় না?

প্রশান্ত বললে, না—পূজোর সময় একটি বোনাস্ দিতেই হবে—অতিরিক্ত লাভ হলে আর একটা—

না—না—না—মশায়, আর আস্কারা দেবেন না! সর্ব্বেশ্বর চীৎকার করে উঠলেন।

সভার শেষে পথ দিয়ে ভাবতে ভাবতে চলেছিল প্রশান্ত। এই দর-কষাকষি ব্যাপারটা তার ভালই লাগে নি। এই দেওয়ার মধ্যে প্রীতির প্রকাশ কই? দাবি মিটলে যারা কাজে আসবে তারাই কি নিরহঙ্কৃত মনে মনিবগোষ্ঠীকে শ্রদ্ধা দেখাতে পারবে কিংবা কাজে দিতে পারবে পূর্ণ মনোযোগ? এক পক্ষ আদায় করে নিয়ে উদ্ধত হবে—অন্য পক্ষও সেই অনুপাতে তাদের পীড়ক বলে ঘৃণা করবে। মানুষের মন সাধারণ অবস্থাকে অতিক্রম করে জয়পরাজয়কে মনে স্থান না দিয়ে নির্ব্বিকার হতে পারে কি? শ্রমিকরা সর্ত্ত যা দিয়েছে তাও যথেষ্ট বাড়ানো—মালিকরা যা মেনে নিচ্ছেন তাও ন্যায্য অংশের চেয়ে ন্যূন তো বটেই। কারও মধ্যে আন্তরিকতা নেই। একে আপোষ বলার চেয়ে ভাবী যুদ্ধের প্রস্তুতি বলাই ঠিক।

মোড় ফিরতেই মালতী এসে মিলল ওর সঙ্গে।

ইস্—খুব ভাবতে ভাবতে চলেছেন দেখি! ব্যাপার কি?

নাঃ—এদিকে কোথায় গিছলেন?

মালতী বললে, কোথাও না। বাঃ রে, বাড়ির দিকে চললেন যে—বেড়াতে যাবেন না?

আজ থাক।

উঁহু—আজ একটা আশ্চর্য্য জিনিস দেখাব আপনাকে।

ওই ঢিবিটা আছে না, প্রশান্তর হাত ধরে ও বিপরীত দিকে আকর্ষণ করলে।

অগত্যা মালতীর সঙ্গ নিতে হ'ল।

মালতী বললে, আর কি—এবার তো ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল। উনিশ শো আটচল্লিশের তিরিশে জুন ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যাবে। শোনেন নি আজ এ্যাটলির ঘোষণা রেডিওতে?

তাই নাকি?

ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টে লীগকে নিয়ে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে—তাই পণ্ডিত নেহেরু ব্যাপারটি বিলেতে জানিয়েছিলেন। এ অবস্থা থাকলে তাঁরা লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়বেন এই ভয় দেখিয়েছিলেন। তারই ফলে লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করা হ'ল। উনি নাকি শেষ ভাইসরয়।

প্রশান্ত বললে, খোশ খবরের ঝুটোও ভাল।

ঝুটো? এমনি ঢাকঢোল পিটিয়ে মিথ্যা প্রচার করতে পারে কেউ? মালতী অকৃত্রিম বিস্ময়ে চেয়ে রইল প্রশান্তর পানে।

প্রশান্ত হাসলে। বললে, রাজনীতি আমরা বুঝি না—এটা যেমন ঠিক—ইংরেজী ভাষার ভাষ্যগুলিও তেমনি নানান জাতের। কোথায় ওঁর ফাঁক রইল—সে কি তুমি আমি পারব ধরতে?

মালতী বললে, এত সোজা কথার মধ্যেও—

প্রশান্ত বললে, স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয় একথা মান তো? বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা আসে—ইতিহাসে এ নজির মেলে না—অথচ আমরা পেয়ে যাচ্ছি—

মালতী বললে, জগতে দুটো ব্লক তৈরি হচ্ছে—তারই সুযোগে আমরা—

আমার এখনও সন্দেহ আছে। ভারত ছাড়ব বললেই ভারত ছাড়া যায় না। সেদিন যেন পড়ছিলাম কে একজন লিখেছেন—সিঙ্গাপুরকে মালয় ষ্টেট থেকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে। ওখানে ব্রিটিশ নৌঘাঁটি কায়েম তো রইলই। আন্দামান নিকোবার দ্বীপগুলি থেকে সিলোন পর্য্যন্ত ওরা নিরাপত্তার একটা লম্বা লাইন টানছে—যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপে মার্কিনী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা চলছে। ইজিপ্ট হয়ে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত ব্রিটিশ এই লম্বা লাইন দৃঢ় করে রাখবে। ভারত ছেড়েও ভারতকে ছোরা দেখিয়ে বশে রাখবার ব্যবস্থা। তা ছাড়া ভেবে দেখ—দেশীয় রাজ্যগুলি এখনও গণপরিষদে যোগ দিতে ভরসা পাচ্ছে না—ওরা নিজেরা স্বতন্ত্র থাকতে চায়—আর ব্রিটিশ সে সুযোগ ছাড়বে বলে বোধ হয় না।

মালতী বললে, হাঁ—ঘোষণায় এ কথাও বলা হয়েছে—ভারতের অনিচ্ছুক প্রদেশ বা অংশকে জোর করে প্রধান অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে না। ব্রিটিশ যে-কোন প্রধান দলের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাবে—ভিন্ন ভিন্ন দলকেও ক্ষমতা দেওয়া আশ্চর্য্য নয়।

প্রশান্ত বললে, ভাষ্য রচনার মস্ত বড় একটি ফাঁক ঐখানেই রয়েছে।

মালতী বললে, সত্যিকারের ক্ষমতা যদি নাই দেবে—তো এসব ঘোষণার মূল্য কি ?

প্রশান্ত বললে, সততা আর রাজনীতিতে অহি-নকুল সম্বন্ধ। ওর মূল্য আমরা বুঝতে পারব না।

মালতী বললে, সত্যি—এ সব কচকচি ভাল লাগে না। আসুন একটু বসা যাক।

দু'জনে ঘাসের উপর বসলে। পিছনে বাঁশবন—বাতাসে নুয়ে-পড়া বাঁশ থেকে কট্ কট্ শব্দ হচ্ছে, একটি ঘুঘু পাখী কোথায় আত্মগোপন

করে মাঝে মাঝে সেই শব্দে সুর সাধছে। সামনে ধূ-ধূ করছে মাঠ। কুঠারের আঘাতে বহু গুল্ম ও বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়েছে। শহর এগিয়ে আসছে। এখনও আকাশ রয়েছে নীল। মোটা চিমনির ধোঁয়া এদিককার আকাশকে ঢেকে দিতে পারে নি এখনও।

কালই আমি চলে যাচ্ছি। আকাশের পানে চোখ তুলে মালতী বললে।

কালই! কথাটি ধীর-বিলম্বিত স্বরে উচ্চারণ করলে প্রশান্ত।

হাঁ—তবে মাসখানেকের মধ্যেই হয়ত ফিরে আসব। আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে মালতী বললে।

প্রশান্ত উদাস দৃষ্টিকে প্রান্তরের পার থেকে টেনে আনলে না। সংক্ষেপে বললে, ভাল।

জায়গাটা আমার ভালই লেগেছে। কাল বলছিলাম না—সব শহরের বনেদিয়ানা থাকে না—আর বনেদিয়ানা না থাকলে মানুষকে টানতেও পারে না সে জায়গা?

হাঁ—আমি বলেছিলাম নাই বা থাকল বনেদিয়ানা। নতুনভাবে সৃষ্টি করার মধ্যেই রয়েছে ভাল লাগার বস্তু।

আপনার কথাগুলি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম কাল। ভাবতে ভাবতে দেখলাম—এ জিনিস আমারও তো ভাল লাগা উচিত। অন্য যুগকে যদি ভালবাসতে পারি ত নিজের যুগকে অবহেলা করব কেন?

কিন্তু ভালবাসা--আর ভাল লাগা উচিত ত এক নয় মালতী।

একই দৃষ্টিভঙ্গির একটুখানি তফাৎ শুধু। যাই মনে হ'ল উচিত অমনি—

হেসে উঠল প্রশান্ত, অমনি ভালবাসার ডিগ্রীতে হু-হু করে তাপ উঠে গেল!

মালতীও হেসে বললে, গেলই তো।

তারপর দু'জনেই বহুক্ষণ ধরে বিলম্বিত হাসির তালে তাল দিয়ে চলল। প্রশান্ত দেখলে—আকাশ অত্যন্ত নীল হয়ে উঠছে—মালতী দেখলে—পায়ের তলাকার ঘাসগুলি গাঢ় সবুজে রূপান্তরিত হ'ল।

প্রশান্ত আবেগভরে মালতীর একখানি হাত তুলে নিয়ে ডাকলে, মালতী!

এই ভাষা—এই আবেগকম্পিত সম্বোধন সৃষ্টি-চৈতন্যের উন্মেষ হতে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন নারীর কানে একটি ছাড়া অন্য কোন অর্থে প্রতিধ্বনিত হয় নি। এ সম্বোধন নয়—সম্পদ।

মালতী ডুব দিলে সেই সম্পদসাগরে।

২৭

নতুন শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল অত্যন্ত দ্রুত। প্রশান্তর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—মিত্র আপত্তির হেতু খুঁজে পেলেন না। এ এক পক্ষে ভালই হ'ল। উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি ধরে যাঁরা উচ্চ রাজপদের সামীপ্যে বিচরণ করেন তেমন বর অবশ্য সকলকারই কাম্য। কিন্তু যশ-সম্মানের অধিকারী হলেই সম্পদটা যথাপ্রাপ্য হিসাবে লাভ করা যায় না। ওখানে উদ্যম কথাটির মূল্য দিয়েও ভাগ্য জিনিসটাকে নস্যাৎ করা কঠিন। কমল মিত্র যখনই মুখে উদ্যোগী পুরুষসিংহের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন, মনে মনে বলেন—ভাগ্যও সম্পদসৃষ্টির আর একটি স্তম্ভবিশেষ। মানুষের মত সম্পদেরও দুটি চরণ—আর তাতেই তার সম্পূর্ণতা। মালতীর ভবিষ্যৎ এই মিলনে উজ্জ্বল বোধ হ'ল—এবং প্রসন্ন মনে তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নতুন শহরের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের সর্ত্ত মেলে নি ; দু'পক্ষের অনমনীয় ইচ্ছা মনোমালিন্যকে সুদৃঢ় করে তুলছে। হাতে-রাখা সর্ত্তগুলির কিছু ছেড়েও মিলনের উপকূলে পৌছানো অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

মিত্র মত প্রকাশ করেছেন, না হয় দু'মাস বন্ধ রাখব ফ্যাক্টরী—ওদের অন্যায় জিদ তবু মানব না।

সর্ব্বেশ্বর বলেছেন, আর কেন—বানপ্রস্থের সময় তো হ'ল—এবার খানকতক কোম্পানীর কাগজ কিনে কাশীবাস করব ভাবছি।

অনন্ত দোবে কোন মন্তব্য করেন নি। ব্যবসাদারের শিরায় মজ্জায় ব্যবসার রক্ত বহমান—কোন রকমে লাখ-কতক নিয়ে মুখ ফিরানো তাঁর রীতি নয় বলেই শেষ পর্য্যন্ত হাল তিনি ছাড়েন নি।

প্রশান্তর অভিমত—ব্যবসা শুধু অর্থসঞ্চয়ের যন্ত্রবিশেষ নয়। সমাজ-ব্যবস্থাকে সুস্থ ও সবল করে রাখবার এ একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রথা। সেইজন্যই আপোষ-মীমাংসার পক্ষপাতী সে।

কিন্তু শ্রমিক-সঙ্ঘ আপোষ-মীমাংসায় রাজী হয় নি।

ব্যাপারটা সালিসীতে দেওয়ার কথা উঠেছে। মালিকরা সকলেই অবশ্য এ বিষয়ে একমত নন। তাঁদের অনেকের ধারণা এতে তাঁরা দুর্ব্বল হয়ে পড়বেন—তাঁদের মান-প্রতিপত্তির লাঘব হবে—মর্য্যাদার সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না শ্রমিকদের সামনে। তবে প্রশান্তর যুক্তিতে যত না হোক, কালধর্ম্মের প্রভাবটা তাঁরা অন্তরে অন্তরে স্বীকার করে সালিস-রফায় সম্মতি জানিয়েছেন। বাকি আছেন প্রশান্তর নিয়োগকর্ত্তা চৌধুরী সায়েব। তাঁর অনুমতি নেবার জন্য প্রশান্ত আজ বৈকালেই কলকাতা রওনা হবে।

মালতী এসে দাঁড়াল মোটরের সামনে। বললে, আমাকে পৌছে দেবেন শ্যামবাজারে ?

প্রশান্ত দুয়ার খুলে বললে, এস।

দু'জনে পাশাপাশি বসলে। প্রসাধিতা মালতীর মৃদু দেহ-সৌরভে গাড়ীটা ভরে গেল। গতির সঙ্গে দু' পাশের দিগন্তলীন নীল আকাশ সরে সরে যাচ্ছে—নিস্তব্ধ একটি অবসর দু'জনকে ঘিরে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে—তবু ওরা দু'জনে যেন দুই জগতের প্রাণী।

প্রশান্ত চিন্তার গভীরে ডুবে গেলেও মাঝে মাঝে অসম্ভব নিস্তব্ধ মুহূর্ত্তগুলি ওর চৈতন্যকে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু বলা দরকার মালতীকে—অথচ সে কথাটি কি এই মুহূর্ত্তে তা স্মরণে আসছে না।

অবশেষে মালতীই কথা বললে, কি যেন ভাবছেন! ষ্ট্রাইকের কথা না কি?

হাঁ। মাথা নেড়ে স্বীকার করলে প্রশান্ত।

মালতী বললে, তা এতে ভাববার কি আছে, ওদের দাবি মিটিয়ে দিন না।

প্রশান্ত হাসলে—কোন কথা বললে না।

মালতী ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, সত্যি—এত সব অশান্তি কেন যে সাধ করে পোয়ায় মানুষ!

প্রশান্ত বললে, অনিচ্ছাতেও অশান্তি আসে—

মালতী সোজা হয়ে বসে বললে, না—সম্পূর্ণ ইচ্ছাতেই বলব। এই যে হাঙ্গামা—

প্রশান্ত বললে, এমনি ধারাতেই জগৎ চলছে। হাঙ্গামা কোথায় নেই। তুমি ইচ্ছা করলেও যেমন অনেক হাঙ্গামা থেকে আলাদা থাকতে পার না—তেমনি—

মালতী বললে, প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ বুঝত—

ঠিক বলেছ। এমন কতকগুলি ঘটনা আছে—যা স্বার্থের সঙ্গে কায়েমীভাবে জড়ানো—এমন কতকগুলি বৃত্তি রয়েছে—যা তথাকথিত মান-সম্মানের দাবিতে বেশ উগ্র—এই সবই খোলা চোখ আর খোলা মন নিয়ে বিচার করতে দেয় না মানুষকে।

কেন—ওদের যদি চিনতেই পারি আমরা—

চিনতে পারি না বলেই তো মুশকিল। প্রশান্ত হাসলে।

মালতী কোন কথা কইলে না। বাইরের দৃশ্য মোটরের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত—মনকে সেই তালে ছুটিয়ে দিলে হয়ত নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—কিন্তু মন রয়েছে অন্যত্র। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। অবশেষে ও বললে, কখন ফিরবেন?

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই।

তারপর কেউই কথা বলবার চেষ্টা মাত্র করলে না।

প্রশান্তর কি জানি কেন মনে হচ্ছে মালতী সঙ্গে না এলেই ভাল হ'ত। একলা একলা আসন্ন সমস্যাগুলিকে ভাল করে ভেবে দেখবার অবকাশ পাওয়া যেত। মালতী যে ধরণের তর্ক করে তাতে তর্কই করা যায়—মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। কি লাভ ওই ধরণের কথা কাটাকাটি করে? শুধু কথার কৌশলে মানবীয় বৃত্তিগুলিকে ব্যাখ্যা করলেও তার দোষ-ভাগ বর্জ্জন করা যাবে না। তর্কের মধ্যে লড়াইয়ের মনোভাব—বিপরীত মত-সংঘাত মুহূর্ত্তে ভেসে যায়, যদি দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে তা ধ্বনিত না হয়।—সহসা মনে হ'ল, মালতীর বদলে শুভা যদি তার সঙ্গে আসত? শুভা? আজ সে শুভার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় নি কি? শ্রমিকদের দাবির পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ যে শক্তি রয়েছে শুভারও অংশ রয়েছে তার পরিচালনায়। শুভা এই নূতন শহরের মালিকদের নিশ্চয় জানে। ওদের দাবি পূরণের অস্বীকৃতিতে

স্বৈরাচারের নমুনা দেখে মনে মনে নিশ্চয় হাসছে। মনের মধ্যে হু হু করে উঠল।

প্রান্তর পার হয়ে শহরে প্রবেশ করল মোটর।

মালতী বললে, মোড়ের মাথায় বাঁধবেন—নামব।

কেন—বাড়িতে পৌঁছে দিই না?

দোকানে দরকার রয়েছে—তা ছাড়া দু'এক জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যাব।

মোটর থেকে নেমে মালতী বললে, ঘণ্টাতিনেক পরে যখন ফিরবেন—আমাকে তুলে নেবেন কিন্তু।

আজই ফিরবেন?

ইচ্ছা তো আছে। নমস্কার। হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে মালতী এগিয়ে চলল।

আজকাল অন্তরঙ্গতার সুযোগে ওদের সামাজিক রীতিনীতি যথেষ্ট শিথিল হয়েছে। এতখানি একসঙ্গে এসে মাত্র তিন ঘণ্টার ব্যবধানে এই ভদ্রতাবোধ জাগল কেন তা বিস্ময়ের বিষয়। এ কি শহরের সনাতন বৃত্তি? বাড়ি আর মানুষের বেড়া চোখের সঙ্গে মনকেও আড়াল করে রাখে? একাকী মানুষ অত্যন্ত সহজ; কিন্তু বহু মানুষ এক হলেও একাকী হতে পারে না, আর সেই কারণেই সভ্য আচার-ব্যবহারের বহু অলঙ্কার তার গায়ে চাপানো।

চৌধুরী হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, কি খবর প্রশান্ত? বস—আগে এক কাপ চা খেয়ে তাজা হও—তারপর তোমার অভিযোগ শুনব।

প্রশান্ত চায়ের কাপ টেনে নিয়ে বললে, আমি যে অভিযোগ করতে এসেছি—এ আপনি জানলেন কি করে?

চৌধুরী হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, যারা—লক্ষ্মীর সাধনায়

পৃথিবীতে দাবার ছক পেতে বসে—তাদের কানকে সজাগ আর দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ রাখতেই হয়। এই দেখ—বলে মরক্কো চামড়া বাঁধানো একখানা ফাইল তুলে নিলেন বাঁ দিকের ট্রে থেকে। ফাইলের লাল ফিতে খুলতে খুলতে বললেন, এই ফিতে দেখে যেন মনে করো না—এটা সরকারী দপ্তরখানার মতই মেজাজদার!

প্রশান্ত ঈষৎ হাস্য করে বললে, না—তা মনে করব না। জরুরি ব্যাপারে—

চৌধুরী বললেন, হাঁ—কোটি কোটি টাকার ব্যাপারে তা মনে করা অন্যায় হ'ত না—কিন্তু—এই দেখ। একখানা নীল রঙের পুরু লেফাফা তুলে নিয়ে প্রশান্তর দিকে এগিয়ে দিলেন।

প্রশান্ত চিঠিটা বার করে পড়বার উদ্যোগ করতেই তিনি বললেন, চিঠি পড়বার আগে তোমার ব্যক্তিগত মতামতটা জানতে চাই। চিঠি লিখেছেন সর্ব্বেশ্বর—আর সকলের জবানীতে। ওঁরা জানাচ্ছেন—আয়ব্যয়ের হিসাব করে দেখা যায় শ্রমিকদের দাবি মেটাতে গেলে লাভের অঙ্কটা নাকি চুপসে যাবে। যা থাকবে তা ভূতের ব্যাগার খাটা মাত্র। তোমার মতটা নাকি দাবি মেটানোর দিকে—অবশ্য ন্যায্য দাবি। কিন্তু আমি জানতে চাই কাকে ন্যায্য দাবি বলবে তুমি?

প্রশান্ত বললে, বেশি মুনাফার লোভ না রেখে যথাসম্ভব ওদের দাবি মেটানো যায় যদি—

এই নিয়ে কবার মেটানো হবে ওদের দাবি?

তা বার তিনেক বোধ হয়।

কতটুকু সময়ের মধ্যে?

বছরখানেক।

প্রত্যেক ছ'মাস অন্তর ওরা যদি দাবি জানায়—তাকে ন্যায্য বলা যায়?

কিন্তু—

কিন্তু থাক। যুদ্ধের আগেকার জিনিসপত্রের দাম আজকের তুলনায় হয় তো পাঁচ ছ'গুণ কম ছিল। সেই অনুপাতে যদি মজুরি দেওয়া যায়—ফ্যাক্টরীকে চালু রাখা সম্ভব হয় কি ?

হয় না স্বীকার করি। তবু যতটুকু সম্ভব—

সেই যতটুকু কে ঠিক করে দেবে প্রশান্ত ? আমি মালিক—আমি পারব—না তুমি মজুর তুমি পারবে ? তোমরা প্রস্তাব করেছ কোন নিরপেক্ষ সালিস নিযুক্ত হোক—সেখানে শ্রমিক-আর মালিক-প্রতিনিধি থাক—বেশ ভাল কথা। কিন্তু তার আগে একটা কথা দু'পক্ষ থেকে ঠিক করে মেনে নেওয়া উচিত নয় কি ?

কি কথা বলুন।

ধর—আর দু'বার যে মজুরি বাড়িয়ে দিয়েছিলে—তাতে উৎপাদন কিছু বেড়েছিল ?

না—বরং—

বরং উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ—কিছু হাতে পেয়ে আরও কিছু পাবার আশায় ওরা মন দিয়ে কাজ করে নি। সেটা ওদের দিক থেকে সর্ত্ত ভঙ্গ বলা যায় কি না ?

যায়। কিন্তু···

কিন্তু নয়—ওরা সর্ত্ত ভঙ্গ করেছে। অভাবগ্রস্ত দেশে কম মাল উৎপন্ন করাটা—আইন থাকলে আর দেশ স্বাধীন হলে শাস্তিভোগের কোঠায় পড়ত কিনা ? আচ্ছা এসব না হয় ছেড়ে দিলাম। মালিকী-মনোবৃত্তি নিয়ে নয়—সোজা জিজ্ঞাসা করছি—ওদের দিক দেখে যতটা সুবিধা দেওয়া সম্ভব আমরা দেব—তার বিনিময়ে ওরা সন্তুষ্ট মনে কাজ করবে তো ? জানতো—সে হাঁস রোজ একটি সোনার ডিম দিতে

পারে—তাকে হত্যা করলে একসঙ্গে সে ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম দিয়ে যায় না।

প্রশান্ত সোজা হয়ে বসল। বললে, আপনার কথা আমি বুঝেছি। এ প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছে।

এটা আমার প্রশ্ন নয়—যে দেশে শ্রমিক-গবর্ণমেণ্ট আছে—যাঁদের শক্তিশালী ইউনিয়ন আছে, তাঁদের কথা। তারা যেমন ন্যায্য দাবি করে—তেমনি ন্যায্য শ্রম দেয়। ন্যায্য শ্রম দিতে পারে না যে শ্রমিক সে ইউনিয়নের সভ্য হতে পারে না। তাকে শাস্তি দেয় ইউনিয়ন।

আমাদের দেশে তেমন—

তেমন নিয়ম নেই কারণ সঙ্ঘ-নেতারা দুর্ব্বল। তাঁরা নেতাই থাকতে চান—শ্রমিকদের লোভের যোগান দিয়ে। ওদের লোভকে ন্যায্য পথে চালাতে শেখেন নি।

প্রশান্ত চুপ করে রইল। কি বলতে চান চৌধুরী? দাবি মেটানোর অনুকূলে ওঁর মত হয়ত—

চৌধুরী বললেন, ঘাবড়ে যেয়ো না হে, আমিও মানুষ—মানুষের দুঃখকষ্ট বুঝি। ওদের দাবি মেটানোর সপক্ষে মত দেব—তবে তথাকথিত শ্রমিক-নেতার হুমকিতে নয়। নিরপেক্ষ সালিস বসুক—বার বার নয়, একবারই ঠিক হোক চুক্তি। ন্যায্য দাম—ন্যায্য শ্রম। নিক্তির এদিক ওদিক হেললেই দায়িত্ব বহন করতে হবে।

প্রশান্ত বললে, নিক্তি নিয়ে বসলে সোনার ওজন ঠিক হতে পারে—মানুষের অভাব—

পাকাপাকি কিছু করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। দ্রব্যমূল্যের মান কমলে শ্রমমূল্য যে কমবে না এ কুযুক্তি অবশ্য মানব না—আবার দ্রব্যমূল্য আরও চড়ে যদি—

হাঁ—সেটা আমরা ঠিক করে নেব।

চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, ঠিক হবে না হে—ঠিক হবে না। শ্রমিকের নেই মাথা—শ্রমিক-নেতার নেই দূরদৃষ্টি বা সাধুতা।

সকলকে এ কথা বলবেন না।

সকলকে বলব এ স্পর্দ্ধা আমার নেই—কিন্তু যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি—প্রমাণ অবশ্য দেব। বলে একটা হলদে চিরকুট বার করে দুটি আঙুলে তুলে ধরে হাসলেন। এটা হ'ল যুদ্ধ-বিরতি পত্র। দশটি হাজার টাকা ঢাললে আপাততঃ এই বিরোধ মিটবে।

প্রশান্ত আরক্ত মুখে বললে, এ নিশ্চয় খাঁটি শ্রমিক-নেতার প্রস্তাব নয়—কোন জালিয়াত—

হাঁ—জালিয়াত। এরাই তো খুঁটি গেড়ে বসেছে জনগণের মাথায়। বড় অস্ত্র এদের হাতে ধর্ম্মঘট। এই অস্ত্র না থাকলে এদের প্রভুত্ব থাকত কোথায় প্রশান্ত?

প্রশান্ত বললে, যাই হোক—এদের কুকীর্ত্তির কথা এদের সঙ্ঘে জানানো উচিত।

প্রমাণ কই!—এ কাগজে স্বাক্ষর নেই—হাতের লেখা সনাক্ত করা কঠিন—তবু এ মিথ্যা নয়।

আপনি নিশ্চয় এই টাকা দেবেন না?

কেন দেব না? অধিকাংশ মালিকই যখন এই ঘুষ দিতে রাজী হয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন আমাকে, যাতে আমি অরাজী না হই।

প্রশান্ত মাথা নামিয়ে বললে, আমি ঘুণাক্ষরেও যদি জানতাম—

চৌধুরী বললেন, টাকার অঙ্কটা শুনতে ভারী, কিন্তু দরে ভারী নয়। অর্থাৎ এ দিয়ে যদি বছরখানেক ঠেকিয়ে রাখতে পারা যায় আন্দোলনকে

তো যথেষ্ট লাভ। এইবার চিঠিখানা পড়—লাভের হিসাব-নিকাশ তাও ওতে আছে—দেখ। আমি আসছি। পাইপ ধরিয়ে চৌধুরী কক্ষান্তরে গেলেন।

ঘরের একশো ওয়াটের বিদ্যুৎ-বাতিটা যেন নিবু নিবু হয়ে এল। পৃথিবী পরিবর্ত্তিত হচ্ছে এটা সত্য—কিন্তু অভাবনীয় এই দ্রুত পরিবর্ত্তনে যা সরে যাচ্ছে পায়ের তলা থেকে—যা মিলিয়ে যাচ্ছে সামনে থেকে, তাকে মেনে নেওয়ার ফুরসৎটুকুও যে পাওয়া যাচ্ছে না। কে অসাধু? শ্রমিক-নেতা, না মালিক? না—যুদ্ধোত্তর এই পৃথিবী?

চৌধুরী ফিরে এসে বসলেন চেয়ারে। নতুন চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে সস্মিত মুখে তিনি প্রশান্তর পানে চাইলেন।

প্রশান্ত পাংশু মুখ তুলে বললে, না-না, আপনি এতে রাজী হবেন না। রাজী হবেন না—

চৌধুরী ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—না, রাজী হই নি। তুমি শ্রমিক-নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে পার। সৎ ভাবে যা করা সম্ভব—শেষ পর্য্যন্ত আমার সমর্থন পাবে তুমি।

প্রশান্তর মুখে হাসি ফুটল।

২৮

কোথা থেকে চালাবে আলাপ-আলোচনা এই হ'ল প্রশান্তর চিন্তা। ট্রেড ইউনিয়নের আপিসে যাবে কি? কিন্তু সেখানে তথাকথিত বহু নেতা আছেন—যাঁরা সঙ্ঘকে ক্ষমতাশালী করবার জন্য বাঁকা পথটিই হয়ত বেছে নিয়েছেন। হলদে চিরকুটখানা যে অঙ্ক দাবি করছে, তা একের কল্পনাপ্রসূত বলে বিশ্বাস হয় না। শুভার কাছে যাবে? সে-ও

সঙ্ঘের একজন প্রভাবশালী সভ্য। বাঁকা পথের এই খবর সে হয়ত জানে না—হয়ত সমর্থন করে না এই অন্যায় নীতি। নীতির একটি অর্থই তার কাছে পরিস্ফুট। সে হ'ল সত্য। মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশার সুযোগ নিয়ে মানুষ যে স্ফীত হয়ে উঠবে এই কল্পনা তার কাছে অসহ্য। বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখলে চিরকুটখানা যথাস্থানে আছে কিনা। স্বাক্ষরহীন কাগজের দ্বারা হয়ত প্রমাণকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, তবু সঙ্ঘের নীতি যে নিষ্কলুষ নয় এটি তার সর্ব্বোত্তম নিদর্শন। প্রয়োজন হলে এটা কাজে লাগানো যাবে।

মোটর চৌধুরীর গ্যারাজে তুলে দিয়ে পায়ে হেঁটে চলল প্রশান্ত। সমান ভিত্তিতে চলুক আলাপ। মোটরে চেপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাড়ির দুয়ারে আসার অসঙ্গতি ইতিপূর্ব্বে তাকে যথেষ্ট পীড়িত করেছে। শুভা তার সান্নিধ্য থেকে খানিকটা সরে গেছে। তখন অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল। ওর সঙ্গী বহু—আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিভিন্ন—পদমর্য্যাদার শাল-আলোয়ান গায়ে চাপিয়ে সে বৃত্তে প্রবেশ করা সুকঠিন। ওদের মনে হয়—কম সীরিয়াস—নীতি-শিথিল—অপরিমিত-ভাষী তার্কিক; আর দেশের মাটিতে পা দিয়েও চেয়ে থাকে দূর বিদেশের বর্ণময় আকাশে। সে আকাশের যে ভাষা ইথার-তরঙ্গে এ আকাশের গায়ে সঙ্কেত বয়ে আনে দ্যুতিময় আখরে—নিখিলের দুঃখ-দুর্দ্দশার অর্থ বুঝি—

আপাততঃ সে শুভার বাসায় পৌঁছে গেল। সেই নড়বড়ে সিঁড়ি—সেই আলো-বায়ুবঞ্চিত বন্দী-নিবাস, মন-বিমুখ-করা পরিবেশ। বুকের মাঝখানে হৃৎপিণ্ডটা অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠবার পরিশ্রম, না বহুদিন পরে আসার সঙ্কোচ, না অবাধ্য রক্তের মধ্যে একান্ত আত্মীয়তার স্বাদলোলুপতা—বাস্তব-স্বপ্নে-মেশানো অদ্ভুত মনোময় আবেগে খানিকটা দুর্ব্বল আর খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়ল প্রশান্ত।

মাঝপথে এক মুহূর্ত সে থামলে—শুধু মুহূর্ত্তমাত্র—তারপর সবলে বৃত্তির গতিপথ ফিরিয়ে বাকি ক'টা ধাপ অনায়াসে অতিক্রম করলে।

ঘর থেকে বেরুচ্ছিলেন শুভার মা—তাঁর সঙ্গেই মুখোমুখি দেখা।

শুভার মা আনন্দ-মেশানো দুঃখ প্রকাশ করলেন, আর আস না কেন প্রশান্ত? তোমার কথা প্রায়ই মনে হয় আমাদের।

একটু হেসে কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিটাকে সে সহজ করে নিলে। বাহ্যতঃ এটি ত্রুটিস্বীকার।

শুভার মা বললেন, বস। শুভা এইমাত্র বেরিয়ে গেল। না না, তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকারী কথা আছে যে। তোমাকে দেখবার জন্য এইমাত্র আমি প্রার্থনা করছিলাম। ভগবান আমার কথা শুনেছেন।

অগত্যা বসতে হ'ল। শুভার মা ভূমিকা বাড়ালেন না। বললেন, শ' দুই টাকার বিশেষ দরকার যে বাবা! শোন নি বোধ হয়—মাসখানেক হ'ল শাশুড়ী ঠাকরুণ গত হয়েছেন। তাঁর শ্রাদ্ধের দরুণ আর ছেলেমেয়ে দুটোর আট মাসের মাইনেতে বেশ কিছু অভাব বোধ হচ্ছে। আর জানই তো, সংসারের খরচ আজকালকার দিনে—যে চালায় সে-ই জানে এর মর্ম্ম।

বুকপকেটে হাত দিয়ে নোটের বাণ্ডিলটা সে অনুভব করলে—কিন্তু এঁদের অভাবগ্রস্ত সংসারের দায় মিটানোর গরজ কি তার! যে সম্বন্ধ মধুর হতে পারত—অন্তরের সূত্রে অভিন্ন হতে পারত—তা ঘটনার স্রোতে হ'ল ভিন্নমুখী। এ আকাশ একদিন তারই ছিল অথচ এখানে স্বপ্ন-বিহার করার দুর্ব্বলতা আজ তার নাই। আশ্চর্য্য—হাত গুটিয়ে না নিয়ে নোটের বাণ্ডিলটা নিঃশব্দে সে টেনে নিলে। গুনলে না কত টাকা আছে—তেমনি নিঃশব্দে শুভার মায়ের দিকে হাতখানি বাড়িয়ে বললে, নিন।

শুভার মা-র কোটরগত চক্ষু উজ্জ্বল বোধ হ'ল। অশ্রুতে চক্‌চকে—প্রাপ্তির আনন্দে চক্‌চকে—দায়মুক্তির আশ্বাসে চক্‌চকে। বললেন, তাই তো বলি—ভগবান আছেন। নইলে আমাদের অভাব বুঝে তোমাকেই বা পাঠাবেন কেন আজ—আর ঠিক দু'শো টাকা—

দু'শো নয়—আরও বেশি আছে।

আরও বেশি! কিন্তু আর বেশি তো আমার দরকার নেই বাবা!

রেখে দিন—কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না।

শুভার মা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, হায়রে হতভাগী, তবু তুই ঘুরছিস টো টো করে! তোর বন্ধুবান্ধব—তোর সভা বক্তৃতা তোকে কি স্বর্গে নিয়ে যাবে! শোন বাবা—তুমি ওর কোন কথা শুনো না—ওকে জোর করে এ সব ছাড়িয়ে দাও।

আমার কথা শুনবেন কেন উনি?

না, শুনবেন না! শুভার মা উত্তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন। একশো বার শুনবে। তুমি ওকে যথেষ্ট ভালবাস আমি জানি। আর ও—ও তোমাকে ভালবাসে। যথার্থ ভালবাসে। না হলে—

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। রক্ত আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে—হৃৎপিণ্ড আঘাত হানছে বুকে। ধ্বক্-ধ্বক্-ধ্বক্। এই বর্ণলেশহীন আকাশ—এই আকাশেই স্বপ্নের ফুল ফুটতে সুরু হল বুঝি!

হ্যাল্লো—কমরেড—রেসের ঘোড়ার মত চলেছ কোথায়? চল—চল—

উঠে এসে বসতে হ'ল ঘরে। অন্ধকার ঘর, মনের ভাব-তরঙ্গ মুখের আয়নাতে কোন চিহ্ন ফুটিয়ে তুলবার ফুরসত পায় না। বেশ নিরঙ্কুশ কণ্ঠেই আলাপ চালানো যায়।

তোমার কাছেই নালিশ আছে আমার। প্রশান্ত সহজ কণ্ঠে বললে।

শুভা খিল খিল করে হেসে বললে, রক্ষে কর কমরেড—সারা পৃথিবীটাই নালিশে ভরে রয়েছে—কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা শুনব? আর নিজেকে যোগ্য মনে করি না—নালিশ শোনবার যোগ্যতা থাকা চাই তো।

ঠাট্টা নয়—সত্যি আমার কিছু বলবার আছে। প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে।

শুভা এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বললে, বেশ বল—কিন্তু সংক্ষেপে।

জানি, তোমার সময়ের দাম আছে! প্রশান্তর কণ্ঠে পরিহাসের প্রচ্ছন্ন আভাস।

শুভা বললে, আমি ক্লান্ত। এইমাত্র একজনের সঙ্গে তর্ক করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

ক্লান্ত? আচ্ছা সংক্ষেপেই বলছি।

সমস্ত শুনে শুভা বললে, আমি কি করতে পারি?

তুমি কিংবা তোমরা যেই হোক—ওদের বুঝিয়ে—

পেট কাঁদলে, না ধর্ম্ম না যুক্তি, কিছুতেই কেউ বোঝে কি কমরেড?

তবু দাবি ন্যায্য কি অন্যায্য—

সবটাই ন্যায্য—যাদের পরনে নেই কাপড—পেটে নেই অন্ন।

তর্ক করে লাভ নেই—দাবির যতখানি মেটানো যায় সেই চেষ্টা করতে হবে আমাদের।

আলোচনা মীমাংসার পথে গেল না। প্রশান্ত ঈষৎ উষ্ণ হয়ে বললে, সত্যি বলতে কি—এ তোমরা ওদের কথা বলছ না—তোমাদের জিদ্‌ বজায় রাখছ।

তাতে আমাদের লাভ?

লাভ ? লাভ এই—মাস্‌-মুভমেণ্ট জাগিয়ে তোমরা নেতাগিরি করতে পারবে। এই হচ্ছে তোমাদের সঙ্ঘের পাবলিসিটি।

রেগে উঠছ কেন প্রশান্ত? গাল দিলেই কিছু যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করা যায় না!

শুভার নিরুত্তাপ কণ্ঠে প্রশান্ত বেশি মাত্রায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বললে, তোমরা যে সাধু নও—তার প্রমাণ আমার কাছেই আছে। এই দেখ—

হলদে চিরকুটখানা সে শুভার কোলে ছুড়ে দিয়ে বললে, আশা করি এ লেখা সনাক্ত করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে না।

শুভা বললে, আচ্ছা বস—আলোটা জ্বালি।

না—বসব না। কাল সকালে আমি আসব।

মা কিন্তু দুঃখ করবেন।

প্রশান্ত প্রত্যুত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিকটা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে গোলদীঘিতে এসে বসল। দুপুরে লোক চলাচল কম থাকে—তবু শহর স্ফীত হয়েছে আগেকার চেয়ে। ট্রামের ফুটবোর্ডে লোক ঝুলছে—বাসের সর্ব্বাঙ্গে মানুষ। রাজপথে সশস্ত্র পাহারার ঘটা বিশেষ করে চোখে পড়ল। সিনেট হলে কোন সভা আছে? কোথাও কি উত্তেজনার কারণ ঘটেছে? আশ্চর্য্য কিছু নয়। যুদ্ধের উগ্রতা হ্রাস হলেও—উত্তাপ বেড়ে উঠছে পৃথিবীতে। দু' হাতে সঞ্চয় করে যারা উপরে উঠল—তারা নাগালের বাইরে—যারা নীচেয় রইল তারা মানুষের শ্রেণী থেকে নেমে পড়েছে—মাঝখানে কিছু নেই। প্রাসাদ-তোরণে নিপতিত ক্ষুধা-নিষ্পিষ্ট ভারবাহীর প্রাণহীন দেহ—প্রাসাদ-অলিন্দ-বিহারীর মনে একটুও তুফান তুলছে না। তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ মানুষকে এমনি উদাসীন করেছে—তার অন্তর থেকে লোপ করে দিয়েছে কোমল অংশ।

হঠাৎ জনস্রোত স্তব্ধ হ'ল—ঝড়ের আগেকার আকাশ নিঃশেষে টেনে নিল বায়ুকে। দূরে বহু কণ্ঠের চীৎকার। মিছিল আসছে—ভুখা মিছিল।

এ জিনিস নূতন নয়—অভাবিত নয়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এ রকমের ঝড় প্রতিদিনের ঘটনা। সাধারণ জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে অদ্ভুত-ভাবে খাপ খেয়ে গেছে।

সারি দিয়ে লোক চলেছে—নানা জাতি—নানা ধর্ম্মের লোক—গোটা ভারতবর্ষ মিশেছে কলকাতার রাজপথে। হাতে হাত মিলিয়ে যেতে যেতে চেঁচাচ্ছে অপরিমিত। ধ্বংস হোক—ধ্বংস হোক পুরাতন সব কিছু। কায়েমী স্বার্থের প্রাচীর-ঘেরা পৃথিবী জীর্ণ হয়ে এসেছে—জীর্ণ হয়েছে তার আচারগত মানবীয় বৃত্তি—সুপ্রাচীন আর্য্যামির গৌরবভার বহন করতে পারছে না তথাকথিত সভ্যতা। ধ্বংস হোক—সব কিছু ধ্বংস হোক। মুছে যাক শ্লেটের পুরাতন লেখা—আভিজাত্য সংস্কৃতি হোক লুপ্ত—বর্ণাভিমান যাক মুছে—কমলা আবার ফিরে যান সিন্ধুপুরীর মণিময় হর্ম্ম্যে।

প্রশান্ত মুখ ফিরিয়ে নিলে। বড় বেশি উদ্ধত—বড় বেশি প্রগল্‌ভ মনে হ'ল। সৃষ্টিকে নস্যাৎ করে দেবার দুঃসাহসে বড় বেশি আত্মপ্রত্যয়-শীল। সৃষ্টি কিছু শূন্যস্খলিত হয়ে পৃথিবী আশ্রয় করে নি—ক্রমবিকাশে গড়ে উঠেছে বিরাট সভ্যতা। মানবগোষ্ঠী নিয়মনীতির আনুগত্য মেনে এসেছে নিয়েছে—একনায়কত্ব—পশুহনন বৃত্তি থেকে উন্নীত হয়েছে কৃষিধর্ম্মে —গুহা থেকে এসেছে কুটিরে—বন্যবৃত্তিকে শৃঙ্খলিত করে দীক্ষা নিয়েছে মানবীয় ধর্ম্মে। এ তার এক দিনের খেয়াল নয়—এক যুগের সাধনা নয়—এক শতাব্দীর সঞ্চয়ও নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খাদ বার হয়েছে—সংস্কার হয়েছে বার বার—রাজা, রাজ্য, রাজসিংহাসন নিয়ে কত না পরীক্ষা হয়েছে

বারংবার। কেউ কি শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলবার দুঃসাহস করেছে বিশাল মহীরুহকে? তা হয় না। কাণ্ডে বসে মূলে কুঠারাঘাত করা—আর—

দুম্—দুম্—দুম্। দেবদারুর ডালে ডালে অসংখ্য কাক কা কা শব্দে ডানা ঝাপটে উঠল। বন্দুকের শব্দে ওরা এমনি কোলাহল করে। পথেও কোলাহল তীব্র হয়ে উঠল। দু'ধারের জনতা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। অগ্রগামী মিছিল থেকে চীৎকার উঠছে—ধ্বংস হোক—ধ্বংস হোক। ব্যাপার কি? একশ চুয়াল্লিশ ধারা বলবৎ, ওরা নিয়ম ভঙ্গ করেছে। ওদের সাবধান করা সত্ত্বেও নিষেধ মানে নি—অতএব আইন রক্ষার ভার নিয়েছেন সরকার।

লোক ছুটছে মিছিলের বিপরীত দিকে—মিছিলের অভিমুখে। বন্দুকের শব্দ—শোভাযাত্রীদের বিক্ষোভকে তীব্র করে তুলছে—অসহায় ক্রোধ মুহুর্মুহু চীৎকারে শাসনতন্ত্রকে ধিক্কার দিচ্ছে—সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুকামনা করছে।

আরও কয়েকটা বোমা ফাটল। প্রচুর ধোঁয়া আর দম-আটকানো একটা তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বায়ুস্তরে। নাক-মুখ-চোখ জ্বালা করতে লাগল।

সরে আসুন—সরে আসুন—কাঁদানে গ্যাস ছেড়েছে—সরে আসুন।

এখানে বসবেন না—এখনই সান্ধ্য-আইন জারী হবে। বাড়ি যান। আরে মশাই, ধর্ম্মতলার ব্যাপারটা ভুলে গেলেন? রামেশ্বর বাঁড়ুয্যে কেন মরেছিল জানেন?

পিছু হটতে হটতে প্রশান্ত কখন গোলদীঘির বাইরে এসেছে। এধারের রাস্তাটি নির্জ্জন। বৌদ্ধ বিহারের গা দিয়ে একটা বাঁকা গলি বেরিয়েছে। সেটার মধ্য দিয়ে ওপারে হ্যারিসন রোড এধারে মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পড়া যায়। তার পুরাতন মেসে যাবার পথ ওটা। বহুদিন এ পথে

আসে নি। মেসে দুই একজন পরিচিত আছে—তাদের সঙ্গে আলাপ করে যাবার আগ্রহ হ'ল প্রশান্তর। আইন থেকে সাময়িক ভাবে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা কিনা কে জানে।

হ্যাল্লো—কি খবর ?

বলছি।

সুশীলের বিছানার ওপর বসে পড়ে প্রশান্ত বললে, এক গ্লাস জল খাওয়া দেখি।

শুধু জল ! অস্ফুটে উচ্চারণ করে সুশীল বললে, তা ছাড়া আর কিই বা আছে। দোকানপাট এতক্ষণে হয়ত বন্ধ হয়ে গেল।

জল পান করে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, এত শীঘ্র যে আপিসের ছুটি হ'ল ?

আপিস ! সুশীল হাসলে, ষোলই আগষ্টের পর থেকে নিয়মকানুন ঢিলে হয়েছে। এক শ চুয়াল্লিশ ধারার ওপর কারফিউ অর্ডার—এ তো লেগেই আছে ; সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি সব সময়ে। যাই হোক—অনেক দিন পরে দেখা—প্রাণভরে গল্প করা যাবে'খন।

আমাকে এখনই যেতে হবে।

সুশীল হাসলে, যাবে ? রাস্তার এপিঠ ওপিঠ দু'পিঠে আঠার ঘণ্টা কারফিউ। কাল বেলা এগারটা পর্য্যন্ত এই জেলখানাতেই—হাসিটা ওর উচ্চ হয়ে উঠল।

প্রশান্ত পাংশুমুখে বললে, আমায় যে ফিরতেই হবে। বিশেষ জরুরি কাজ—

গল্পের চেয়ে জরুরি কাজ আপাততঃ নেই। বস ভাল হয়ে।

…গল্পের স্রোতে চিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল। সুশীল প্রধানমন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণার কথা তুললে। লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে

নিয়ে ব্রিটিশ তার প্রতিশ্রুতির আন্তরিকতা প্রমাণ করে নি কি? কিন্তু এই ঘোষণায় ভারত-সমস্যায় আর একটি যেন গ্রন্থি পড়ল। কার হাতে ক্ষমতা দিয়ে ভারত ত্যাগ করবে ওরা? অগ্রগামী একটি দল—অনুমান করা যায় কংগ্রেস—তারাই ক্ষমতা পাবে। সম্পূর্ণ ক্ষমতা অবশ্য নয়। লীগ-শাসিত প্রদেশ আছে—তাদের অনিচ্ছায় মূল অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে না। আছেন ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ। তাঁরা প্রতিশ্রুতি পালনের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত হয়ত প্রতীক্ষা করবেন। তাঁরা স্ব-স্ব স্বার্থ অনুযায়ী যদি অনিচ্ছুক হন—কেউ তাঁদের বাধ্য করতে পারবে না প্রধান অংশের অঙ্গীভূত হতে। এই সব গ্রন্থি ক্রমাগতই পড়ছে। সম্প্রতি পঞ্জাবে খিজির-মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে—তিরানব্বুই ধারায় শাসন চলছে। উনিশ শ আটচল্লিশের আগে যাতে পুরোপুরি পাকিস্তানী সাম্রাজ্যভুক্ত হতে পারে পঞ্জাব, তারই আয়োজন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সারা পঞ্জাবে আগুন জ্বলছে। সীমান্ত-প্রদেশ আর আসামেও আগুন জ্বালাবার ইন্ধন সংগৃহীত হচ্ছে। সিন্ধু তো ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র লীগশাসিত প্রদেশ বলে উনিশ শ আটচল্লিশের জুলাই থেকে স্বাধীনতালাভ করবে এই আশা ব্যক্ত করেছে। বাংলা দু'ভাগে বিভক্ত হবার জন্য রব তুলেছে। ফেব্রুয়ারির ঘোষণার ক্রিয়া সুদূরপ্রসারী বলেই মনে হচ্ছে। অছিগিরির চেষ্টা না থাকলেও—ভারতের মাটিতে অনেকখানি আশ্রয় যেন এই সব প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেই কায়েম হবার আশা রাখে। ভারতের মহাসাগরে—আর ভারতের মাটিতে—দু-একটি শক্ত শিকড় নামিয়ে ওরা কি আমেরিকা ও সোভিয়েট প্রতিদ্বন্দ্বিতার পূর্ণ পরিণতির দিন গুনবে না? ইতিমধ্যে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আসছেন। ঘোষিত হয়েছে তিনি ভারতের শেষ বড়লাট। ক্ষমতা যাতে সুশৃঙ্খলায় হস্তান্তরিত হয় তারই চেষ্টা তিনি করবেন। তবু একথা স্বীকার করতে হবেই—

ক্ষমতালাভের আশাতেই হোক কিম্বা ভারতের দুর্ভাগ্য বলেই হোক—শৃঙ্খলা আজ কোথাও নেই। হিমালয়ের শীর্ষ থেকে কন্যাকুমারিকার অগ্রবিন্দু পর্য্যন্ত বিপ্লবের হুঙ্কারে মুহুর্মুহু কাঁপছে।

২৯

সুশীল খেয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে।

প্রশান্ত বললে, আচ্ছা ঘুরে এখানেই আসব। কাজটা মিটিয়ে নিই—যে তোমাদের শহর, কখন কি আইন জারি হয়!

শুভাদের বাসায় এসে শুভার দেখা পেলে না—উলটে নূতন দুর্ভাবনা মাথায় চাপল। ওর মা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কাল নাকি শহরে ভারি হাঙ্গামা গেছে বাবা—শুভা সেই যে তোমার সঙ্গে বেরুল আর ফেরে নি। সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পরি নি। বুড়ো বয়সে আর কত সহ্য হয় বল ত! উনি কেঁদে ফেললেন।

কি সান্ত্বনা দেবে—প্রশান্ত চুপ করে রইল। মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে নেণ্টু আর খুকী। সেই রুগ্ন ছেলেটি আর সজীব মেয়েটি। মেয়েটির মুখখানি অত্যন্ত ম্লান। চোখেমুখে ওর পর্য্যাপ্ত প্রাণশক্তির আভাস—একটু আশ্বাসে—সামান্য স্নেহে আদরে আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ঝড়ের রাত্রির পরে প্রভাত এলেও সূর্য্যোদয় হয় নি—শাখাচ্যুত লতা মাটিতে লুটিয়ে আছে আধশুকনো পাতার ভারে। প্রশান্ত তাকেই ডাকলে কাছে—মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর জানালে। বললে,—কি খুকী—একটু জল খাওয়াবে?

আশ্বাস নয়, অথচ এই কথাতেই মেয়েটি উৎফুল্ল হয়ে ঘাড় নেড়ে হেসে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে গেল।

শুভার মা বললেন,—বস বাবা।

প্রশান্ত বললে,—আমি একবার খোঁজ করে দেখি—

একটু বোস—আমি আসছি…

ঘরের কোণে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল। হ্যারিকেনের সামনে খানকয়েক বই ছড়ান দেখে মনে হয়—ছেলেরা লেখাপড়া করছিল। মা চলে যেতে ছেলেটি সেখানে দাঁড়ায় নি। যেমন দুর্ব্বল ওর দেহ—তেমনি মনটিও হয়ত ভীরু—অপরিচিতের সান্নিধ্য এই ধরণের লাজুক ছেলেরা সহ্য করতে পারে না।

অন্যমনস্কে একখানা খাতা সে টেনে নিলে। খাতার ভিতর থেকে মনিঅর্ডার কুপনের চিলতে কাগজটুকু ওর কোলের উপর খসে পড়ল। মনে কৌতূহল না জাগলেও চোখের ধর্ম্ম পালন করলে চোখ। বেশ গোটা হরফে স্পষ্ট লেখা দু'লাইন সে অনায়াসে পড়ে ফেললে।

পঞ্চাশ টাকা পাঠালাম। পৌছান সংবাদ দিও। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। ইতি—

অবন্তী

মীরাট থেকে টাকা পাঠিয়েছে অবন্তী। নূতন চাকরী—মাইনে এমন বেশি কিছু নয়—আর সংসারে তার পোষ্য-সংখ্যাও কম নয়। তবু তাঁদের অভাব না মিটিয়ে—কোন্ সুবাদে শুভাকে সে টাকা পাঠালে? কোন্ সুবাদে? মন আলোড়িত হয়ে উঠল। ঝড় কিংবা মনোজগতের বিপ্লব বলা যায় একে। জ্ঞানের ক্ষেত্রটি ভূমিকম্পে ধরিত্রীর মত টলমল করছে—বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে মস্তিষ্ককেন্দ্রে ঘনিয়ে এল কুয়াসা। ঈর্ষ্যা অথবা অভিমান—অথবা দুঃখ-ক্ষোভ-মেশানো অস্বস্তি—কানের ডগা আর গণ্ডদেশ লেহন করছে মৃদু আগুনের শিখা। অন্ধকার পথে চলতে চলতে

হঠাৎ দূরে দেখা গেল প্রদীপ। চোখে তার আলোয় জাগছে বিভ্রম—তবু স্পষ্ট হ'ল অনেক রহস্য।

আনমনে সে অন্য বইগুলি ঘাঁটতে লাগল। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে—উচিত-অনুচিত বোধ থাকে না—মনও থাকে না সজাগ, নইলে লণ্ঠনের আলোয় সে দেখতে পেত, ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে শুভা মৃদু মৃদু হাসছে।

শুভা অবশেষে বললে,—আর কিছু পাবে না কমরেড, মিথ্যে বইখানা ঘাঁটছ !

চমকে সে মুখ তুললে। মুখ তার পাংশু হয়ে গেল। বিবেক তার ভদ্রতার ত্রুটিতে চোখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে উঠল। মাথা নামিয়ে সে অন্যদিকে চাইলে অপরাধীর মত।

শুভা সরে এসে বললে,—না না, অন্যায় কিছু কর নি। যে জিনিসে স্বত্ব তোমার স্থির করেই নিয়েছ—সে তো একান্ত করে তোমারই।

প্রশান্ত সবেগে মুখ ফিরিয়ে বললে, তার মানে ?

মানে আমি জানি না—মা জানেন। হাসতে হাসতে জবাব দিলে শুভা।

প্রশান্ত বললে, তুমিও জান—কেবল স্বীকার করতে ভয় পাও !

ভয় ? তা হবে ! শুভা এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবলে। ওসব কথা কাটাকাটি এখন থাক কমরেড—তোমার সর্ত্তগুলি আমি পড়েছি—পড়ে ভেবেছিও।

সর্ত্তের কথা পরে হবে—

আমার ধারণা ছিল—মিলের ব্যাপার নিয়ে তুমি অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করছ।

হাঁ—অনেক রকমের অশান্তি আমার—অস্বীকার করব না—কিন্তু তোমাকে যা বলবার—

শুভা বসে পড়ল তার পাশে। মৃদু শান্ত গলায় বললে, তোমার কথা আমি জানি। কোন অনাত্মীয় পুরুষ যখন কোন অনাত্মীয় মেয়ের কাছে একান্ত করে আর আগ্রহভরে কিছু বলতে চায়—তখন তার অর্থ অতি নির্ব্বোধ মেয়েও অনায়াসে বুঝতে পারে।

শুভা, তোমার মন বলে কোন বস্তু কি নেই? প্রশান্তর কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হ'ল।

শুভা হাসল—বললে, মনের বালাই না থাকাই ভাল। একটা মাত্র মন—অবন্তী টাকা পাঠায়—তুমি অর্থসাহায্য কর—সজ্য প্রাণ বাঁচানোর দায়িত্বটা বহন করে, কার প্রতি বেশি করে কৃতজ্ঞ হব বল?

প্রশান্ত কি বলতে যাচ্ছিল—হাত উঠিয়ে শুভা তাকে নিরস্ত করলে। কাছে এসে এইটুকু কি বোঝ নি—মতে আমরা ভিন্ন—পথও আমাদের এক নয়? তুমি চাও দাক্ষিণ্যে ধন্য করতে—টাকা দিয়ে হোক, মিষ্টি কথা বা ব্যবহার দিয়ে হোক কিংবা জীবনপাত করেও—দুর্গতদের ভাল করতে চাও। এ হ'ল খানিকটা ওপরে ওঠার ব্যাপার। আর আমরা চাই—যারা কাদায় পড়ে লুটুচ্ছে তাদের হাত ধরে কাদা মেখে তাদের দুর্গতির অংশ নিতে। তোমার আমার মিলবার সাঁকো কোথায় কমরেড?

না শুভা—

চুপ—অসম্মান যথেষ্ট করেছ—তাও সয়েছি অসম্মানকে অস্বীকার করার জোরে—কিন্তু অসত্যকে মানব না বলছি।

আমি তোমায় অসম্মান করেছি?

কর নি? কেন দু'শ টাকার বদলে মাকে বেশি টাকা দিয়েছ? আমার দুঃখ দূর করতে তোমার এত আগ্রহ কেন? পৃথিবীতে দুঃখী মানুষ আর তোমার চোখে পড়ল না!

শুভার কণ্ঠস্বর শুষ্ক—দৃঢ়। ও কি ক্রুদ্ধ হল? প্রশান্তর কি দোষ—মন যেখানে আত্মীয়তার সূত্রজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে—সেখানকার তুচ্ছ দুঃখকষ্টে বিচলিত হয়ে পড়া কি এমনই অস্বাভাবিক? পৃথিবীতে দুঃখী যথেষ্ট আছে—মনের সঙ্গে তাদের দুঃখ যুক্ত নয় বলেই তো নরম হবার অবকাশ আসে না। বড় পৃথিবীতে মানুষ অত্যন্ত ছোট—সে পৃথিবী বাইরের; কিন্তু কতকগুলি সূক্ষ্ম মমতা দিয়ে সেই ছোট মানুষ যে দুনিয়া তৈরি করে তাও কি খণ্ডিত নয়—ক্ষুদ্র নয়? অথচ সে মানুষ নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তখন তো আর ছোট থাকে না; সে হয় বৃহৎ—সে তখন অদ্বিতীয়।

শুভা বলতে লাগল, দোষ তোমার দিই না প্রশান্ত—জগৎটাই এমনি-ভাবে তৈরি। বহুকাল থেকে যা দেখে আসছি, যা শিখে আসছি—সংস্কারের ধারা কি সংস্কৃতির আলো—ধর্ম্ম কিংবা ঈশ্বর—ভালবাসা আর পরদুঃখমোচনের চেষ্টা—এ সব যে সৃষ্টিগত উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে দৃষ্টিকে আর মনকে অমনি করেই তৈরি করেছে। সবাই বলে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে, মানুষ মিলতে পারছে না তবু। ছোট ঘরে কলহ-কোলাহল করলে আমরা সৃষ্টি থেকে কি মুছে যাব না কমরেড?

প্রশান্ত ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। শুভার সব কথা ওর শ্রুতিস্পর্শ না করলেও তার আবেগ-গাঢ় স্বর ওর মনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সে যেন বলছে—বাইরেটা জগতের সব নয়—মানুষের তো নয়ই। এই বিশ্বসংস্কারের ভার তোমার আমার সকলের। সংস্কার করতে বিলম্ব হয়—রচনা কর নূতন করে। চিরাচরিত প্রথায়, নীতিতে, বিশ্বাসে, মিথ্যাশ্রিত সত্যে আঘাত লাগবে। প্রচণ্ড আঘাত। তবু এগিয়ে চল। এগিয়ে চল।

অবশ্য এ ধ্বনি ক্ষীণ, আর অবিরাম নয়। মাঝে মাঝে মনের পর্দায়

বাতাসের বেগে বেজে উঠছে। গভীর নয় বলেই কেন্দ্র-লগ্ন হতে পারছে না।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন মানসে ও বললে, আমার সর্ত্ত সব পড়েছ আর ভেবেছ বললে। সত্যিই কি সেগুলি স্বীকার কর না?

শুভা ওর মনোভাব বুঝলে। সহজ কণ্ঠে বললে, সবগুলোর কথা নিয়ে আলোচনা করব আর একদিন—আজ একটি কথা শুধু তুলব। তুমি বলেছ—আমাদের দেশে শ্রমিকদের সততা কম। তারা মজুরি বাড়িয়ে নেয় কিন্তু কাজে ফাঁকি দিতে কসুর করে না। এই ধীরপন্থা নীতিতে নাকি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—মানুষের দুঃখ ঘুচছে না!

অস্বীকার কর এ কথা? প্রশান্ত উদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

না, বরং স্বীকার করে নিচ্ছি তোমার অভিযোগ। কিন্তু প্রতিবাদ আমার এইখানেই যে, দোষ একলা শ্রমিকদের নয়।

মানে ধর্ম্মঘট না হলে—

একে একে তোমার কথার জবাব দেব প্রশান্ত। শিল্প উৎপাদন কমানোর জন্যে দায়ী একলা শ্রমিক নয়—মালিকও।

কিসে?

কেন—জিনিসের বাজারদর যাতে চড়া থাকে, মুনাফা যাতে বাড়ে তেমন কৌশলের কথা কোন দিন কোথাও পড়নি—কি তোমার মনে হয় নি? বেশি দিনের কথা নয়, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে বাংলায় যখন লক্ষ লক্ষ লোক মরছিল—যুদ্ধরত ইউরোপের যখন নাভিশ্বাস উঠেছিল—তখন আমেরিকা কত লক্ষ মণ খাদ্য-শস্য নষ্ট করে ফেলেছিল বাজারদর চড়া রাখতে—সে খবর নিশ্চয় রাখ। শোন—শিল্পের ক্ষেত্রেও এমন অসাধুতার দৃষ্টান্ত বহু আছে। ধনিকের ধারাই হ'ল—নিজেদের পুষ্টিসাধন।

কিন্তু—

ধর্ম্মঘট করে দুঃখী মানুষের লাভ কতটুকু প্রশান্ত! একান্ত নিরুপায় হয়েই শেষ অস্ত্র হিসাবে—

না—ওদের ক্ষেপিয়ে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা একজাতীয় নেতাদের পেশা। তাতেই তাদের নেতাগিরি টিকে আছে।

বেশ ত, সেই নেতাগিরিতে আঘাত দাও না! ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিলে সমাজ সুস্থ থাকে না।

আঘাত দেব কি করে—তারা যে বর্ণচোরা! যাদের ক্ষেপানো হয়, তাদের হিংসাকে, তাদের ধর্ম্মমতকে, এমন কি তাদের সব রকমের দুর্ব্বলতাকে অস্ত্রের মত ব্যবহার করতে এরা যে পটু!···কাল যে চিরকুটখানা তোমায় দিয়েছি—

ওটা যে তোমাদেরই সৃষ্টি নয়—

হাতের লেখাটা সনাক্ত করা শক্ত নয়। আর সেটা তুমি চেষ্টা করলেই পারবে।

চেষ্টা করব কমরেড। শুভা হাসল।

তার আগে ধর্ম্মঘটের যে গুজব শোনা যাচ্ছে—

গুজবে বিশ্বাস করো না। যারা দুর্ব্বল তারা মুখে একটুও আস্ফালন করবে না এ কেমন করে আশা কর কমরেড?

প্রশান্ত উঠবার ভঙ্গি করে বললে, কাল আসব কি?

সুবিধে হয় আসবে—না হয় চিঠি লিখে জানাব।

সিঁড়িতে নামবার মুখে শুভা বললে, একটা ক্রটি স্বীকার করে রাখি কমরেড। তোমার টাকাটা আপাততঃ ফিরিয়ে দিতে পারছি না। তুমি হয়ত বলবে—যদি আত্মসম্মানে বাধল তো ও জিনিস নেওয়া কেন! আমার উত্তর—অবস্থার চাপ। ওটা আত্মসাৎ করব না—ফিরিয়ে দেব—তবে বিনা সুদে।

প্রশান্ত আরক্ত মুখে বললে, তোমার এ আঘাতও স্বীকার করে নিলাম শুভা।

আর কোন কথা না বলে সে সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে নেমে গেল।

৩০

যত বার শুভার সান্নিধ্য থেকে সরে এসেছে—তত বারই মনে হয়েছে, এক একটা দুঃস্বপ্নের অবসান হ'ল। মনে হয়েছে, সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে বৃহত্তর পরিধিতে বুঝি মুক্তি এল এগিয়ে। আসক্তির বাষ্প তরল হবামাত্র কর্ত্তব্যের পথ স্পষ্ট ফুটে ওঠে সামনে। প্রশান্ত তখন ভিন্ন মানুষ। তবে সে কাঠিন্যও কিছু দিন বাদে দ্রব হতে থাকে, যেখান থেকে আঘাত খেয়ে বিমুখ হয়েছিল চিত্ত—আবার সেই দিকেই তার গতিবেগ প্রসারিত হয়। আবার জমে বাষ্প—আশায় আবেগে উচ্ছ্বাসে আবার সব-ভাসানোর—সব-ভুলানোর মত্ততায় সে অধীর হয়ে ওঠে। দুর্নিরীক্ষ্য নক্ষত্রের নাগাল পাবার জন্য—এত আগ্রহ কেন—সে রহস্য কে বোঝাবে তাকে! ঘৃণা কি মানুষকে নিকটবর্ত্তী করে? বেদনা কোন্ আনন্দ-অমৃতরসের সন্ধান দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে লঘু করে আত্ম-বিশ্বাসকে শিথিল করে দেয়? দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বুঝি পূর্ণত্বের প্রথম সোপান?

এ অন্যায়—অন্যায়। শুভা আজ তাকে আনন্দ দিতে পারে না—পূর্ণতা তো নয়ই। ওর কাছে এসে কেবল অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করবার বাসনা হয়। যুক্তি দিয়ে যুক্তি খণ্ডনের পুলক সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করা যায়। ওকে অস্ত্রহীন করে যদি বাধ্য করাতে পারে আত্মসমর্পণে অর্থাৎ পরাজয় স্বীকারে—তার চেয়ে বড় সম্পদ প্রশান্তর কামনাতে আর কি-ই বা আছে! কিন্তু এই দণ্ডে মনে হচ্ছে—এ খেলার মত তুচ্ছ জিনিস

জগতে কিছু নাই। আনন্দ-অমৃতের সন্ধান শুভাই তাকে দেয় নি—মালতীও দিয়েছে পূর্ণতার ইঙ্গিত। একখানি ঘর, একটি মধুর সঙ্গ, নির্জ্জন অবসর আর আত্ম-উদ্ঘাটনের মুহূর্ত্তে আত্মনিমজ্জন—পৃথিবীতে এই পাওনাটাই তো নর-নারীর সর্ব্বোত্তম সম্পদ। শুভা মরীচিকা—মালতী বন্দর। মালতী পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তার আত্মার সমীপে এসে দাঁড়িয়েছে—তাকে প্রত্যাখ্যান করবার ক্ষমতা প্রশান্তর নাই। এ রকম আত্মবঞ্চনা সে নাই বা করলে!

হাঁ অন্যায় হয়েছে—কালই মালতীকে নিয়ে তার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। শুভার সঙ্গে বুঝাপড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে পার্টির অণুতম অংশ শুভা—সেই পার্টির কাছেই তার দরকার। তাদের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনকে যুক্তিবলে স্বমতে আনলেই ব্যাপারটার আশু নিষ্পত্তির সম্ভাবনা ছিল। অথচ আলোচনার ছুতায় শুভাকে আর একবার দেখে···

পায়ের গতি দ্রুত হ'ল। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে দেখলে ট্রাম ডিপোর কাছে জনতা। কারা উত্তেজিতভাবে কি বলছে—মাঝে মাঝে চীৎকার উঠছে শ্রমিকের ন্যায্য দাবি নিয়ে। ওরা শাসাচ্ছে ধর্ম্মঘট করবে। আট হাজার শ্রমিক রুখে দাঁড়িয়েছে বিলিতী মালিকের দ্বারা শোষিত না হবার দৃঢ় সঙ্কল্পে। আয়ের অঙ্ক যাদের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সে উপচে পড়ছে, তাদের কর্ম্মচারীরা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে চারশো গুণ দ্রব্যমূল্য যুগিয়ে অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করছে। যা সামান্য মুষ্টিভিক্ষা রেশনে ও মাগ্‌গি ভাতায় মিলছে—তা 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম'। ওরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে ধর্ম্মঘট করবে।

পাশ থেকে একজন বললে,—পনেরোটা দিন সবুর করলেই হ'ত—বিলেতের কর্ত্তাদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া হ'লে—

একজন রোগামত ছোকরা খেঁকিয়ে উঠল, বুঝাপড়া তো মাসখানেক থেকে চলছে। ন্যাকা! কর্ত্তারা কিছু জানে না—না?

তবু—

না—মশাই—না—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হওয়া দরকার। —উৎসাহে ছোকরার মুখ-চোখ জ্বলছে।

প্রশান্ত সরে এল। এ সব আলোচনা তার ভাল লাগছে না। আগুন জ্বললে দাহ্য বস্তুর বিচার-বিবেচনা নিরর্থক। ধর্ম্মঘট হবেই।

মালতীর সন্ধানে সে যথানির্দ্দিষ্ট গলির মধ্যে প্রবেশ করলে। কিন্তু বাড়ির নম্বরটা ঠিক মত মনে পড়ল না। বারকয়েক গলির এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়ে আবার ফিরে এল বড় রাস্তায়। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। মেসে ফিরে যাবার ইচ্ছা তার নেই—একটা মাঝারি মত রেষ্টুরেণ্ট দেখে ঢুকে পড়ল।

শুধু আসন্ন ট্রাম-ধর্ম্মঘটের নয়—আরও বহু জায়গায় ধর্ম্মঘট চলছে ও চলবে তারও কর্ণরোচক মন্তব্য শোনা যাচ্চে। পোর্ট-ট্রাষ্ট নাকি কুড়ি হাজারের ওপর কর্ম্মচারী নিয়ে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। প্রস্তুত হচ্ছে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক—রাস্তায় রাস্তায় ওদের প্রাচীরপত্র দেখা যাচ্ছে। একশো চুয়াল্লিশ ধারা না থাকলে ধর্ম্মঘট ঘোষণার বন্যায় কলকাতা পরিপ্লাবিত হয়ে যেত।

ভাবতে ভাবতে আবার সে ফিরে এল সেই গলিটায়। গলিটা বার দুই পরিক্রমা করলে। যদি পরিচিত কারও দেখা মেলে—কিম্বা মালতীই যদি দৈবক্রমে তাকে দেখে ছুটে আসে।

দুপুর বেলা—গলিটা নির্জ্জন আর আলো-আঁধারী। কারণ সঙ্কীর্ণ অষ্টবক্রাকৃতি গলি। লোকজনের চলাচল কম। চার বার পাক খেয়ে গলিটা বড় রাস্তায় এসে মিশেছে। দ্বিতীয় বার পরিক্রমা সেরে প্রশান্ত

যেমন মাঝামাঝি একটা বাঁকের কাছে পৌঁছেছে—অমনি তার মনে হ'ল, কারা যেন সুড়ুৎ করে সরে গেল অন্ধকারের মধ্যে। দুষ্কৃতকারী না হলে অমন করে পালাবে কেন ওরা ?

কে—কে—ওখানে ? প্রশান্ত চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি কঠিন দ্রব্যের আঘাত এসে পড়ল মাথায়। অতর্কিত আক্রমণের বেগ সহ্য করতে পারলে না—জ্ঞান হারিয়ে ও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তার পর কিছুদিন কাটল ছায়ার জগতে। পরিচিত পৃথিবীর বহু দূরে সে লোক। তন্দ্রা-জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হ'ল। অগাধ আলস্যে মন্থর হয়ে উঠল মুহূর্ত্ত—বিস্তৃত হ'ল দিন—আবার গভীর নিদ্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল—কোন চিহ্ন না রেখে। কত সংবাদ শ্রবণ-পথে অর্থহীন প্রবাহে ভেসে এল—নিদ্রা আর অর্দ্ধ চৈতন্যে মিশে তারা কালসমুদ্রে হারিয়ে গেল একে একে। প্রায়ই দেখা দেয় সুপ্রসাধিতা একটি মেয়ে। মমতাভরা দুটি চোখে তার পলক পড়ে না—সেবানিপুণ করে প্রশান্তর মাথার চুলে সে পরিচর্য্যার স্পর্শ রেখে দেয়।

সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর স্পর্শে চৈতন্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত হতে চায়—আবার ছেয়ে আসে গভীর অন্ধকার। এমনিভাবে চলতে চলতে এক দিন সে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কোথায় ?

মেয়েটি ছুটে এসে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, আমায় চিনতে পারছ ?

ক্ষীণস্বরে প্রশান্ত উচ্চারণ করলে, মালতী।

মেয়েটির মুখচোখ আনন্দে ঝলসে উঠল। পরম স্নেহে প্রশান্তর মাথায় হাতখানি রেখে বললে, ঘুমোও।

আমি কোথায় ?

আমাদের বাড়িতে।

প্রশান্ত মাথা নাড়লে। জ্ঞান ফিরে আসছে—মালতীও ফিরে এসেছে, কিন্তু সে কোথায় ? অস্থির হয়ে উঠল প্রশান্ত। হাত দিয়ে টেনে মাথার বালিশটা খাটের একধারে সরিয়ে দিলে—ডান হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটাকে অল্প তুললে—বিস্ফারিত চোখে মালতীর পানে চেয়ে বললে, না—না—এসব সরিয়ে নাও—সরিয়ে নাও। ওরা ধর্ম্মঘট করেছে—বুঝতে পারছ না ?

মালতী তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোমল কণ্ঠে বললে, কেউ ধর্ম্মঘট করে নি—তুমি ঘুমোও।

শরীরে ক্লান্তি—মনে কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে কৌতূহল জেগে উঠছে। ও একটার পর একটা প্রশ্ন করেই চলল। অবশেষে ওর জিজ্ঞাসায় ক্লান্ত হয়ে মালতী উঠে গিয়ে রেডিয়োর চাবিটা ঘুরিয়ে দিলে। স্বরের অনর্গল প্রবাহ বয়ে চলল :

আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলন শেষ হ'ল আজ। গান্ধীজী বললেন—এক-দুনিয়া তৈরির মহৎ ব্রত এশিয়াবাসীরা যেন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত নেহরু বললেন, ইউরোপের শক্তির উৎস আজ দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একটি ধারা আত্মসাৎ করেছে আমেরিকা—আর একটি ধারা এশিয়াতে পৌছল। দু'শো বছরের নিপীড়িত মানুষেরা সেই শক্তিকে যেন সত্যের মহিমায় শুদ্ধীকৃত করে নিতে পারে। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদে এই বিশোধিত শক্তি আঘাত করুক প্রচণ্ড ভাবে, এশিয়ার জাগরণ হোক—পৃথিবীর নির্য্যাতিত মানবের কল্যাণময় জাগরণ।

এর পর ভারতবর্ষের জয়যাত্রা সুরু হ'ল। ঘটনার পর ঘটনার প্রবাহ ত্বরিত গতিতে বয়ে চলল। বিদায় নিলেন ওয়াভেল—শেষ বড়লাট হয়ে এলেন মাউণ্ট ব্যাটেন। ভারত-সমস্যার মীমাংসার জন্য ত্বরান্বিত হয়ে উঠলেন তিনি। তিন মাসের স্তিমিতপ্রায় অগ্নি—জাতিবিদ্বেষ—আবার জ্বলে উঠল। যে যেখানে প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিল সবাই তৎপর হয়ে উঠল। কেউ বললে, দ্বিজাতি-তত্ত্বের ফয়সালার জন্য এ একটা চাপ—কেউ বললে, না, এটা বিদায়ী ব্রিটিশের কূটনীতি। দিনে দিনে নরশোণিতে ঘাতকের অস্ত্র হ'ল রঞ্জিত—পাঠান-পুলিসের অত্যাচারে শহর হ'ল দূষিত। পঞ্জাবেও আগুন জ্বলে উঠল। মুসলিম লীগ দৃঢ় পণ করলে—পাকিস্তান চাই-ই। জীবন-পণ। হিন্দুর ষড়যন্ত্রজাল ছেদন করে মুসলিম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করলে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। অবশেষে কংগ্রেসও টলল তার দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে। দ্বিখণ্ডিত বাংলা আর দ্বিখণ্ডিত পঞ্জাবের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে। প্রস্তাব নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ছুটলেন বিলেতে। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি ঘোষণা করলেন—যেহেতু নেতৃবৃন্দ অখণ্ড ভারতের আপোষ-মীমাংসায় রাজী নন সেজন্য ভারতবর্ষ দুটি খণ্ডে বিভক্ত হবে—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। সেই সঙ্গে পঞ্জাব আর বাংলাও বিভক্ত হবে। দুটি গণপরিষদ বসবে—প্রয়োজন হলে দু'জন গভর্ণর-জেনারেল। দেশীয় রাজারা যে-কোন একটি গণপরিষদে যোগদান করতে পারবে। আর কোন বিভাগ হবে না। কেবল শ্রীহট্ট জেলা গণভোটের দ্বারা আসামে থাকবে কি বাংলায় যাবে—ঠিক হবে। আর সীমান্ত প্রদেশেও গণভোট প্রযুক্ত হবে। ওখানকার কংগ্রেসী মন্ত্রী বহাল থাকা-না-থাকা তারই দ্বারা

নির্ণীত হবে। ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্য্যাদা দেওয়া হবে—আর পনেরই আগষ্টের ভিতর ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। একে ওরা জুনের পরিকল্পনা বলা হল।

মলয় এক মনে ডায়েরি লিখছিল : ভারতবর্ষের এই পরিবর্ত্তন আমাদের নিজ শক্তি সম্বন্ধে প্রত্যয়শীল করে তুলেছে। এক দিন দুর্গম অন্ধকারে যাত্রা হয়েছিল সুরু—পথের নিশানা দৃষ্টিগোচর ছিল না—মনের দৃঢ় সঙ্কল্পে পথ চলা সুরু হয়েছিল। লাঞ্ছনা নির্য্যাতন সয়ে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে সর্ব্বস্বান্ত হবার পর যে পথ আজ সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল তার আবিষ্কার ইতিহাসে নজীর হয়ে থাকবে—বিশ্বের বিস্ময়ও বটে! বিনা রক্তপাতে···ভ্রূকুঞ্চিত করে এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে থেকে মলয় হাসল। আবার সে কলম তুলে নিয়ে লিখলে, এই ভাবে বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতনতর অধ্যায় সংযোজিত হ'ল। বিনা রক্তপাতেই বটে! শক্তির কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে আঘাত পড়ছে—টুকরো ভারত শুধু নয়—জাতি-বিদ্বেষ ও শক্তি বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান উপকরণ হয়ে আরও কতকাল ধরে এই দেশকে—প্রত্যক্ষ না হোক অলক্ষ্য-নিয়ন্ত্রিত পরশাসনের ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ করে রাখবে, কে জানে! ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব তো চলছেই—পৃথক অস্তিত্বে সে বিদ্বেষের নিবৃত্তি ঘটবে এ ধারণা হয়ত ভুল। তবু আলাদা না হয়ে আজ গত্যন্তর নাই। রুগ্ন অঙ্গে অস্ত্রোপচারের দ্বারা আসল মানুষটাকে সুস্থ করে তুলবার মত আশা পোষণ না করে উপায় কি! আবার খণ্ড ভারত জোড়া লাগবে—যদি মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। মানুষ সৃষ্টি করেছে দেশকে—মানুষকেই আবার দাঁড়াতে হবে দৃঢ় সঙ্কল্পে—যাতে ক্লেদ-পঙ্কিল বিষাক্ত বাসনাগুলির ধ্বংস সাধন হয়।

সুচিত্রার হাসিতে মলয় মুখ তুলে চাইলে। ও এতক্ষণ চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে মলয়ের লেখনী-চালনা লক্ষ্য করছিল। কলমের ডগায়

বাইরের ঘটনা মনের রসে অভিষিক্ত হয়ে যা ব্যক্ত করছিল তা একান্ত মলয়ের বক্তব্য নয়। রক্তমোক্ষণজনিত দৌর্ব্বল্যে পৃথিবী ফিরে পেতে চাইছে এমন শান্তি যা সত্যকারের কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা তাই জাতিকে সতর্ক করে দিচ্ছেন—পরমাণুর ধ্বংসকর শক্তি বাড়াবার গবেষণা এইবার ইতি হোক। মানুষ আর তার সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্য এই অনুসন্ধিৎসাকে নিবৃত্ত করতেই হবে। অস্ত্র সঞ্চয় করে যুদ্ধ করব না—এই নীতি অচল। আগেকার বহু যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী গত দুটি মহাযুদ্ধে এর প্রমাণ স্বাক্ষরিত রয়েছে। সুচিত্রার হাসির পরও কলম নিয়ে মলয় ঐ ক'টি লাইন যোগ করে দিলে।

ডায়েরি বন্ধ করে সে হাসিমুখে বললে, তোমার হাসির কারণ?

কারণ—সৃষ্টির আদিযুগের প্রথম কথাটি মনে পড়ল। পুরাণে আছে না—সুর-অসুরের দ্বন্দ্ব পৃথিবীর জন্মকাল থেকে চলে আসছে। সমুদ্র মন্থনে এর সূত্রপাত—

মলয় বললে, তখন অসুরেরা ছিল বর্ণজ্ঞানহীন, কাজেই তাদের কীর্ত্তির কথা পুরাণে নাই। তবু সুচিত্রা, সেই প্রথম যুগের বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া আজও চলছে।

আজ অসুরেরা কোথায়—দেবতাই বা কে?

সেটা এক কথায় বলা শক্ত নয়। আর বললেও কেউ মানবে না। হিটলারের 'আমরা আর্য্য' নীতির প্রত্যুত্তরে রাশিয়ার নৃতত্ত্ববিদেরা ঘোষণা করেছেন, সভ্য মানুষের আদি জন্মভূমি নাকি ঐ দিকে—স্বর্গ বলতে সেকালে যা বোঝাত তা উরাল পাহাড়ের ওপিঠে কোন দেশ।

আচ্ছা—ওসব বড় বড় কথা না বললেও আমরা জানি—আজকার অসুরেরা আর বর্ণজ্ঞানহীন নয়—তারা বুদ্ধিহীনও নয়। তারা বেশ বদল করেছে বলে আমরা তাদের চিনতে পারছি না।

আজকের দেবতারা কে ?

আজ দেবতার সংখ্যা কমে গেছে—এত কম যে আঙুলের পর্ব্বে এসে দাঁড়িয়েছে সে সংখ্যা। যাই হোক—তোমার মিলনতত্ত্বের মধ্যে এই কথাটিও লিখে রাখ—দুটি পরস্পর-বিপরীত-ধর্ম্মী দ্রব্যের মিশ্রণেই সৃষ্টির উন্নতি—সৃষ্টির সার্থকতা। অনেক চেষ্টা করেও—আধবুড়ো বয়সের মাথার কাঁচা চুল থেকে পাকা চুলগুলো নিঃশেষ করা যায় না—তেমনি এই সৃষ্টিকেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তবে চেষ্টা করব না ? মলয় হাসল।

বাঃ! না হলে বেঁচে থাকার অর্থ কি রইল !

মলয় কলম তুলে নিয়ে বললে, দাঁড়াও, তোমার মন্তব্যটা লিখে রাখি।

সুচিত্রা ওর হাত চেপে ধরে বললে, না। কলম রেখে এটা পড়ে ফেল তো চট্ করে। একখানা চিঠি সে এগিয়ে দিলে।

খাম ছিঁড়ে মলয় বার করলে চিঠিখানা। চার পৃষ্ঠার চিঠি—আসছে গ্রাম থেকে। মায়ের জবানীতে লেখা। পুত্রকে স্নেহ জানিয়ে তিনি লিখেছেন কিছু টাকা পাঠাতে। আর জানিয়েছেন মেজ ছেলে ও পুত্রবধূর আচরণের কথা। তা ছাড়া দেশের সংবাদও জানিয়েছেন সবিস্তারে। তাতে জানা যায়—দেশ এখন শান্ত। আসন্ন বাঁটোয়ারা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা তো চলছেই—খানিকটা উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়েছে। বড়লাটের ঘোষণা অনুযায়ী—অস্থায়ী বিভাগে কোন পক্ষ উল্লসিত—কোন পক্ষ ম্রিয়মাণ হলেও র‍্যাডক্লিফ-রোয়েদাদের দিন গুনছে। তখন কিছু অশান্তি ঘটতে পারে—তবে সবাই আশা করে কলকাতায় নোয়াখালির পুনরাবৃত্তি হবে না। মলয়ের কি মত ?—এসব মায়ের জবানীতে এলেও লেখকের অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ। আর একটা খবর

সর্ব্বশেষে দিয়েছেন মা এবং সকাতরে জানিয়েছেন, যে যেখানে থাকুক জন্মভিটার টানে মায়ের কোলে একদিন ফিরে আসেই। মলয় কি ফিরে আসবে না? সর্ব্বশেষের খবরটি এই—দুর্গামোহন পক্ষাঘাতে মারা গেছেন—প্রশান্ত বাড়ি ফিরে এসেছে। সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে—ওর বাগ্‌দত্তা বধূ। রূপে-গুণে মেয়েটির তুলনা নেই। আবার ধনবতীও। শোনা যাচ্ছে এই বিয়েতে যৌতুকই পাবে একটা লাখো টাকার সম্পত্তি—

মলয় হেসে বললে, রূপগুণের ওজনটা খাঁটি, কি বল চিত্রা?

সুচিত্রা বললে, যতই সাম্যবাদের জাঁক করি না আমরা আমাদের মন থেকে ও-বিষ সহজে যাবার নয়।

যাবে দেশে?

না। মুখ নামিয়ে সুচিত্রা উত্তর দিলে। সেবারও তো যাবার সব ঠিক করেছিলাম কিন্তু—

শেষ পর্য্যন্ত আমিই পিছিয়ে ছিলাম—নয়? কি করি চিত্রা—মার সেই চিঠিখানা যদি না আসত—!

আজ তো মা তোমায় যেতে লিখেছেন।

তোমাকে যেতে লেখেন নি?

তবু তোমার কর্ত্তব্য—

মলয় একটু হাসল। বললে, জান চিত্রা—এই পৃথিবীটা আশ্চর্য্য। সম্পদ আমাদের মনকে এতখানি বিষিয়ে তুলেছে যে আসল-মেকি চিনলেও—মানতে পারি না। একটু থেমে বললে, আমি না গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিই যদি—তাতেই মা খুসি হবেন। হয়ত বেশি খুসি হবেন। মৃদু একটা নিঃশ্বাস পড়ল।

সুচিত্রা বললে, এমনও হতে পারে দুটি জিনিসই তাঁর অত্যন্ত দরকারী।

স্বাভাবিক সেটা। সংসার যাকে ঘিরে ধরেছে চারিদিক থেকে—সে সংসারের তুচ্ছ জিনিসটিকে পর্য্যন্ত আগলে রাখতে চায়। তা হয় না বলেই আমরা অনেক দুঃখ পাই।

মলয়ের গভীর দুঃখ সুচিত্রাকে স্পর্শ করল। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে সে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিলে। আচ্ছা, প্রশান্ত-ঠাকুরপো তা হলে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করলে না—যার জন্য ও বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল?

মলয় বললে, সে এখন একটা ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার—তার মনের খবর জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি?

সুর আগেই কেটে গেছে—এ প্রসঙ্গটাও তাই ভেসে গেল। সুচিত্রা আর কি বলবে ভেবে পেলে না। টেবিলের ওপর একখানা বই পড়ে ছিল, গান্ধীজীর নোয়াখালি-ভ্রমণের বৃত্তান্ত। গান্ধীজীর সত্য-পরীক্ষার শেষ অধ্যায়। পরীক্ষা শেষ হতে-না-হতে তিনি বিহারে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গেছেন দিল্লীতে। স্বাধীন ভারতের কর্ত্তব্য নির্ণয়ে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন—অত্যাসন্ন স্বাধীনতার মুখে চারিদিকে জ্বলছে আগুন। গান্ধীজী তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে রোধ করতে চান এই বহ্নিবিস্তৃতিকে—অকল্যাণকে।

বইখানা হাতে নিয়ে সুচিত্রা বললে, পড়বে?

মলয় বললে, বেশ ত। গান্ধীজী বলেন, স্বাধীনতা আসছে। এত দিন পরশাসনের প্রতিবাদে যে সংগ্রাম-শক্তি আমরা প্রয়োগ করেছিলাম—সেই শক্তিকে গঠনের কাজে নিয়োগ করতে হবে। ভারতীয় রাষ্ট্র ভারতবর্ষীয়দের রাষ্ট্র—কোন ধর্ম্মগত দাবি নিয়ে সে সার্থক হতে পারবে না। স্বাধীনতা আর স্বরাজ এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টা বড় জান সুচিত্রা?

সুচিত্রা বললে, স্বাধীনতা?

না স্বরাজ। মলয়ের সংক্ষিপ্ত গম্ভীর স্বর নিস্তব্ধ কক্ষে প্রতি-ধ্বনিত হ'ল।

স্বাধীনতার সাধনা আমাদের প্রায় শেষ হয়ে এল—এবার চলবে স্বরাজের সাধনা। শোন।

মলয় বইখানি হাতে তুলে নিলে।

৩২

স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার শেষ অধ্যায় চলছে। কঠিন পরীক্ষা সম্মুখে। বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে—বহু প্রতিবন্ধক রয়েছে সামনে। মার্চ্চের শেষ থেকে আবার যে আত্মঘাতী কলহ সুরু হয়েছে কলকাতায়, তার মধ্যে স্বাধীনতার ঘোষণাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া যাবে কি না—এই আশঙ্কা জাগছে সকলের মনে। পূর্ব্বপাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে আবার ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হবে হয়ত। গান্ধীজী আশ্বাস দিয়েছেন ঐ দিন তিনি পূর্ব্ব-পাকিস্তানে থেকে স্বাধীনতা-দিবস পালন করবেন। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভা কায়ালাভ করবে; সরকারী কর্ম্মচারীদের লিখিত ভাবে জানাতে হবে—পাকিস্তান অথবা ভারতবর্ষ—কোন্ ডোমিনিয়নে তারা যোগদান করবে। পাঠান-পুলিস কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ভাগাভাগির কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ নিয়ে—পদস্থ কর্ম্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। গান্ধীজীও এসেছেন কলকাতায়। দু-একদিন এখানে কাটিয়ে যথাসময়ে তিনি নোয়াখালি যাবেন। সংবাদপত্রের নিত্যনূতন সংবাদে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

আর সেই উত্তাপের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল অচিরেই। হানাহানি কাটাকাটি ত চলছিলই—স্বাধীনতা-দিবসের সপ্তাহখানেক আগেই তা

দাবানলের মত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার যে সব উপকরণ এতদিন গোপনে গোপনে সঞ্চিত হয়েছিল—পুলিস-শাসন শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রতিহিংসাকে শাণিত করে তুলল। বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী গান্ধীজীর কাছে প্রার্থনা জানালেন—স্বাধীনতা-দিবসে তিনি যেন কলকাতা ত্যাগ না করেন। গান্ধীজী কর্ত্তব্য বেছে নিলেন। বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বসে তিনি সারা বাংলাকে রক্ষা করবার ব্রত গ্রহণ করলেন। সেই সঙ্কল্পে নগরোপান্তে এক অখ্যাত পল্লীতে এসে আশ্রয় নিলেন—আরম্ভ হ'ল অগ্নিপরীক্ষা।

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন বাপুজী ?

সুচিত্রার প্রশ্নে ডায়েরি লেখা বন্ধ করলে মলয়। তোমার কি মনে হয় চিত্রা ?

কালকের রাত্রির ঘটনা পড়েছ তো ? ক্ষিপ্ত জনতা ওঁর বাসগৃহ আক্রমণ করেছিল—ওঁকে আঘাত করেছিল।

দাঁড়াও লেখাটা শেষ করি।

মলয় লিখলেঃ সত্যকে সামনে রেখে যিনি বলতে পারেন—হয় জীবন, নয় মৃত্যু—তাকে এই ভাবেই বারবার পরীক্ষা দিতে হয়। আর সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। কাল রাত্রিতে গান্ধীজী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

ডায়েরিটা বন্ধ করে মলয় হাসল।

বাঃ রে—কোথায় পেলে এ খবর ? বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে সুচিত্রা।

চল—দেখবে। হিংসার উদ্যত ফণা যেইমাত্র নত হ'ল—তখনই হ'ল সত্যাশ্রয়ীর জয়। চল দেখে আসি।

দুজনে গান্ধীজীর আশ্রয়স্থলের দিকে এগুতে লাগল। পদব্রজেই চলল। যেন তীর্থযাত্রা করছে। বহু অখ্যাত পল্লী দিয়ে নির্ভয়ে

ওরা অগ্রসর হ'ল। আরও অনেকে চলেছে। নিরস্ত্র—নির্ভীক। কয়েকদিন আগে এই পথ দিয়ে সশস্ত্র হয়েও চলবার কল্পনা পর্য্যন্ত কেউ করত না।

তীর্থে এসে দেখলে—হিংস্র সাপটা ফণা নীচু করে পড়ে আছে। ষ্টেনগান, বোমা, এ্যাসিড বাল্‌ব, তীর, বর্শা, তরবারি প্রভৃতি নানান রকমের মারাত্মক অস্ত্রে আকীর্ণ হয়ে রয়েছে গৃহ-প্রাঙ্গণ।

মলয় হাসিমুখে সুচিত্রার পানে চাইলে, কি চিত্রা, পরীক্ষা শেষ হয় নি ?

সুচিত্রা উত্তর না দিয়ে যুক্ত কর ললাটে স্পর্শ করলে। ওর দুটি চোখের কোণ অশ্রুবাষ্পে মেদুর হয়ে উঠল।

স্বাধীনতার উৎসবের ঢেউ গ্রামেও এসে লাগল। তবে র‍্যাডক্লিফ-রোয়েদাদ প্রকাশিত না হওয়ায় দ্বিধা-সন্দেহে দুলতে লাগল দু'পক্ষের মন। তবু উভয় পক্ষেরই আয়োজন চলল—গোপনে এবং প্রকাশ্যে। বড়লাটের অস্থায়ী ঘোষণা অনুযায়ী এ গ্রাম আপাততঃ পাকিস্তান এলাকায়—র‍্যাডক্লিফ-ঘোষণা না বেরুলেও—গোপন সংবাদে জানা গেছে ভারতরাষ্ট্রে সংলগ্ন হয়েছে এ জায়গা। প্রকাশ্য ঘোষণা না হলে—উৎসব করতে নিষেধ করে দিয়েছেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। হিন্দুরা তাই ম্রিয়মাণ চিত্তে রোয়েদাদের অপেক্ষায় দিন গুনছে। রীতিমত আশঙ্কাও জেগেছে তাদের মনে। অতিসাবধানীরা ইতিমধ্যে যতদূর সম্ভব—স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ভারত-সীমানায় অর্থাৎ গঙ্গার অপর পারে চালান করে দিয়েছে। কেউ উঠেছে আত্মীয়-বাড়ি—কেউ নিয়েছে অস্থায়ী বাসা। কেউ কেউ জমির বায়না দিয়েও রেখেছে—শেষ ফল জেনে সরে পড়বে। মোট কথা, দু'শো বছরের দাসত্বমোচনের

উল্লাসকে সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারছে না কেউ। তবু উৎসবের আয়োজন চলছে। নন্তু-দাদুর বৈঠকখানায় ছেলেরা জমায়েত হয়েছে। একটা হারমোনিয়ম এসেছে—তার সঙ্গে একটা ক্ল্যারিওনেট বাঁশী—আর একটা পিকলু জোগাড় হয়েছে। স্বদেশী গানের বই থেকে বাছা বাছা কয়েকটি গানের মহলা দেওয়া চলছে। বাড়ির ভিতরে উৎসাহী ছেলেরা মিলে তৈরি করেছে অশোকচক্র-চিহ্নিত তিনরঙা পতাকা—লাল শালুর অভাবে—লাল রঙে ন্যাকড়া ছুপিয়ে তাতে তুলো বসিয়ে তৈরি করেছে স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণাবাণী—জয়হিন্দ—বন্দেমাতরম্। দিল্লী পৌঁছে গেল যারা তাদের দিল্লীযাত্রার তাগিদ বা লাল-কেল্লা ধ্বংস করার উৎসাহ না থাকাই স্বাভাবিক। শ্লোগানটা বাদ পড়েছে। আর তৈরি হচ্ছে নেতাদের প্রতিমূর্ত্তি—গ্রাম্য পটুয়ারা আঁকছে। মুচিপাড়ায় খবর দেওয়া হয়েছে—সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তারা যেন যন্ত্রপাতি নিয়ে ইস্কুলের মাঠে এসে জমায়েৎ হয়। এখান থেকেই বিরাট একটি শোভাযাত্রা বেরুবে —কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে। পুরোভাগে থাকবে গান্ধীজী আর নেতাজীর পুষ্পমাল্যভূষিত সুবৃহৎ ছবি। পরিকল্পনা প্রতিদিন পরিপুষ্ট হচ্ছে। শহর থেকে ডেলিপ্যাসেঞ্জাররা এসে বর্ণনা দিচ্ছে কি ভাবে ওখানকার উৎসব হবে। হিন্দুরাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে কোনো কোনো উৎসাহী যুবক। গান্ধীজী একা আর কি করবেন! বৃদ্ধ হয়েছেন—ওঁর এখন এ সব চিন্তা না করাই ভাল। এই ধরণের সংবাদে অন্য পক্ষও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পাছে শান্তিভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় যথেষ্ট বন্দুকধারী সৈন্য মোতায়েন করা হচ্ছে—শহরে, গ্রামে। কংগ্রেস-নেতারা উপদেশ দিচ্ছেন—অহিংস থাকতে। তাঁদের অনুরোধ পাকিস্তানের আনুগত্য স্বীকার করে জনগণ যেন সংযত থাকে—শান্ত থাকে। ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে স্বাধীনতাকে অসম্মান করা হবে।

বলা বাহুল্য—এই উপদেশ বা অনুরোধে অনেকেই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার না করে নিরীহ গোছের একটি শোভাযাত্রা, খানিকটা বন্দেমাতরম বা জয় হিন্দ বলে চেঁচানো, কোন মাঠে লোক জমিয়ে কিছু জোলো বক্তৃতা—এরই জন্য দু'শো বছর ধরে এত কাণ্ডকারখানা, জেলখাটা, সর্ব্বস্বান্ত হওয়া, ফাঁসি কাঠে ঝোলা, গুলি বা বিষ খেয়ে মরা—এ সবের কি দরকার ছিল? উত্তেজক সুরার মত যদি উৎসবকে না প্রাণ ভরে পান করতে পারলাম—তবে কেমনতর উৎসব সে? ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাঠান-পুলিস বসিয়ে শান্তিরক্ষার অছিলায় ধমক দিচ্ছেন বাংলা-সরকার, খবরদার, অন্যায় কাজ কর না—শাস্তি পাবে। তবু র‍্যাডক্লিফ সাহেবের রোয়েদাদ বেরুলে—দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে যখন চেঁচাতে চেঁচাতে যেতে পারবে তখন উৎসবের নামে প্রতিশোধস্পৃহা খানিকটা অন্ততঃ চরিতার্থ করে নিয়ে এরা পরিতৃপ্ত হবে। পনেরোইএর মধ্যে খবরটা কি আসবে না?

হেমলতা আশুর মাকে জিজ্ঞেসা করলেন, দিদি—দিন-কতকের জন্য না হয় আবার ময়রাপাড়ায় গিয়ে থাকি। কি বল?

আশুর মা বললেন, মরণ—কি দুঃখে যাবি সেখানে! শুনছি রাজ্যি আমাদেরই হবে। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে হেঁটে কাঁটা আর ওপরে কাঁটা দিয়ে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াবে না?

সাহস সঞ্চয় করে হেমলতা ভিটেয় পড়ে রইলেন। বড় বাড়িটা শূন্য খাঁ খাঁ করছে। মেজ ছেলে বউ নিয়ে কলকাতাবাসী হয়েছে। যে সংসার কোলাহলে পূর্ণ ছিল—সেখানে আজ সাধন-ভজনের অনুকূল আবহাওয়া। বৃদ্ধ বয়সে নিরিবিলিতে বসে দু'দণ্ড ভগবানের চিন্তা করবার আকাঙ্ক্ষা কি মানুষের মনে জাগে না? এই রকম অবসর পেলে অনেকে ত ধন্য হয়ে যান। তবু হেমলতা এমন অখণ্ড অবসর

চান না। সংসারে আজ তাঁর কেউ নেই—অথচ ভাঁড়ারে গুছানো জিনিসের প্রাচুর্য্য; রান্নার ধুম নেই, গৃহপারিপাট্যের শ্রম আছে। যে সংসারের তুচ্ছতম খবরে বাইরের বড় পৃথিবীর আহ্নিক-গতি সুনিয়ন্ত্রিত—সে সংসার হেমলতার কল্পলোক থেকে মুছে যাচ্ছে—তবু তাতেই মগ্ন হয়ে রয়েছেন তিনি। উঠান ঝাঁট, বাসিপাট সারা —শাকের ক্ষেত বা ফুলগাছে জল ঢালা, রান্নার আয়োজন—ঘর-বারান্দা ধোয়া-মোছা—লেপ বালিশের ওয়ার তৈরি, ঘর-বারান্দার ঝুল ঝাড়া —কি না করছেন তিনি! দুপুরে খাওয়ার পর মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে খানিকটা ঘুম, ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান—দুটি পান ও এক খামচা দোক্তা গালে দিয়ে কোন দিন প্রশান্তদের বৈঠকখানা ঘেঁষে আড়িপাতা, কোন দিন বা পাড়ায় টহল দিয়ে সংবাদ বিতরণ ও সংগ্রহ— কোনটির অঙ্গহানি ঘটছে না। ঘুম তাঁকে শুধুই আনন্দ দেয় না—দুঃখও নিরবচ্ছিন্ন বেদনাদায়ক নয়। এ দুয়ের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বৃহৎ ভিটেয় স্বচ্ছন্দে দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন। দেশের স্বাধীনতা কি বস্তু হেমলতা বোঝেন না—তবে চারিদিকে যে ফিস্‌ফাস্ কানাকানি চলছে তাতে উত্তেজনা খানিকটা—খানিকটা কৌতূহল আর তৃপ্তিও বেশ লাভ হচ্ছে। প্রশান্তদের বৈঠকখানায় প্রায়ই আলোচনা বসে —এবং রোয়াকের কোল ঘেঁষে তিনিও জলের গ্লাস ও জরদার কৌটা নিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেন। কদিন আগে প্রশান্তদের নিয়ে তাঁর কৌতূহলটা উগ্র হয়েছিল। মালতী মেয়েটি চলে যাওয়াতে সে কৌতূহল স্তিমিত হয়েছে—এবার রটনার বিষয় অভাবে রসনাও প্রায় স্তব্ধ হয়েছে। কিন্তু মেয়েটি ভাববার খোরাক যথেষ্ট রেখে গেছে। আশ্চর্য্য ছেলে-মেয়ে আজকালকার! ওরা মিশবে, হাসবে, কথা বলবে নির্লজ্জের মত অথচ বিয়ে করবে না।

কথাটা পেড়েছিলেন একদিন, হাঁ দিদি—এই মেয়েটির সঙ্গেই তো ঠিক করলে? তা স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন সেকালে দময়ন্তী—

প্রশান্তর মা গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছিলেন, ছেলে আমার আগে সারুক—তারপর বিয়ে।

ঢোক গিলে বলেছিলেন হেমলতা, তা বিয়ে হবে তো? ওই মেয়েটি না থাকলে—ছেলেকে কি ফিরে পেতে ভাই!

সেও তাঁর দয়া। উপর দিকে চেয়ে প্রশান্তর মা কাজের অছিলায় অন্য ঘরে গিয়েছিলেন চলে। সেই থেকে প্রকাশ্য সংবাদ নেওয়া দুষ্কর জেনে হেমলতা জরদা আর জলের গ্লাস নিয়ে ওদের বৈঠকখানা ঘেঁষেই প্রায় শুয়ে থাকেন।

স্বাধীনতা-উৎসবের দু'দিন আগে মালতী বললে, কলকাতায় যাবে না তুমি?

না।

মামা চিঠি লিখেছেন আমায় যেতে। তোমাদের ফ্যাক্টরী তো ভালই চলছে। স্বাধীনতা-উৎসবে শ্রমিকদের কিছু বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা নাকি হচ্ছে।

ভাল।

আচ্ছা—তুমি এমন মুষড়ে পড়লে কেন বল ত? আর কি ফিরে যাবে না?

কি হবে সেখানে গিয়ে—কাজের যখন অসুবিধে হচ্ছে না। প্রশান্তর কণ্ঠস্বর নিরুৎসাহ।

কিন্তু মামা লিখেছেন—একখানা নয়—প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে লিখেছেন—তোমার জন্যই নাকি অতবড় ধর্ম্মঘট বন্ধ হয়ে গেল।

আমার জন্য! প্রশান্ত হাসল। আমি তো তখন শয্যাশায়ী।

তার আগে শ্রমিক-নেতাদের সঙ্গে কি সব চুক্তি নাকি করেছিলে—

চুক্তি! আমি করেছিলাম? প্রশান্তর কণ্ঠস্বর উচ্চ হ'ল।

হাঁ—সেই রফা অনুসারেই তো দশ হাজার টাকা দিয়ে—এতবড় ব্যাপারটা মিটল।

প্রশান্তর স্বর পুনরায় স্তিমিত হয়ে এল। সে বললে, তা হবে।

হবে নয়—সবাই জানেন—

সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রশান্ত, আচ্ছা মালতী, এতবড় অসম্মানের বোঝা আমার ঘাড়ে না চাপালে কি চলছিল না?

অসম্মান? বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে মালতী।

হাঁ—বিশ্বাসঘাতকতাও বলতে পার। কিন্তু বিশ্বাস কর—এ কাজ আমি করি নি—আমি করতে পারি না। অত্যন্ত কাতর শোনাল তার স্বর।

মালতী তার একখানি হাত টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিলে, আঃ কি পাগল তুমি! ছিঃ লক্ষ্মীটি, আবার কাঁদে।

ফোঁপানোর শব্দ—সান্ত্বনা দেওয়ার গদগদ ভাষা—আরও কল্পিত কয়েকটি মধুর আশ্বাসের স্পর্শ—হেমলতা দুরুদুরু বুকে উঠে বসলেন।

তারপর দিন মালতী চলে গেল। পাড়ায় রটল—প্রশান্ত তার সম্মানহানি করেছে।

তারপর ঝড়ের মত এল কতকগুলি ঘটনা। স্বাধীনতা-দিবস ঘোষিত হ'ল ঘটা করে। মুসলমানরা আল্লা-হো-আকবর রবে ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে—রাস্তা দিয়ে মার্চ্চ করে গ্রামের বারোয়ারি তলায় একটা বাঁশের খুঁটিতে চাঁদ-তারা-মার্কা পতাকা টাঙিয়ে দিল। এ যেন স্বাধীনতার জয় ঘোষণা নয়—দ্বিজাতিতত্ত্বের বনিয়াদের গাঁথুনিকে পাকা করবার জন্য খানিকটা সিমেণ্ট আর খানকয়েক ইট বসানো হ'ল।

দু'দিন বাদে র‍্যাডক্লিফ-রোয়েদাদ বেরুনোর পর হিন্দুরা দিলে এর প্রত্যুত্তর। চাঁদ-তারাকে ভূমিশায়ী করে অশোকচক্রলাঞ্ছিত তিন বর্ণের পতাকাকে উড্ডীন করে দিলে সেইখানে। ব্যাণ্ড বাজিয়ে সদর্প কুচ-কাওয়াজ—জয়ধ্বনি আর মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। বলা যেতে পারে এরাও আর খানকয়েক ইট আর কিছু মশলা দিয়ে পার্থক্যের বনিয়াদকে আরও শক্ত করে দিল। স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ।

৩৩

কয়েক দিন পরে মালতী ফিরে এল। বললে, বড্ড ভুল করেছ কলকাতায় না গিয়ে। ঈদের দিন যদি থাকতে—বলতে যাদুকরের যাদু ছাড়া এ জিনিস সম্ভব নয়। হিন্দু-মুসলমানের এমন মিলন আর কোনদিন দেখবে না।

প্রশান্ত অল্প হেসে বললে, তোমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল দেখেই বুঝতে পারছি—

দূর! বলে আঁচলে চোখের কোণটা মুছে মালতী হাসল। তবে একটা খবর তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি—চৌধুরী ছাড়বেন না তোমায় —এক সপ্তাহের মধ্যে এখানে আসছেন তিনি।

প্রশান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল, কি মুশকিল—আমি এখনও সেরে উঠি নি যে!

সেরে উঠেছ—বাইরে তোমাকে দেখলে কেউ বলবে না অসুস্থ, তবে মনের অসুখ আলাদা জিনিস। কয়েক দণ্ড চুপ-চাপ কাটল। মালতী আর একটু সরে এসে ওর একখানা হাত হাতের ওপর তুলে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললে, কি হয়েছে আমাকেও বলবে না?

প্রশান্ত হাসবার ভঙ্গি করে বললে, কিছুই হয়নি—ভাল লাগছে না শুধু।

আচ্ছা।—হাত ছেড়ে দিয়ে মালতী অভিমানে খানিকটা দূরে সরে এল। চলেই যাচ্ছিল ঘরে থেকে। ঠিক যাবার ইচ্ছায় নয়—ভঙ্গিতে অন্ততঃ সেটা দেখালে। প্রশান্ত ওর এই নিঃশব্দ অভিমানটুকু বুঝলে। বুঝে ডাকলে, শোন।

মালতী ফিরল। খানিকটা ব্যবধান বজায় রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রশান্ত বললে, তুমি কেন আমার জন্য কষ্ট পাও? বুঝতে পারছ না কি—আমি ফুরিয়ে গেছি, আমার দ্বারা আর পৃথিবীর কোন কাজ হবে না।

এই কথায় মালতীর দুঃখবোধ দ্বিগুণ হ'ল—মমতায়, প্রেমে সে বিগলিত হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে আবার প্রশান্তর হাতখানি তুলে নিয়ে দু' হাতে চেপে ধরলে। কান্নার আভাসে ওর কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে উঠল। না, না, ও কথা বলো না। তোমাকে ফিরতেই হবে—বাঁচতেই হবে। এ ভাবে তিলে তিলে তোমাকে আত্মহত্যা করতে দেব না আমি। শেষের দিকে কণ্ঠে ওর দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল।

প্রশান্ত মুখ তুলে মালতীর পানে চাইলে—তার পর বাঁ হাত দিয়ে মালতীর একখানি হাত চেপে ধরে বললে, তাই হোক।

অনেক সংবাদ এনেছে মালতী। একটা পেপার মিল স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে। স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ—সংবাদ-পত্র চালনার জন্য পশ্চিমের মুখ চেয়ে সে বসে থাকবে কেন? তবে এ কাজে যে সব আধুনিক যন্ত্রপাতির দরকার, তা পেতে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এনামেল-শিল্পের ভবিষ্যৎও বেশ উজ্জ্বল। চৌধুরী কয়েকজন অংশীদার জুটিয়ে অনেকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালু করবেন—এই আশা

করছেন। দেশ যখন স্বাধীন হ'ল তার শিল্প-সম্পদ না বাড়ালে স্বাধীনতার মূল্য থাকবে কেন! শ্রমিকদের সঙ্গে একটা রফাও নাকি করতে হবে। প্রশান্ত বোধ হয় জানে—ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের উদ্বোধন হবে শীঘ্রই। জাতির শক্তি যাতে ক্ষমতালোভীর নেতৃত্বে অপচিত না হয় তার জন্য এই ধরণের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। শ্রমিকে-মালিকে আর শাসকে সহযোগিতা না থাকলে কেউ বাঁচতে পারবে না। বহু দেশেই শিল্পকে জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত করে রাষ্ট্র তথা সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য যথেষ্ট হয়েছে —আর হবেও, তবে মেকি দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখতে পারে না কেউ চিরকাল। বিলেতে কয়লা খনির কথা প্রশান্ত নিশ্চয় জানে।

প্রশান্ত আশ্চর্য্য হ'ল মালতীর এই ধরণের কথা শুনে। শোনা কথা নিয়ে এতক্ষণ ধরে আলোচনা চালাতে পারে কেউ? মালতী যা ছিল না—তারই দিকে এগিয়ে চলেছে। গভীর চিন্তার ছাপ ওর মুখে। প্রফুল্ল চক্ষুতেও ছায়া ফেলছে চিন্তা। আত্মচিন্তা ঠিক নয়—স্বাধীন ভারতবর্ষকে নিয়ে চিন্তা। কিসে দেশ উন্নত হবে, সম্মানিত হবে বিশ্বসভায়—সেই চিন্তা। নতুন পৃথিবী-রচনার স্বপ্ন-ঘোর ওর চোখেও লাগল বুঝি!

অবশেষে ও সঙ্কল্প করল কলকাতায় ফিরে যাবে।

কিন্তু পরের দিন খবরের কাগজ পড়ে ও স্তম্ভিত হ'ল। কলকাতায় আবার আত্মঘাতী হানাহানি সুরু হয়েছে। শান্তিদূত উপস্থিত থাকতেও হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল! অভিশপ্ত ভারতবর্ষ! দুশো বছরের পরাধীনতা তার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে।

পরদিন দুপুরে বৈঠকখানায় বসে ওরা পরামর্শ করল, কালই

কলকাতায় ফিরে যাবে। মহাত্মা অনশন আরম্ভ করেছেন, এই ভ্রাতৃহনন যজ্ঞে আত্মাহুতি দেবেন। ছাত্রেরা বেরিয়েছে শান্তিমিছিল নিয়ে। বেরিয়েছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদল—বালক-যুবক-বৃদ্ধ-মহিলা। অকুতোভয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্ব্বত্র—প্রচার করছে শান্তির বাণী। স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে গান্ধীজীর অমূল্য জীবন যাতে নষ্ট না হয় তারই চেষ্টা চলছে দিনরাত।

হকার খবরের কাগজ দিয়ে গেল। মালতী দোরের কাছ থেকে কাগজখানা উঠিয়ে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই চীৎকার করে উঠল, কি সর্ব্বনাশ! এই দেখ—। কাঁপতে কাঁপতে ও বসে পড়ল প্রশান্তর পাশে। এই দেখ—বড় বড় হরফে কম্পিত আঙুল ঠেকিয়ে ও বললে, দুর্বৃত্তেরা শান্তিমিছিল আক্রমণ করেছিল। শচীন মিত্র, স্মৃতীশ বাড়ুজ্জে হত হয়েছেন—আরও অনেকে সাংঘাতিক আহত হয়েছেন। উঃ—

প্রশান্ত রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ঘটনার বিবরণ পড়ে যেতে লাগল। উত্তেজিত মুহূর্ত্তে ওর কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে উঠল—কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আহত নামের তালিকায় এসে হঠাৎ ও চেঁচিয়ে উঠল, মলয়—মলয়ও আহত হয়েছে। আঘাত গুরুতর।

বৈঠকখানার ওপিঠে একটি কাতরোক্তির সঙ্গে গুরুভার দ্রব্যবিশেষ পতনের শব্দ হ'ল। মালতী তাড়াতাড়ি জানালা খুলে চৌকির ওপর উঠে পাঁচিলের ও-পিঠে চেয়েই ভীতকণ্ঠে বললে, দেখ, দেখ—ও বাড়ির গিন্নী অজ্ঞান হয়ে উঠোনে পড়ে গেছেন।

সুচিত্রাকে দেখে প্রশান্ত অবাক হয়ে গেল। চিত্তের স্থৈর্য্য ওকে মহীয়সী করে তুলেছে কিংবা পাষাণ করে দিয়েছে হয়ত। যার একমাত্র আশ্রয় ভেঙে পড়ল অকস্মাৎ—সে কি করে অম্লান মুখে সহজভাবেই

উচ্চারণ করলে,—ঠাকুরপো—এইবার আমাকেও তোমাদের শান্তিমিশনে টেনে নাও—ওঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করি।

প্রশান্ত বললে, তার দরকার হবে না বৌদি—দাঙ্গা থেমে গেছে।

সুচিত্রা বললে, গান্ধীজী যে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন আশা করেন তা হয়েছে কি ?

না হোক—উনি অনশন ভঙ্গ করেছেন—হিন্দু-মুসলমান মিলে ওঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ভাল। একটু থেমে বললে, কিন্তু মানুষ ত মানুষই, মহাত্মা নয় ঠাকুরপো। তার সাধনা আছে—অথচ সাধ্যে কুলোয় না এমন তো অনেকবার দেখা গেল। আমাকে যে-কোন কাজ দাও—আমাকে বাঁচাও।

প্রশান্ত বুঝলে—সুচিত্রার অন্তরের বেদনা। নিদারুণ শোককে ও কাজের চাপে ডুবিয়ে দিতে চায়। ওর গৃহ আজ দিগন্তে মিশেছে—আরাম-বিলাসের চিন্তা আগুনের মতই দগ্ধ করছে। এমনি গভীর বেদনা থেকেই তো মানবকল্যাণ-ব্রতের সঙ্কল্প নেয় মানুষ। আমাদের মধুরতম সঙ্গীতের মর্ম্মমূলে রয়েছে গভীরতর শোকের আঘাত—কবির এ বাণী অমর সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

বললে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বৌদি—কাজ আপনার মিলবে। যাবার আগে বললে, সত্যিই কি দেশে ফিরে যাবেন না ?

আজ নয় ঠাকুরপো। হয়ত সেখানেই যেতে হবে। এখানকার কাজ যেদিন শেষ হবে—

এখানকার কাজ শেষ হবে না বৌদি—খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েও জগতে করুণা জাগাতে পারেন নি—গৌতম সাধনায় বুদ্ধত্ব লাভ করেও জরা-মৃত্যু উত্তীর্ণ হবার ভেলা তৈরি করতে পারেন নি। যেটুকু আলো জ্বলেছে—পৃথিবীতে অন্ধকারের পরিমাণ তার বহুগুণ বেশি।

তবু আলো জ্বালাতে হবে। আলো না জ্বললে আমরা ঠাঁই পাব কোথায়?

সুচিত্রাকে মুখে সাহস দিলে—মনে মনে জানালে প্রণতি। সঙ্কল্প করলে, আবার সে কাজ করবে। যে কালে সে রয়েছে সে কালের দাবি তাকে পূরণ করতেই হবে—আর অনাগত কালকেও স্বাগত জানাতে হবে। সমস্ত বন্ধনের মূলে রয়েছে জাড্য—সে বন্ধন ছেদন করতেই হবে।

৩৪

হাঁ—ছেদন করতে হবে বন্ধন। সুখে দুঃখে উদাসীন থেকে নয়—কাজকে ভালবেসে—সুখ-দুঃখকেও গ্রহণ করতে হবে। উদাসীনের ধর্ম্ম সংসার নয়—সংসারীর ধর্ম্ম নয় শাস্ত্রবচন আউড়ে কর্ম্মবিমুখ হওয়া। মান-অভিমান, তুচ্ছ হৃদয়ের আবেগ-উত্তেজনা সবকিছুকেই মেনে নিয়ে—কখনো হাসিতে কখনো কান্নায় অতিক্রম করতে হবে পথ। ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করে মহৎ না হোক সহজ হতে হবে। সহজ হওয়া আজকের দিনে কত যে শক্ত সভ্যতা-নাগিনীর পাশবদ্ধ মানুষ তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছে।

শুভার চিঠিখানা হাতে করে এই ধরণের কথাই সে ভাবছিল। যে দিকের দুয়ার ঘটনার প্রবাহে একদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে—সেই রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল কামনায় করাঘাত করার কোন সঙ্গত অর্থও তো নাই। অথচ বুঝাপড়ার জন্য সেই দুয়ারে গিয়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে—মালতী তার পাশে থাকা সত্ত্বেও।

শুভা তাকে আহ্বান জানিয়েছে, দৃঢ় সঙ্কল্প সূর্য্যোত্তপ্ত তুষারকণার

মত অমনি দ্রব হতে আরম্ভ হয়েছে। হাঁ, সে যাবে। শুভাকে আর একবার বোঝাবে—যে পথ তুমি বেছে নিয়েছ—তা কল্যাণের পথ নয়। গণ-অধিকারের দাবি জানিয়ে শ্লোগান ছুড়ে মারার নাম—গণবিপ্লব সাধন নয়। ও হ'ল দেশলাই-কাঠির আগুন—ছোট কাঠির আগায় যা বহন করছে তা পরিমাণে অল্প, স্থায়িত্বে আয়ুহীন। ওর মধ্যে 'ভাল করছি'র ঔদ্ধত্য প্রচুর—'সব জানি'র অহঙ্কার আকাশস্পর্শী—তরঙ্গের কুলুধ্বনিতে মিশে আছে রাশি রাশি ফেনা—সূর্য্যের কিরণে যা শুকিয়ে যায়।

চিঠির তারিখ বহু দিন আগের। ফ্যাক্টরীতে তখন আসন্ন ধর্ম্মঘটের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। আপোষ-আলোচনা একদিকে ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়েছিল—অন্য দিকে গোপন চুক্তির ফলে শ্রমিকস্বার্থ বলি দিয়ে নেতারা উপরে উঠবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন ধর্ম্মঘটের রসদ সংগ্রহ করছি। আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি।

শুভা লিখছে: একবার এস কমরেড—দোটানায় পড়ে গেছি। দু'দিক বজায় রাখা চলবে না—বুঝতে পারছি। তবু পথ বেছে নেবার আগে—তোমাকে সব খুলে বলব। অনুমতি নয়—পরামর্শও নয়—তোমাকে উপদেশ দেবার সঙ্কল্পও নয়—শুধু একবার এস—পথ আমার ঠিক করাই আছে—যাবার আগে তোমাকে জানিয়ে যাব শুধু।

বহুদিন আগেকার আহ্বান—রক্তে নতুন করে দোলা দিলে। এ আহ্বানের ভাষা পুরাতন হয় নি—হয়ত শুভা তার শেষ কথাটি তাকেই বলে যাবার আশায় এখনও প্রতীক্ষা করছে—সেই আলো-বাতাসবঞ্চিত জীর্ণ স্যাঁতসেঁতে ঘরখানিতে। সেখানে জ্বলছে মৃদুবায়ু-শিহরিত তৈলবিন্দু-নিঃশেষিত একটি প্রদীপ—তারই ম্লান আলোতে করতললগ্ন চিবুকে—চিন্তার গুরুভার বহন করছে সে; চুল রুক্ষ—গণ্ডে বলিরেখা, চক্ষুতে কালিমা।

ঝড়ের বেগে প্রশান্ত এসে পৌছল সেই বাড়ির সামনে।

মুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্ততঃ না করে সে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

ঘরের মধ্যে বসে খুকী একমনে কি লিখছিল। ইস্কুলের পড়া তৈরি করছিল হয়ত। প্রশান্ত আসতেই উৎফুল্ল মুখে উঠে দাঁড়াল। বললে, বসুন—মাকে ডেকে আনি।

ও ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল—প্রশান্ত খপ করে ওর একখানা হাত চেপে ধরে বললে, আরে—তোমার সঙ্গেই গল্প করতে এলাম যে!

খুকী হাসল। ও বুঝেছে কার সঙ্গে গল্প করবার জন্য প্রশান্ত এসেছে। হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললে, দিদি কিন্তু এখানে নেই—তা বলে দিচ্ছি।

সে কি—তোমার দিদি গেলেন কোথায়?

বাঃ রে—আপনি জানেন না বুঝি? সে ত কবে চলে গেছে।

সবিস্ময়ে প্রশান্ত বললে, চলে গেছে? কোথায়?

তা কি করে জানব—মাকে ডেকে আনি—তিনি বলতে পারবেন।

প্রশান্ত ওর হাত ছেড়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শুভার মাও জানেন না মেয়ে কোথায় গেছে। প্রায় মাস দুই হবে সে চলে গেছে। বলে গেছে ফিরতে দেরি হবে। বাইরে তার নাকি অনেক কাজ। চিঠিপত্র আসে মাঝে মাঝে—ঠিকানা থাকে না। পোষ্টাপিসের মোহরের ছাপ এক জায়গার নয়। টাকাও আসে অত্যন্ত কম—কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তাতেও দুঃখ নেই শুভার মার—কিন্তু মেয়ে যে ভেসে গেল—সংসারে ঠাঁই পেলে না—এই দুঃখ শেলের মত বিঁধে আছে বুকে। যে মেয়ে স্বামী পেলে না, সংসার পাতলে না—তার মেয়ে-জন্মই যে বৃথা। কোন্ সান্ত্বনায় বুক বাঁধবেন তিনি!

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, এভাবে তার চলে যাওয়ার কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন ?

না বাবা—জানই তো সে মেয়ে খেয়ালী। পুরুষের সঙ্গে সমান তালে তর্ক করে, ঝগড়া করে। যেদিন সে চলে যায় তার দু'দিন আগে দু'জন লোকের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়—সে এক রকম ঝগড়াই। তাদের সঙ্গে মতের মিল ছিল না ওর।

তাঁদের চেনেন আপনি ?

মানে বারকতক তাঁরা এসেছিলেন এখানে। ভারি ভাল লোক। তাঁদের কাছেই বুঝি ও কাজ করত—কারণ মাঝে মাঝে তাঁরাই টাকা-পয়সা দিয়ে যেতেন। এ বাজারে এমনিতে কে কাকে সাহায্য করে বাবা !

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, তাঁদের সঙ্গে ঝগড়াই যদি হয়ে থাকে তাতে ঘর ছাড়বার যুক্তিটা ঠিক বোঝা গেল না। তাঁরা তো নিকট-আত্মীয় নন ?

না—। কিন্তু একটু দাঁড়াবে বাবা—একটি জিনিস তার বাক্স থেকে পেয়েছি—তাতে অনেক কথা লেখা আছে। সব আমি বুঝতে পারি নি। দাঁড়াও বাবা, আমি আসছি। তিনি দ্রুতপদে চলে গেলেন এবং ফিরে এলেন দ্রুতপদেই। একখানি ছোটমত ডায়েরি প্রশান্তর হাতে দিয়ে বললেন, এইটি পড়লে হয়ত অনেক কথা তার জানতে পারবে। পড়ে দেখো।

প্রশান্ত সঙ্কোচ প্রকাশ করলে, কিন্তু—এ পড়া কি আমার পক্ষে অন্যায় হবে না ?

একটুও না। আমি তার মা, আমি বলছি—একটুও অন্যায় হবে না।

তবু,—প্রশান্ত নতমুখে চেয়ে রইল ডায়েরিখানির দিকে।

শুভার মা হাসির ভঙ্গি করলেন, বয়স আমার কম হয়নি বাবা—এ সংসারে অনেক দেখলাম—অনেক শুনলাম। কিসে কার অধিকার সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না বাবা। মেয়ের যদি আমার কপাল মন্দ না হবে তো তুমিই বা দূরে সরে থাকবে কেন!

প্রশান্ত লজ্জায় আরক্ত মুখে ডায়েরির একখানা পাতা খুলে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। বললে, কাল এখানা ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

সে তোমার ইচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে এলেন তিনি। হাতখানা একবার বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ গুটিয়ে নিলেন। দ্বিধায় সঙ্কোচে ভীরু চোখে চাইলেন প্রশান্তর পানে। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মাঝে মাঝে খবর নিও বাবা, তোমার ভরসাই আমার সবচেয়ে বড় ভরসা।

আসব, বলে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল প্রশান্ত।

৩৫

ডায়েরির পাতা উল্টে যাচ্ছে প্রশান্ত। পুরো ডায়েরি নয়—ছাড়া ছাড়া ঘটনাগুলিকে জুড়ে—রঙ ফলিয়ে কাহিনী রচনা করবার প্রয়াস নেই এর মধ্যে। এ অত্যন্ত খাপছাড়া এলোমেলো চিন্তা—অক্ষরের ছাঁচে বন্দী হয়ে আছে পরিমিত পৃষ্ঠায়। কোথাও স্পষ্ট—কোথাও বা কুয়াসাচ্ছন্ন। কাটাকুটি—লাইনবাঁকা লেখা—চঞ্চল ও দ্রুত সঞ্চরণশীল মনোভাবকে প্রকাশ করছে। তারিখের ধারাবাহিকতা নাই—কতকগুলি ছিন্ন চিন্তাকে জোড়া লাগিয়েও একটি মীমাংসায় পৌছানো দুষ্কর। তবু এগুলি যেন অনাবিষ্কৃত দেশ—প্রশান্তর কাছে গভীর রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত বহন করে আনছে। অপরাহ্ণে ঘরের দুয়ার বন্ধ

করে এক নিঃশ্বাসে অনেকখানি সে পড়েছে—গভীর রাত্রিতে রুদ্ধ-দ্বারকক্ষে আবার অজানা রহস্যের পাঠোদ্ধারে মগ্ন হ'ল সে।—যেখানটা তার ভাল লাগছে—দু'বার তিনবার করে পড়ছে। তন্ময় হয়ে পড়ছে। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ক্রমে গভীর হচ্ছে—নীরব হচ্ছে চরাচর সে খেয়াল তার নেই।

এক জায়গায় আছে :

আজও প্রশান্ত এসেছিল। ওর সঙ্গে বেশ খানিকটা তর্ক হয়ে গেল। ও একটা কথা ভুলে আছে যে দুঃখীর দুঃখ-মোচনপ্রয়াস ওর অন্তরের বস্তু নয়। দয়াবৃত্তি মানুষকে কোমল করে—অহঙ্কৃত করে। সাধারণের চেয়ে উঁচুতে উঠে নিজেকে পরিতৃপ্ত বোধ করে না কি? ও কি করে বুঝবে দারিদ্র্যের বেদনা—ও তো দরিদ্র নয়।

পরের পাতায় :

ধর্ম্মঘট যদি হয়ই আমি কি করতে পারি? যারা পেট ভরে দু'বেলা খেতে পায় না তাদের দাবিকে অন্যায় বলবে কোন্ যুক্তিতে! তোমার শিল্প উৎপাদনে কি ব্যয় পড়ল, তোমার মুনাফায় কোথায় ধরল টান—আধপেটা খেয়ে কোন্ দুর্গত রাখতে পারে সে হিসাব? ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করবার সবচেয়ে বড় যুক্তি অন্ন—উৎপাদনের অপব্যয়, লাভ-লোকসান এ সব তো তুচ্ছ ব্যাপার। হাঁসকে মেরে ফেললেই একসঙ্গে অনেকগুলি সোনার ডিম পাওয়া যায় না সত্য—কিন্তু সোনার ডিমের লোভ অন্নপ্রাপ্তির চেয়ে বড় বস্তু এটাই বা ভাবছ কেন! পৃথিবীতে দুর্দ্দিন এসেছে—মানুষের ক্ষুধামান্দ্য তো ঘটে নি। খাদ্য-শস্যের দাম পাঁচ ছ' গুণ বাড়িয়েছ—সিকি ভাগ মাইনে বাড়াতে যত আপত্তি তোমাদের? তোমরা বুর্জ্জোয়া নও বললে সর্ব্বহারারা মেনে নেবে কেন? তোমরা কথার কৌশল জান—অঙ্কের কৌশল

জ্ঞান—ষ্ট্যাটিস্‌টিকসের দোহাই তোমাদের প্রতি যুক্তিতে। সে যুক্তি বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ত, বিবেকগ্রাহ্য নয়—সহজবোধ্য তো নয়ই।

কয়েকখানা পাতা উল্টে পাওয়া গেল :

একটা সভায় বক্তৃতা দিলাম। প্রথমটা অত্যন্ত সঙ্কোচ হচ্ছিল—কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। ভাল ভাল কথা বা যুক্তিগুলো ভাবের স্রোতে একই সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে বেরুতে চাইছিল—আর একসঙ্গে বেরুনোর জন্য কোনটাই স্পষ্ট হ'ল না। মুখচোখ লাল হয়ে উঠল, নিজের অক্ষমতা বুঝে বসে পড়লাম।

অন্যত্র :

আজ বক্তৃতাটা ভালই হয়েছে। যাদের উদ্দেশে কথাগুলি বললাম—তারা হাততালি দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানালে। আজও মুখচোখ লাল হয়ে উঠল—অক্ষমতার দরুণ নয়—নিজেকে উপযুক্ত মনে করে।

কয়েক দিন পরের একটি তারিখে এসে পৌছল প্রশান্ত :

যখন বক্তৃতা দিই—নিজেকে বেশ খানিকটা উঁচু মনে হয়। আজকাল ভাল কথা, যুক্তি কিছুই আটকায় না। খানিকক্ষণ বলার পর আরও বলতে ইচ্ছা হয়। এ-ও কি নেশা? শুনেছি সুরার ক্রিয়ায় দেহমনে উত্তেজনা জাগে—অনেকটা সেই রকমের উত্তেজনা কি? নইলে নিজেকে যোগ্য মনে করে স্ফীত হয়ে উঠি কেন? শুনেছি নেশা কাটলে আসে অবসাদ, ডায়েরি লিখতে লিখতে অবসাদ অনুভব করছি। আমার কেবলই মনে হচ্ছে গোর্কীর সেই কথা : You are not that which you want to appear. আমি যা নই—ভঙ্গিতে ভাষণে চালচলনে তাই হবার চেষ্টা করছি।

পর পৃষ্ঠায় :

না—বক্তৃতা আর দেব না। সত্যিই আমি তো তা নই। চাষীর

দুঃখ, মজুরের দুঃখ হয়ত বুঝি—দারিদ্র্যের সঙ্গে আমারও আবাল্যের পরিচয়। তবু আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে—যাকে বলে মধ্যবিত্ত। আমি চাষী নই—মজুর নই। এক এক সময় মনে হয় সাম্যবাদের নামে ওদের হিংসাকে—ওদের লোভকে জাগিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করছি না তো? আচ্ছা, আমাদের কয়েকজন নেতাকে লক্ষ্য করব।

তারপরের মন্তব্যগুলি লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। কাটাকুটির মধ্যে একটি লাইন এই: নেতারা সবাই মধ্যবিত্ত পরিবারের।

কয়েকটা তারিখ পার হয়ে—আছে:

ধর্ম্মঘট সর্ব্বত্র সফল হচ্ছে না—কারণ শ্রমিকরা ভালমতে সঙ্ঘবদ্ধ নয়। তা ছাড়া শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি আগুপিছু ভেবে না দেখেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রীতিমত ফণ্ডের সৃষ্টি না হলে ধর্ম্মঘট সফল হবে কেন! যে ক্ষুধা মেটাবার জন্য এই আয়োজন তাকেই সাথী করে কখনও যুদ্ধ করা সম্ভব! দাঁড়াবার ঠাঁই না থাকলে বলবার শক্তি আসবে কোথা থেকে!

এক জায়গায় আছে:

অবন্তীর টাকা নিলাম। না নিলে সংসারের অভাব মিটছিল না। কিন্তু কেন নিলাম? আমি তাকে দিতে পেরেছি কিছু? দেওয়া নেওয়া সমান মানে না থাকলে সমাজের সুর কাটে—মনের তালও কাটে। কাল প্রশান্ত যা বলে গেল—তা ভাবছি। সত্যিই তো দাবি চাপিয়ে আধা-আধি পেয়ে মিটিয়ে ফেলা মানে আপোষ-নিষ্পত্তির ব্যাপার। এটা যেন ভয় দেখানো ও ঘুষ খাওয়ার মত ঠেকছে। অধিকাংশ ধর্ম্মঘট এইভাবে মিটছে। এ পথ ভাল নয়।

অন্যত্র:

দাশগুপ্ত কিছুতেই বুঝবেন না—বাঁকা পথ কল্যাণের পথ নয়। সঙ্ঘের শক্তি বাড়াবার জন্য মালিকদের সঙ্গে টাকা নিয়ে রফা করার যুক্তিটা

কি! শ্রমিকদের বোঝানো হ'ল, এ হচ্ছে রসদ সংগ্রহ। ভবিষ্যতে তোমরা যাতে ভালভাবে লড়তে পার তারই প্রস্তুতি এটা। ছলে বলে অথবা কৌশলে। আমি বললাম, অপকৌশল। উনি ক্রুদ্ধ হলেন, বেশ বুঝা গেল। বক্রোক্তি করলেন, গান্ধীর ছোঁয়াচ লেগেছে! সত্য কি শুধু গান্ধীরই একচেটে? আশ্চর্য্য!

তারপর লিখেছে:

শ্রম আর মূল্য-বিনিময়ের কথাটা প্রশান্ত মন্দ বলে নি। ন্যায্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ন্যায্য শ্রম এতো দিতেই হবে—এরই ভিত্তিতে আমরা দৃঢ় করতে পারব এই আন্দোলনকে। নইলে আধাআধি রফায় কারো বিশ্বাস অর্জ্জন করা যায় না। যে শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ, তাকেই সমর্থন করা হচ্ছে এই নীতির দ্বারা। গুপ্ত বললেন, কিসে? বললাম, নয় কিসে? আপনারা শ্রমিকের হয়ে যে দাবি জানাচ্ছেন তা কি ধনিক-শোষণের যন্ত্র নয়? দাবি জানিয়ে পুরোপুরি যদি আদায় করতে পারেন তবে বুঝব দাবি আমাদের যথার্থ। রফা মানেই তো মানহানির মামলা।

অত্যন্ত অস্পষ্ট লাইন ক'টিতে বিক্ষিপ্ত মনের পরিচয় আছে:

মাকে তিরস্কার করেছি—কটু বলেছি। প্রশান্তকেও কটু কথা বললাম, আমাদের দুঃখ দেখে ওর অর্থ সাহায্যের হেতু কি থাকতে পারে! ওর রক্তে নীল রঙের নেশা জমেছে, ও জগৎকে কিনতে চাইছে।...হলদে চিরকূটখানা হাতে আগুনের শিখার মত জ্বলছে। জানি এ কার লেখা। কতবার প্রতিবাদ জানিয়েছি এ নিয়ে। ক্ষুধার্ত্তের অন্ন-প্রার্থনার দাবিতে যুদ্ধের তহবিল পূর্ণ করবার কি অধিকার আছে! এ নিয়ে আমরা বিলাস করছি হয়ত।

তারপর:

ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে আসছে অনেক কিছু। পেলেই মানুষ তৃপ্ত হয় না— অস্ত্রেরও প্রয়োজন আছে। যুদ্ধ তার স্বভাবের ক্রিয়া। নানান রকমের যুদ্ধ। ক্ষমতামদের মত—এ পাওয়ার বাসনা কমে না, বাড়েই। এ দৃষ্টিকে করে সঙ্কুচিত—আবিল—একাংশে লগ্ন। পৃথিবীর বহু দিক আছে —নানা বিপরীতধর্ম্মী সমস্যা আছে। সব দুঃখের কারণই খাঁটি নয়, ন্যায্য নয়। তর্ক করলাম—কলহ করলাম—ওঁরা কিন্তু অবিচল। বললেন, এ দাবি প্রত্যাহার করব না আমরা। শ্রমিকরা কিছু পেলেই আপাততঃ সন্তুষ্ট হবে। নইলে বহুদিন ধরে ধর্ম্মঘট চালানোর মনোবল বা অন্নবল ওদের নাই! ওঁরা চলে গেলেন। ভাবছি—পার্টির কাজে ইস্তফা দেব কিনা।

তারপরের লাইনগুলি স্পষ্ট—হরফগুলি বড় :

না ইস্তফা দেব না—শেষ পর্য্যন্ত এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করব— এ প্রথার সংস্কার করব। শ্রমিকের সঙ্গে—চাষীর সঙ্গে জীবনকে মিশিয়ে দিয়ে ওদের প্রকৃত মর্ম্মকথাটি বুঝতে চেষ্টা করব। যুদ্ধই যখন মানবীয় বৃত্তির অপরিহার্য্য ধর্ম্ম, তখন সে ধর্ম্ম কেন পালন করব না? ভীরুর মত পলায়ন আমার ধর্ম্ম নয়।

এর পর তিনটি পাতায় লেখার ঠাসবুনানি—কাটা ও লাইনগুলি বাঁকা আর কালি ধ্যাবড়ানো। বোঝা যাচ্ছে চিত্তের স্থৈর্য্য হারিয়েছে। কোথাও অস্পষ্ট লেখা আছে ; এ সংসারের ভার ওর ওপরেই দেব কি? ওকে চিঠি লিখলাম। তার পরেই মন্তব্য রয়েছে : সব ভাবনা একসঙ্গে ভাবা যায় না। আমার যথাসাধ্য সাহায্য করব—কিন্তু সংসার থেকে দূরে যেতে হবে। দুঃখের পাঁকে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে দুঃখটাকে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ—কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে হবে না। পাঁকের বাইরে একটা পা না রাখলে আর একটি পা-কে পাঁক থেকে তুলব কি করে!

দু'একজনকে সঙ্কল্পের কথা বললাম। ওরা হাসল, বললে, ভীরু! ধর্ম্মঘট যত এগিয়ে আসছে—দুর্ব্বল যুক্তির জালে জড়িয়ে আমি নাকি চাইছি পিছিয়ে যেতে! কিন্তু আমি তো জানি যুদ্ধ হবে না—এ শুধু যুদ্ধের অভিনয়।

প্রায় শেষ পাতায় এসে পৌঁছল প্রশান্ত:

কাকেই বা জানাই সঙ্কল্পের কথা? সবাই ভুল বুঝল! কিন্তু এক জনকে না জানিয়ে আমিও তো স্বস্তি পাচ্ছি না। প্রশান্তকে জানাব কি? না—ছিঃ। তার চেয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব পত্র লিখে। সে একদিন আসতে চেয়েছিল—পথের বাধা তখন ছিল দুর্লঙ্ঘ্য; পথ আজও সুগম নয়। তবে সত্যের অরুণবর্ণ জ্যোতি মাঝে মাঝে দেখতে পাই। সে যা বলে তার সবটা ভুয়ো নয়, আমাদের নীতিও ভেজাল-শূন্য নয়। সত্য আছে এ দুয়ের মাঝামাঝি। এখন পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার মূল্য দিতে হবে বৈ কি—তার পর যে সম্পদ আসবে···নূতন কালের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে আমরা সে সম্পদের সন্ধান পাব। তবু জানিয়ে রাখি—সম্পদ সঞ্চয় করব না আমরা—তাকে ভাসিয়ে দেব কালের স্রোতে। নতুন সমাজ—নতুন বিধিবিধান—নতুন পারিপার্শ্বিক বার বার ফিরে আসে নতুন হয়ে। পুরাতন রীতি-অভ্যস্ত মন তাকে সহজে স্বীকার করতে চায় না। বয়োধর্ম্মে স্থিতিশীলতার জাড্যভারে তার কল্যাণবুদ্ধি আচ্ছন্ন—চিন্তা অস্বচ্ছ. আর বিবেক পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মোহমুক্ত দৃষ্টি ও বিচারপ্রবুদ্ধ মন—এ যেন জরাগ্রস্ত না হয়। এ যদি জাগ্রত না রইল—কিসের প্রয়োজন জীবনে!

শেষ লাইন ক'টি:

চলে যাচ্ছি—গণ্ডি পার হয়ে। প্রণাম জানাচ্ছি পুরাতন পৃথিবীকে—প্রণাম জানাচ্ছি অনাগত পৃথিবীকে। দেশ স্বাধীন হতে চলেছে—

সে দায়িত্ব বহন করবার যোগ্য যেন হতে পারি—যেন প্রণতি জানাবার অধিকার অর্জ্জন করি।

খুকী এই মাত্র জিজ্ঞাসা করছিল, দিদি ভাই, কোথায় যাচ্ছ? ফিরবে তো এক্ষুনি—মার শরীর খারাপ।

ওর চিবুক ধরে চুমো খেয়ে উত্তর দিলাম, ফিরব বই কি ভাই।...

ডায়েরি শেষ হয়েছে এইখানে—প্রশান্ত আত্মসমাহিত হয়ে বসে আছে। শুভা কোন্ সত্যের সন্ধানে গৃহ ছাড়ল—সে সত্য লাভ করবে কিনা—মনোসিদ্ধ হয়ে সে ফিরে আসবে কিনা একদিন—এ সব প্রশ্ন ওর মনেই উঠল না। ওর মন চলে গেছে—জগৎ ছাড়িয়ে সুদূর ধ্যানলোকে। যে অনাদি কালস্রোতে জন্মমৃত্যুর ফুল ভেসে আসছে আর ভেসে যাচ্ছে—সূর্য্যপিণ্ডের জ্যোতি আকর্ষণে পৃথিবী স্বকেন্দ্রে লগ্ন হয়ে গ্রহ-পরিক্রমা করছে শূন্যমণ্ডলে—অনিত্য বস্তু নিত্যসত্তার সংঘাতে প্রতি মুহূর্ত্তে রূপ বদল করছে—সেই কালস্রোতে পা রেখে দাঁড়িয়েছে প্রশান্ত, দাঁড়িয়েছে আজকের মানব-গোষ্ঠী। সে মানুষ মরণশীল অথচ চিরজীবী। এক হাতে ধ্বংসের খর্পর—অন্য হাতে সৃষ্টির লীলাকমল—খড়্গ ও বরাভয়যুক্ত পাণিতে—যুগপৎ শাসন ও সান্ত্বনা—আপাতঃ বিপরীতধর্ম্মী অথচ পরস্পরের পরিপূরক—দুই বস্তু নিখিলের নিত্য প্রবহমান স্রোতধারাকে নির্ম্মল ও গতিবান করে রেখেছে। ডায়েরির পাতা থেকে যে ইঙ্গিত পেলে—তাই বুঝি ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল স্বপ্ন-কল্পনায়। ও মগ্ন হয়ে রইল তার মাঝে।

দুয়ারে মৃদু করাঘাতের শব্দ। ঠক্—ঠক্—ঠক্।

প্রশান্ত চমকে উঠল—ওর ধ্যান ভঙ্গ হ'ল।

প্রশান্ত—প্রশান্ত—

অন্তরস্থিত প্রিয় কণ্ঠের আহ্বান বাইরের প্রতিধ্বনিতে বুঝি বেজে উঠল।

ও ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এ আহ্বানের অর্থ ওর কাছে অস্পষ্ট নয়···ও ভুল করে নি।

রাত্রিশেষের বার্ত্তা নিয়ে সে ফিরে এল···প্রশান্ত তাকে ভালমতে জানে। তাকে স্বাগত জানাতেই হবে।

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬